# পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

*এবং*

# রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৬

*প্রদান উপলক্ষ্যে*

# স্মারকগ্রন্থ

## ২০১৭

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

# পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

*এবং*

# রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৬

*প্রদান উপলক্ষ্যে*

# স্মা র ক গ্র ন্থ

## ২০১৭


সম্পাদনা

**সুকুমার বাগচি**

সহযোগী সম্পাদক **সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়** ❑ সহকারী সম্পাদক **বাসব রায়**



**রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন**, মুম্বাই

# সূচিপত্র


সম্পাদকের নিবেদন ॥ ৫

প্রাক্‌কথন ॥ **শ্যামাশিস ভট্টাচার্য** ॥ ৭

সবিনয় নিবেদন ॥ **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৯

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ১১

**পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা**

অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন ॥ **নগেন শইকীয়া** ॥ ১২

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ৩৭

**রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা**

বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর ॥ **তরুণ মুখোপাধ্যায়** ॥ ৩৮

**মোসলমান নাম তত্ত্ব** ॥ **পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ** ॥ ৪৩

ভারত ভ্রমণ ॥ **রামনাথ বিশ্বাস** ॥ ৪৭

এ-যাবৎ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ ॥ ৮৩

স্মারকগ্রন্থ উন্মোচনকারী গুণীগণ ॥ ৮৪

এ-যাবৎ পুরস্কৃত কবিদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥ ৮৫-৯৮

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি ॥ সংকলন : **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৯৯

**মতামত** ॥ ১০৫

# সম্পাদকের নিবেদন

বর্তমান স্মারকগ্রন্থে বিশেষ সংযোজন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের 'মোসলমান নাম-তত্ত্ব' আর রামনাথ বিশ্বাসের 'ভারত ভ্রমণ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অখণ্ড ভারতের কয়েকটি অঞ্চল ভ্রমণের বৃত্তান্ত। সংগ্রহ করা সম্ভব হলে, প্রতিবছরই পদ্মনাথ ও রামনাথের রচনার সঙ্গে এ-যুগের পাঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

শ্রী নগেন শইকীয়া অসমিয়া ভাষায় লেখা মূল স্মারকবক্তৃতাটি বঙ্গানুবাদ করে পাঠিয়েছেন। তবে অসমিয়া উদ্ধৃতিগুলিতে সংগত কারণেই অসমিয়া র (ৰ) ও অন্তঃস্থ-ব (ৱ) ব্যবহৃত।

এ-বছর পুরস্কার প্রাপক দুজন কবি সহ এ-যাবৎ পুরস্কৃত মোট চোদ্দ জন কবিরই সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রয়েছে পূর্ববর্তী বছরগুলির স্মারক বক্তৃতাগুলির বিষয় আর বক্তাদের নামের তালিকা যুক্ত একটি আলাদা পৃষ্ঠা। সেইসঙ্গে দেওয়া হয়েছে স্মারকগ্রন্থ উন্মোচকদের নামের তালিকাও। এবারকার 'মতামত' বিভাগটি গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট ক্ষীণকায়। স্মারকগ্রন্থটির নিরন্তর উন্নয়নের প্রয়োজনে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে আমরা সর্বদাই আগ্রহী। সে-কারণে আমাদের বিভিন্ন ত্রুটি নির্দেশ সহ ইতিবাচক প্রস্তাব পেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ রইল।

স্মারক বক্তৃতা দুটির ঠিক আগে পদ্মনাথ ও রামনাথের সচিত্র পরিচিতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে গত চার বছরের মতোই।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য সংকলিত বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল এবং প্রতিবছরের স্মারকগ্রন্থই পৃথকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কুলপঞ্জিটির পুনর্মুদ্রণ তাই অব্যাহত রাখা হল কিছুটা সংযোজন সহ।

পদ্মনাথের নিবন্ধ, রামনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং দুটি স্মারক বক্তৃতা সহ প্রতিটি রচনা সম্পাদনার সময় আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তবে উদ্ধৃতিগুলিতে মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে এ-বছরও ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের, বিশেষত রমানাথ ও শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি— এ-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। সম্পাদনাকার্যে নানাভাবে সাহায্যের জন্য সহযোগী সম্পাদক শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রী বাসব রায়কে ধন্যবাদ।

# প্রাক্‌কথন

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের ষষ্ঠ বৎসরের অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, কেননা আমি মনে করি, এই উপস্থিতিই অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আপনাদের সীমাহীন ভালোবাসা প্রমাণ করে। রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই বার্ষিক অনুষ্ঠান মূলত বাংলা ও অসমিয়া ভাষার বিশিষ্ট কবিদের জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং উভয় ভাষার উল্লেখযোগ্য কবিদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

আপনারা অবশ্যই জানেন যে বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমরা দুটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছি। এগুলি হল সাহিত্যের দুটি বিষয়ে আমাদের দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতা। প্রতিবছর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কারণ রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমাদের উদ্দেশ্য— গুয়াহাটি শহরের জ্ঞানী-গুণীদের কাছে স্মারক ভাষণমালা যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলা।

আমি বিশ্বাস করি, কোনো সাহিত্য-প্রচেষ্টা তখনই সফল হয় যখন সেই প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্যিকরা জড়িত থাকেন। তাঁরা অংশ না-নিলে, আন্তরিকভাবে যুক্ত না-হলে, উৎসাহ না-দিলে কোনো সাহিত্য-প্রচেষ্টা, অনুষ্ঠান কিংবা আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সে-কারণে এই ধরনের অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি শহরের সাহিত্যসেবীদের যুক্ত করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আমি একান্তভাবে প্রার্থনা করি যে মহানগরীর লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, অধ্যাপক, শিক্ষক এবং বাংলা ও অসমিয়া ভাষাপ্রেমীরা আমাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত থেকে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানকে শহরের সেরা সাহিত্যানুষ্ঠান হয়ে উঠতে সহায়তা করবেন।

এই সম্পর্কের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি, বার্ষিক স্মারক বক্তৃতার শ্রেষ্ঠ বিষয় কী হতে পারে তা সম্ভাব্য বক্তার নাম সহ আমাকে সরাসরি লিখে জানান। আপনাদের ইতিবাচক পরামর্শের জন্য আমরা সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকব।

এই ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা কবি-সাংবাদিক সুকুমার বাগচি আমাদের অনুরোধে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সেজন্য তাঁকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এবার পুরস্কার বিতরণ ও স্মারক বক্তৃতার পরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি এটি উপভোগ্য হবে।

গুয়াহাটি
১৮ মার্চ ২০১৭

**শ্যামাশিস ভট্টাচার্য**
সাধারণ সচিব
**রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই**

# সবিনয় নিবেদন

আমার নামে মুম্বাইয়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি করণীয় কাজের সঙ্গে এই ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার ঘনিষ্ঠ দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (সম্পর্কে আমার পিতা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠতাত) এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের (সম্পর্কে আমার বাবার জ্যাঠতুতো দাদা) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ প্রতিবছর দুটি সাহিত্য-পুরস্কার প্রদান। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫১,০০০ টাকা, সেইসঙ্গে একটি স্মারক ও মানপত্র। পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হয় অসমিয়া ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে এবং রামনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হয় বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে। দুটি পুরস্কারপ্রাপকের নাম নির্বাচনের ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কবিদের সারাজীবনের কাব্যকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে গুয়াহাটিতে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সাত বছর আগে। সেইসঙ্গে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিটি পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের, এবং সম্ভব হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য কোনো প্রধান ভাষা-সংস্কৃতির, নির্দিষ্ট বিষয়ে ভাষণ দেবেন দুজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। স্মারক বক্তৃতা দুটির বিষয় নির্ধারণ করবেন ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। প্রতিবছরই দুটি স্মারক বক্তৃতা তাই এই অনুষ্ঠানের এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ।

ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৬ সালের জন্য পদ্মনাথ স্মৃতিপুরস্কার এবং রামনাথ স্মৃতিপুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে যথাক্রমে কবি সনন্ত তাঁতি এবং কবি উদয়ন ঘোষের হাতে। তাঁদের সম্মান জানাতে পেরে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্টি অনুভব করছেন।

গুয়াহাটি
১৮ মার্চ ২০১৭

**রমানাথ ভট্টাচার্য**
সভাপতি
**রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই**

# পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

## (১৮৬৮-১৯৩৮)

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্ম অবিভক্ত অসমের শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙে, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)। বানিয়াচং রাজবংশের সন্তান পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসম রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি.এ. পাশের পর সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত পাঠক্রম সমাপ্ত করে ঢাকা সারস্বত সমাজ কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমের উজ্জ্বল রত্ন পদ্মনাথের কর্মজীবন শুরু হয় শিলঙে, ১৮৯৩ সালের ১০ নভেম্বর, রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারী হিসাবে, সেখানে তিনি সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুরমা উপত্যকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল্স-এর কার্যভার গ্রহণের জন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১ জানুআরি শিলং ত্যাগ করেন। সিলেটে বাসকালে তিনি নিজ উদ্যোগে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে তুলে দেন অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে, যিনি ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন পদ্মনাথের আর্থিক সহায়তায়।

যদিও পদ্মনাথ সিলেটের বিখ্যাত মুরারিচাঁদ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন, ১৯০৫ সালের জুন মাসে ইতিহাস ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসাবে গুয়াহাটির কটন কলেজে যোগদানের পরে তিনি বিশেষভাবে ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কটন কলেজে থাকাকালীন তিনি এক ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি', 'কামরূপশাসনাবলী' এবং 'মি. গেইট্'স হিস্টরি অব আসাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ৭ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' (আসাম রিসার্চ সোসাইটি)। অসমের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে 'কামরূপশাসনাবলী' নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ এবং এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন এবং 'অসম সাহিত্য সভা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পদ্মনাথকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করে, তবে 'অশাস্ত্রীয়' সারদা আইনের প্রতিবাদে এই খেতাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

শেষজীবনে পদ্মনাথ কাশীবাসী হন এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে 'সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত তাঁর দুটি বই ('আলোচনা চতুষ্টয়' ও 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') প্রকাশ পায়। ❑

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

# অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন

নগেন শইকীয়া

[ বরণীয় ও স্মরণীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ আর ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের স্মৃতিরক্ষার্থে গঠিত রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন থেকে প্রতি বছর দুটি বক্তৃতার আয়োজনের কথা জানতে পেরে আমি যথার্থই আনন্দিত হয়েছি। এই ফাউন্ডেশন পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক সপ্তম বক্তৃতা প্রদান করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করায় আমি স্বভাবতই বিস্মিত হয়েছি এবং সংকোচ বোধ করছি। এর কারণ হল, পণ্ডিতের স্মৃতিতে আয়োজিত পণ্ডিতের সভায় আসন গ্রহণ করার জন্য আমার পাণ্ডিত্যের কোনো প্রকার বাঞ্ছিত যোগ্যতা নেই। তথাপি বক্তৃতাটি যেহেতু অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন সম্পর্কে সেজন্য বরেণ্য পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। আপনাদের অনেকেরই জানা কথাগুলোকে আমি কেবল আমার মতো করে তুলে ধরছি। আপনাদের চোখে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে আমি নিশ্চয় কৃতজ্ঞচিত্তে সংশোধনের চেষ্টা করব। এই সুযোগে আমি রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি, সাধারণ সচিব প্রমুখ সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নিষ্ণাত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের স্মৃতিতে মাথা নত করে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। ]

॥ এক ॥

প্রস্তাবনা

**অসমিয়া ভাষা এবং ভাষার পরিচয়-জ্ঞাপক সাহিত্য-কৃতি**

ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলি হল— বৈদিক আর্যভাষা, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃত ভাষা এবং পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তরের ভাষা। প্রাকৃতের পূর্বমাগধী অপভ্রংশ থেকে সৃষ্ট ভাষাগুলি হল অসমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলি, মগহি এবং ভোজপুরি ভাষা। এই ভাষাগুলির মূল অভিন্ন হলেও বিকাশের পথে প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ভাষাগুলিকে রূপতত্ত্ব এবং ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে পৃথক করেছে। অসমের বিশিষ্ট পণ্ডিত ডিম্বেশ্বর নেওগ প্রমুখ মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী, মাগধী ছাড়াও প্রাচীন কামরূপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে একটি প্রাকৃত গড়ে ওঠার কথা বলেন। সেইজন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাণীকান্ত কাকতি প্রমুখ পণ্ডিত পূর্বমাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত অপভ্রংশের স্তরটিই এইসব ভাষার উৎস বলে উল্লেখ করেন। অন্য মতের সমর্থকরা 'কামরূপী প্রাকৃত'-এর অস্তিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেননি। সে যা-ই হোক, এই ভাষাগুলির মধ্যে যে জন্মসূত্রের সম্পর্ক আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মূল প্রশ্নটি হল, আমরা যে-ভাষাকে 'অসমিয়া' নামে পরিচয় দিয়েছি সেই ভাষার জন্মের সময় কখন এবং এই ভাষার অসমিয়া নামকরণ কবে থেকে হয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, অসমিয়া নামের পূর্বে এই ভাষার নাম কী ছিল?

আর্যভাষা থেকে অসমিয়া ভাষা উদ্ভূত হওয়ার প্রশ্নাতীত তথ্য আর্যভাষী মানুষ, আর্যভাষা এবং আর্যসংস্কৃতি যে এই ভাষার জন্মের কয়েকশো বছর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিবাসিত হয়ে এসেছিল সেই তথ্যের সংকেত দেয়। ঐতিহাসিক কালের পূর্ব থেকেই যে অস্ট্রালীয় এবং কিরাতীয় মূলের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার

উত্তর, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-দক্ষিণ পথে জীবিকার ও বৃত্তির সন্ধানে প্রবেশ করেছিল সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতদ্বৈধ নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সেজন্য অসমের রক্ত এবং লোকসংস্কৃতি তথা বস্তুগত সংস্কৃতির সম্পর্ক বহুদিন পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল।

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিবাসন করে আল্‌পাইন গোষ্ঠী। এরাই ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আগত প্রথম আর্যভাষী গোষ্ঠী। এর পরে ককেশীয় মূলের আর্যভাষীদের অভিবাসন ঘটে। দশম শতকের অসমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'কালিকাপুরাণ' গ্রন্থ এই সাক্ষ্য বহন করে যে তার কয়েক শতক পূর্বেই সংস্কৃতচর্চা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। 'কালিকাপুরাণ' যদিও ইতিহাস নয়, তথাপি এই গ্রন্থে অনেক পরোক্ষ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রকৃতপক্ষে বর্মন বংশের রাজত্বকালে আর্যীকরণ যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই কথার সাক্ষ্য বহন করে আসছে বর্মন বংশের দিনে সপ্তম শতক থেকে পাওয়া তাম্রশাসনসমূহ। বর্মন বংশের চতুর্থ শতকের পুষ্য বর্মন থেকে সপ্তম শতকের ভাস্কর বর্মন পর্যন্ত মোট বারোজন রাজার কথা জানা গেছে। ভাস্কর বর্মার সময়ের তাম্রশাসনগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় যে এই বংশের শুরু নরকাসুর থেকে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না-করে এ-কথা বলা চলে— 'কালিকাপুরাণ'-এ বর্ণিত বিবরণ থেকে সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের আলোকে অনুসন্ধান করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে মিথিলা-কেন্দ্রিক আর্যশক্তির একটি গোষ্ঠী কামরূপ তথা প্রাগজ্যোতিষপুরের মৈরাং দানব রাজাকে হত্যা করে আর্যদের দ্বারা প্রতিপালিত নরকাসুরকে এই রাজ্যে বর্ণাশ্রমপ্রথা প্রবর্তন করার জন্য সিংহাসনে বসিয়ে যান। কিন্তু নরকাসুর পরবর্তী সময়ে শোণিতপুরের বাণাসুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। ফলে আর্যরা পুনরায় এসে নরকাসুরকে বধ করে ভগদত্তকে রাজা করে যান এবং এই ভগদত্তের কাল থেকেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর্যীকরণ তথা সংস্কৃতায়ন শুরু হয়। কাব্য-মহাকাব্য বা পুরাণের আখ্যানের উপর নির্ভর না-করে অনুমান করা যায় যে নরকাসুর এবং ভগদত্ত থেকে চতুর্থ শতকের পুষ্য বর্মন পর্যন্ত কালের মধ্যে আরো কয়েকজন রাজা রাজত্ব করেছেন। অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম বা খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর্যীকরণ আরম্ভ হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে।

এই পর্যন্ত পাওয়া চতুর্থ-পঞ্চম শতকের নগাজরী খনিকর গ্রামের শিলালেখ এবং পঞ্চম শতকের সুরেন্দ্র বর্মার উমাচল শিলালেখ— এই দুই লেখ ইতিপূর্বে সংস্কৃত ভাষা এবং আর্যসংস্কৃতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। সুরেন্দ্র বর্মার শিলালেখ-এ বলভদ্রস্বামীর পূজার জন্য একটি গুহামন্দির নির্মাণ করার ঘোষণা খোদিত হয়ে আছে। বলভদ্রস্বামীর নামটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকার ইঙ্গিত বহন করে। তা হলেও তখন পর্যন্ত আমরা আজ যে-ভাষাকে অসমিয়া নামে চিহ্নিত করছি সেই ভাষার জন্মের নিশ্চিত সংবাদ পাই না। কিন্তু নিধানপুর তাম্রশাসনে খোদাইকরের নাম 'কালিয়া' বলে খোদিত আছে। কালিয়া নামটি সংস্কৃত নাম নয়। তা ছাড়া কালিয়ার 'ইয়া' প্রত্যয়টিও সংস্কৃত প্রত্যয় নয়। এটা আর্যভাষা সংস্কৃতির বৃত্তে প্রবেশকারী অ-আর্য স্থানীয় কোনো ব্যক্তির নাম হতে পারে। তদুপরি পঞ্চম শতকের সুরেন্দ্র বর্মার শিলালেখে থাকা চতুর্থ পঙ্‌ক্তি 'স্বামিনায় ইদয়, গুহং' এই শব্দগুলির সংস্কৃত শুদ্ধ নয়, হওয়া উচিত ছিল 'স্বামিনঃ ইয়ংগুহা'। এরকম ভুল শুদ্ধভাবে সংস্কৃত না-জানা স্থানীয় লেখকের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। ঠিক যেভাবে নগাজরী খনিকর গ্রামের লেখ-এ থাকা অন্তঃস্থ-'ব' এবং 'র' অক্ষর দুটির ব্যবহারে অসমিয়া ভাষায় 'র' ও 'ৰ' প্রয়োগ সংস্কৃত উৎসের ইঙ্গিত দেয়।

পূর্বমাগধী অপভ্রংশ থেকেই হোক বা কামরূপী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে হোক, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গড়ে-ওঠা আর্যমূলীয় এই ভাষাটির মধ্যে যে অ-আর্য মূলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কথ্যভাষার রূপ ও ধ্বনির কিছু-না-কিছু উপাদান প্রবেশ করছিল সে-কথার আভাস রয়েছে। কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মার রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। তিনি দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন, 'কামরূপের ভাষা মধ্য ভারতের ভাষা থেকে কিছু পৃথক।' এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, সপ্তম শতকে এই ভাষা নিজস্ব সমগোত্রীয় আর্যমূলীয় ভাষা থেকে কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য আহরণ করে মানুষের মুখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

ভাষা সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করে, পণ্ডিতেরা ভাষা সৃষ্টি করেন না বা করতে পারেন না। পণ্ডিতেরা পরে প্রচলিত ভাষার অলিখিত নীতি-নিয়মগুলিকে লিখিত রূপ দিয়ে ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। অসমিয়া ভাষাকেও এভাবেই আর্যমূলীয়

ভাষার আধারে মূলত অ-আর্য মূলের স্থানীয় মানুষেরা নিজেদের উপযোগী করে সকলের জন্য গ্রহণীয় কথিত ভাষার ছাঁচে গড়ে তোলেন। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙের মন্তব্যটি এই ভাষার সেই সময়ের অস্তিত্বের উল্লেখ করে গেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হতে পারে, এই ভাষার লিখিত রূপের সাক্ষ্য আমরা কবে থেকে পাচ্ছি।

কথ্যরূপে গদ্য পূর্বে হলেও লিখিত রূপে পদ্য সব সময় সব ভাষায় প্রথমে সৃষ্টি হয়ে আসছে। অবশ্য পদ্যের সৃষ্টি প্রথমে হলেও তা গদ্যভাষার আধারেই হয়। অসমিয়া ভাষার ক্ষেত্রে লিখিত গদ্যের নিদর্শন পঞ্চদশ শতক থেকে পাওয়া গেলেও পদ্যের সৃষ্টি অষ্টম-নবম শতক থেকে আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়টিকে বলা হয় 'প্রত্ন-অসমিয়া ভাষার যুগ'। প্রত্ন-অসমিয়া ভাষার এখনও পর্যন্ত পাওয়া সাক্ষ্য হল বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলীর নিজেদের বলে দাবি করা চর্যাপদগুলি। এই ভাষাগুলির জন্মের উৎস এবং প্রথম বিকাশের স্তরের সঙ্গে থাকা রূপগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্যই এরকম দাবির আধার। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ODBL-এ বাংলাভাষার সঙ্গে থাকা সাদৃশ্যগত সম্পর্কের কথা দেখিয়েছেন। অন্য সকলেও সেই দাবি করেন। এই দাবিই এই ভাষাগুলি যে যথার্থ ভগ্নীভাষা সে-কথা প্রমাণ করে আসছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, চর্যাপদে ব্যবহৃত অনেক শব্দ, ক্রিয়ারূপ, বিভক্তি, প্রত্যয়, নঞর্থক শব্দরূপ, স্ত্রীবিভক্তি, বহুবচন বোঝানো প্রত্যয়, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এখনও অসমিয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরকম বৈশিষ্ট্য বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলীতে এত বিস্তৃতভাবে বোধ হয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া চর্যাপদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বজ্রযান তথা সহজযান যে তিব্বতীয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এবং যৌনাচার সাধন এর অঙ্গীভূত হয়েছিল, তার পরবর্তী অপভ্রষ্ট রূপের উপাদান অসমের 'রাতিখোরা' এখনও বর্তমান থাকলেও কোনো কোনো অনুষ্ঠানে কমে গেছে। হিউয়েন সাঙ কামরূপে অনেক বৌদ্ধের গোপনে অবস্থান করার কথা বলেছেন। এই উল্লেখ সে-সময়ের সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম সাধনের রূপটির ইঙ্গিত বহন করছে। তদুপরি পরবর্তীকালের (১৭/১৮ শতকের) 'গুরুচরিত কথা'-য় উল্লেখিত 'টাটকীয়া বৌদ্ধ' যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শংকরদেব এরকম তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বামাচারী (নারী-সম্পর্কীয় আচরণকারী) বলে নিন্দা করেছেন। এবং কলির শেষে কল্কি অবতার হয়ে ভগবান এরকম বামাচারী বৌদ্ধদের সংহার করে সত্যযুগ প্রবর্তন করবেন এমন সম্ভাবনার কথা 'ভগবানের চতুর্বিংশতি অবতার'-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, অসমিয়া ভাষার সঙ্গে পূর্বমাগধী ভাষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হলেও শৌরসেনী প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত শব্দের ব্যবহার অসমিয়া ভাষার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য বহন করছে। মারাঠি ও গুজরাটি ভাষার শব্দের সঙ্গে মিল আছে এরকম কোনো কোনো শব্দ তার সাক্ষ্য বহন করছে। চর্যাপদগুলির ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের উপাদান পাওয়া যায়। অবশ্য তার উপর পূর্বী ভাষার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে। এই কথাও উল্লেখযোগ্য যে চর্যাপদগুলি লেখার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত সাঁচিপাত (অগুরু গাছের ছাল) অসমেই পাওয়া যায়। এখনও সাঁচিগাছ (অগুরু গাছ) স্বাভাবিকভাবে অসমের মাটিতে জন্মায়।

অষ্টম-নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলে অনুমিত চর্যাপদগুলির পরবর্তী প্রায় এক-দেড় শতকের ভেতর রচিত কোনো পদ্য বা গদ্য পুঁথি এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু এই সময়সীমার মধ্যে অসমিয়া ভাষা-যে সবদিক থেকে ক্রমে একটি উচ্চ পর্যায়ের ভাষার রূপ লাভ করেছিল তার প্রকাশ ঘটে চতুর্দশ শতকে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে জন্মলাভকারী শংকরদেবের পূর্ববর্তী মাধব কন্দলীর বরাহী রাজা মহামাণিক্যের অনুরোধে 'বাল্মীকি-রামায়ণ'-এর চতুর্দশ শতকে করা অসমিয়া রূপান্তরে ভাষাটির এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ দেখা যায়। কাব্য হিসাবেও এই গ্রন্থ কেবল অসমিয়া ভাষার নয়, ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যেও এক উল্লেখযোগ্য কৃতি। শংকরদেবের ন্যায় একজন সন্ত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, গীতিকার, কবি, নাট্যকার, শিল্পীর মাধব কন্দলীকে 'অপ্রমাদী কবি' বলে আখ্যা দেওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শংকরদেব-পূর্ব হরিবর বিপ্র, হেম সরস্বতী, কবিরত্ন সরস্বতী, রুদ্র কন্দলি প্রমুখ কবির কর্মও এই যুগটিকে সমৃদ্ধি দান করে গেছে। কিন্তু চতুর্দশ শতক পর্যন্ত লিখিত গদ্যের কোনো নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি।

॥ দুই ॥

**অসমিয়া লিখিত গদ্যের সূচনা**

শংকরদেব (১৪৪৯-১৫৬৮) ছিলেন মধ্যযুগের অসমের তথা সাংস্কৃতিক ভারতবর্ষের এক মহৎ প্রতিভাস্বরূপ পুরুষ।

বেদ-উপনিষদ, কাব্য-মহাকাব্য, পুরাণ-উপপুরাণ, ভাষা-ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, তথা অলংকার শাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, সংগীত (নৃত্য-গীত-বাদ্য) শাস্ত্র, চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য এই সমস্ত দিকে সমান অধিকারী শংকরদেবের সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'নামধর্ম' প্রচার এবং এর সঙ্গে সংগতি থাকা জীবন যাপনের প্রণালির প্রবর্তনে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে গেলে, এককভাবে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। অসমিয়া লিখিত গদ্যের ইতিহাসও জন্ম নিয়েছে শংকরদেবের হাতে। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলেছেন—

> "অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ বিষয় যে আধুনিক ভাৰতীয় আর্যভাষাসমূহৰ ভিতৰত অসমীয়াতে প্রথমে গদ্য সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। বঙালী গদ্যৰ প্রাচীন নিদর্শন হৈছে বৈষ্ণবসাধকসকলৰ 'কড়চা'-সমূহ ; কড়চাৰ প্রাচীনতম পুথিৰ ৰচনাকাল ১৬০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ বুলি অনুমান কৰা হৈছে।"

(অর্থাৎ, অসমিয়ার গৌরবের বিষয় যে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা সমূহের মধ্যে অসমিয়াতে প্রথম গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন বৈষ্ণবসাধকদের 'কড়চা'-সমূহ ; কড়চার প্রাচীনতম পুঁথির রচনাকাল ১৬০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দ বলে অনুমান করা হয়েছে।)

অসমিয়া লিখিত গদ্যের ইতিহাস শংকরদেব থেকেই শুরু। শংকরদেব-মাধবদেব প্রমুখের নাটকের গদ্যেই এই ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য এই গদ্য সমসাময়িক কথ্য ভাষার গদ্য ছিল না। বরং কৃষ্ণকেন্দ্রিক বিষয়ে ভক্তিধর্মের প্রতি আকর্ষণ এবং বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি ব্রজধামের আর মিথিলার ভাষার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে এই গদ্য নাটকের জন্য রচনা করেছিলেন শংকরদেব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শংকরদেব নিজের লেখা নাটকগুলিকে নাট বা যাত্রা বলে অভিহিত করেছিলেন, যদিও এই নাটকগুলি ছিল মুখ্যত গীতি-নৃত্য-নাট্য স্বরূপ। মাধবদেবের নাটকগুলি আকারে ছোট এবং শিশু কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক। এগুলিকে বলে ঝুমুরা। শংকরদেবের প্রতিষ্ঠিত এই ধারার নাটকগুলি পরবর্তীকালে 'অঙ্কীয়া নাট' এবং এরকম নাটকের অভিনয় 'অঙ্কীয়া ভাওনা' রূপে পরিচিত হতে থাকে। এবং এখানে ব্যবহৃত কৃত্রিম অসমিয়া ভাষাটি ব্রজাবলী (ব্রজবুলি নয়) নামে পরিচিত হল। নাটকগুলিকে অঙ্কীয়া বলার বিভিন্ন কারণ পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন, কিন্তু শংকরদেবের সম্মুখে একাধিক অঙ্ক সংবলিত সংস্কৃত নাটকগুলি থাকলেও তিনি সংস্কৃত নাটকের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি একটি অঙ্কের ভিতরেই সংশ্লিষ্ট কাহিনির দৃশ্যগুলি পরিকল্পনা করেছিলেন। সেজন্যই এই নাটকগুলিকে পরবর্তীকালে অঙ্কীয়া নাট বলা হল— এই যুক্তিটি অধিক শক্তিশালী। যে যা-ই হোক, অসমিয়া লিখিত গদ্যের জন্ম নাটকে এবং এই গদ্য ব্রজাবলী ধারার অসমিয়া গদ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। শংকরদেবের নাটকে সংস্কৃত শ্লোক, গীত এবং কথা এই তিনটির মাধ্যমে নাটকীয় ঘটনার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আমরা সূত্রকারের দেওয়া বর্ণনার একটি অংশ 'রুক্মিণী হরণ' নাট থেকে তুলে ধরছি—

> সূত্র।। আহে লোকাই ঃ সে গোসানি দেৱি ৰুকমিনি ঃ ঐচন প্রৱেস কয়ে কহু ঃ নৃত্য কয়ে ঃ একপাস হুয়া ৰহল। আহে সামাজিক লোক ঃ তদনন্তৰ প্রস্তুত ৪৬ কথা সুনহ ঃ সুৰভি নাম এক ভিক্ষুক ভাট ঃ কুণ্ডিন নগৰা হন্তে ঃ কৃষ্ণক ভেট পাৱাল ঃ তাহে দেখি ৪৭ শ্রীকৃষ্ণ বাত পুচত।

রুক্মিণীর দূতস্বরূপে রুক্মিণীর পত্র নিয়ে বিপ্র বেদনিধি দ্বারকা পৌঁছন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দ্বারকা আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এভাবে—

> হে স্বামী শ্রীকৃষ্ণ ঃ তুহু জগতক হামার কমন কুখল ঠিক। তুহু দৈৱকী পুত্র ঃ সোহি নহি ঃ ব্রহ্মা মহেস সেৱিত ঃ শ্রীনাৰায়ন ঃ সে তুহু ভূমিক ভাৰ হৱন নিমিত্ত অৱতাৰ ভেলি থাক ঃ অঃ তোহোক মহিমা কি কহব। হামু জদর্থে আৱলু তা সুনহ ঃ হামাৰ বিদর্ভৰাজনন্দনি ৰুকমিনি ঃ ভিক্ষুক মুখে তোহাৰি গুনৰূপ সুনিএ ঃ মনে স্বামি ভাৱে বৰল ঃ সে কৈন্যাক বিবাহ্ কৰিতে ঃ পাপি সিসুপাল আৱল ঃ তাহে দেখি এ ৰাজকুমাৰি মৰৈচে। অঃ হামু কি কহব ঃ এক পতিআ লেখি পঠাৱল থিক ঃ তাহেক দেখহ।।

বেদনিধির হাতে রুক্মিণী কৃষ্ণকে যে-পত্র পাঠিয়েছিলেন সেই পত্রে সম্বোধন বাক্য সংস্কৃতে লিখে চিঠিটি ব্রজাবলীতে লিখেছিলেন। এই চিঠিটিও অসমিয়া ভাষার পত্র-সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যেও এই পত্র-সাহিত্য প্রথম হতে পারে।

মাধবদেব রচিত ঝুমুরাগুলিও এই অসমিয়া গদ্যের নিদর্শন তুলে ধরেছে। শংকরদেবের আরম্ভ-করা এই নাটকীয় গদ্য

পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ধর্মাধিকাররা ব্যবহার করে এসেছেন। এখনও অসমের নগাঁওয়ে এই 'ব্রজাবলী অসমিয়া' ভাষায় ভাওনার নাট রচনা করার প্রথা চলে আসছে। এজন্য, এই নাটকীয় অসমিয়া গদ্য শংকরদেবের হাতে সৃষ্ট হয়ে তাঁর তিরোভাবের পরেও বন্ধ হয়ে যায়নি। এই গদ্যের একটি ধারা এখনও বয়ে চলেছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— শংকরদেবের সৃষ্ট অসমিয়া ব্রজাবলীর শব্দরূপের ছাঁচটিতে ব্রজভাষা বা মৈথিলীর রূপ থাকলেও বাক্য গঠনের রীতি ও শব্দপ্রয়োগে অসমিয়া কথ্যভাষার সুরটিই ফুটে উঠেছে। 'পারিজাত হরণ' নাটের শশী-সত্যভামার বিবাদে অসমিয়া গ্রাম্য জীবনের ভাষার রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। সত্যভামার সংলাপের কিছু অংশ তুলে ধরছি।

> সত্যভামা ঃ অয়ে ইন্দ্রাণী, জগতক পৰমগুৰু হামাৰি স্বামী যাহাৰ নাম সুমৰণে মহা মহা পাপী সৰো সংসাৰ নিস্তাৰে, তাহেক অতয়ে নিন্দা কৰহ। অয়ে নিলাজিনী মৰিতে নজানৰ। তোহোক স্বামী ইন্দ্রক কথা কহিতে ঘিণেসে উপজে।...

শংকরদেবের গদ্যে শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং পদপ্রয়োগে প্রাকৃতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, পদের শেষে স্বরধ্বনি থাকার জন্য গঠনও সংগীতময় হয়ে উঠেছে। তদুপরি তৎসম শব্দ থেকে উদ্ভূত ঘরিণী, মাই, বিহী, পরনাম, পরসাদ ইত্যাদিতে দূরাগত প্রাকৃতের সুর শোনা যায়। কিন্তু তা হলেও আধুনিক অসমিয়া ভাষায় ব্যবহৃত বিভক্তির প্রয়োগ ও অঙ্কীয়া নাটের গদ্যে ব্যবহৃত বিভক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। লক্ষণীয় যে, শব্দ বিভক্তির প্রয়োগবিধিই একটি ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহু পরিমাণে ধরে রাখে। অসমিয়াতে প্রথমা বিভক্তির চিহ্ন— এ, ই ; দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন— ক ; তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন— রে, দি, দ্বারা ; চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন— অক, লৈ ; পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন— পরা ; ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন— র এবং সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন— ত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শংকরদেবের পূর্বে কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লিখিত গদ্যের জন্ম হয়নি। শংকরদেবের পূর্বে, পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজার আদেশে বিদ্যাপতি ঠাকুরের লেখা 'গোরক্ষ বিজয়' নাটকের সংলাপ সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল। কেবল এই নাটকের গীতগুলি 'মৈথিল' ভাষায় লেখা।

॥ তিন ॥

## লিখিত গদ্যের প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্ব

শংকরদেবের গদ্য ও পদ্যের প্রভাব পরবর্তীকালের লেখকদের লেখা ধর্ম সম্বন্ধীয় পুঁথিগুলির উপর পড়েছে। অসমিয়া প্রাচীন গদ্যকে একটি নিজস্ব মাত্রা প্রদান করেন শংকরদেবের পরবর্তীকালের ভট্টদেব (১৫৫৮-১৬৩৮)। ভট্টদেবের সম্পূর্ণ নাম ছিল বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন ভাগবত ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন শংকরদেবের অন্যতম শিষ্য, পরবর্তীকালের 'ব্রহ্ম সংহতি'-র প্রতিষ্ঠাতা দামোদরদেবের শিষ্য এবং সত্রের 'ভাগবতী' বা ভাগবত পাঠক।

পাটবাউসীতে দামোদরদেব সত্র স্থাপন করে থাকতেন এবং ভট্টদেব পাটবাউসীর কাছে বড়নগরে ছিলেন। কোচ রাজা পরীক্ষিত নারায়ণের নির্দেশক্রমে দামোদরদেব পাটবাউসী থেকে বিজয়নগরে যাওয়ার সময় ভট্টদেবকে ডেকে এনে কথায় 'ভাগবত' রচনা করার জন্য এই বলে নির্দেশ দিলেন—

> আৰ এক জগত ঈশ্বৰ আজ্ঞা ধৰা।
> কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগৱত কৰা।
> পূর্ব্বে মহাপুৰুষে কৰিলা দশ স্কন্ধ।
> কীর্ত্তন ভটিমা ছবি দুলৰী সুচ্ছন্দ।।
> তাত কৰি সুগম কৰিয়ো ভাগৱত।
> স্ত্রী শূদ্র সর্ব্বলোকে বুঝে যেন মত।
> ...
> প্রভু দামোদৰৰ আজ্ঞায়ে মহাসন্ত।
> শ্লোক ভাঙ্গি ভাগৱত কথা কৰিলন্ত।।
> অবিৰোধ স্ত্রী শূদ্র চাণ্ডালে পঢ়য়।
> সঙ্খেপিয়া কথাৰূপ কৈলা মহাশয়।।

ভট্টদেব গুরুর আদেশে কথায় ভাগবত পুঁথি রচনা করেন। ভাগবতের পরে তিনি রচনা করেন কথায় গীতা পুঁথি। দামোদরদেব পূর্বে মহাপুরুষ শংকরদেবের ছন্দোবদ্ধ রূপে ভাগবত, কীর্তন প্রভৃতি রচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সাধারণ মানুষ যাতে আরো সহজে বুঝতে পারে তাই কথায় ভাগবত রচনা করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অসমিয়া কথা-সাহিত্যের ভিত্তি গড়ে তোলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী পরবর্তীকালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত কথা-গীতার ভূমিকায় সঠিকভাবেই বলেছেন, 'অসমীয়া গদ্য-সহিত্যের সৃষ্টিকার্যে ভট্টদেব যন্ত্র মাত্র দামোদরদেবই যন্ত্রী।'

হেমচন্দ্র গোস্বামী 'কথা-ভাগবত' এবং 'কথা-গীতা'-র ভাষার বিষয়ে আলোচনা করে বলেছেন—

"কথা-ভাগৱতৰ ভাষাতকৈ কথা-গীতাৰ ভাষা বেছি কোমল আৰু সৰল। কথা-ভাগৱতত যিমান পুৰণি অপ্রচলিত শব্দৰ ব্যবহাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কথা-গীতাত সিমান নাই। কথা-ভাগৱতৰ ৰচনাতকৈ কথা-গীতাৰ ৰচনাও বেছি প্রাঞ্জল আৰু মধুৰ। ওপৰত দেখুওৱা হেতুবাদৰ পৰা আমি কথা-গীতাক, কথা-ভাগৱতৰ পাছৰ গ্রন্থ বুলি অনুমান কৰোঁ।"

(কথা-ভাগবতের ভাষা থেকে কথা-গীতার ভাষা বেশি কোমল ও সরল। কথা-ভাগবতে যত পুরনো অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় কথা-গীতায় ততটা নেই। কথা-ভাগবতের রচনা থেকে কথা-গীতার রচনাও বেশি প্রাঞ্জল ও মধুর। উপরে দেখানো হেতুবাদ থেকে আমরা কথা-গীতাকে, কথা-ভাগবতের পরবর্তী গ্রন্থ বলে অনুমান করি।)

কথা-ভাগবতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তদুপরি শংকরদেবের ছন্দোবদ্ধ রূপে রচিত ভাগবতের শব্দচয়ন এবং অলংকার প্রভৃতির প্রভাবও পড়েছে। ভট্টদেবের গদ্যকে মহেশ্বর নেওগ 'মধুর কাব্যসুলভ গদ্য' বলে অভিহিত করেছেন। ভট্টদেবের গদ্যের নিদর্শন এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করে—

"শুকে কহন্ত, "হে মহাৰাজা, এই বিৰাট ধাৰণা কৰি পূৰ্ব্বত ব্রহ্ম হৰিক তুষ্ট কৰাই জগত স্রজিলা। আৰে তাৰ সাধ্য সূক্ষ্ম ধাৰণা শুনা, যাক ঢাকি বেদে নানা কৰ্ম্ম কহে, যাৰ ফলে পুৰুষে সংসাৰত ফুৰে। এতেকে বিৱেকীজনে আন কৰ্ম্ম এৰি দেহ-নির্ব্বাহৰ অর্থে যত্ন কৰিব, অধিক নকৰিব, তাকো সুখ-বুদ্ধি নেদিব। তাকো যদি শ্রম দেখে এমনে প্রবর্ত্তিবঃ মাটিত নিদ্রা আসিলে পাটীক লাগি যত্ন নকৰিব। বাহু শিথান হৈলে গাণ্ডুত যত্ন নকৰিব। অঞ্জলি থাকিতে ঝাৰি-খুৰিত কি কার্য্য? এতেকে মহন্তসরে আপুনাৰ হৃদয়ত হৰিক চিন্তে। হৰিৰ ৰূপ শুনা ঃ শ্যাম-শৰীৰ, পীত-বসন, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধাৰী, প্রসন্ন-মুখ, কমল-লোচন, নীল-আকুঞ্চিত-কেশ, কিৰীটি-কুণ্ডল হাৰ -অঙ্গদ-বলয়-আঙ্গুৰী-মেখলা-কিঙ্কিণী-নূপুরে অলঙ্কৃত, শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বনলতা-আলাতা, হাস্যবদন, সদয়-নিৰীক্ষণ। এমনে সর্ব্বাঙ্গ চিন্তিব; পাছে চৰণৰপৰা আস্য পর্যান্তে একৈক অঙ্গ চিন্তব। যাৰে ই ৰূপত প্রীতি নুপজে, তাৰে পূর্বোক্ত স্থূল ধাৰণাও কৰিব।"

ভট্টদেব নিজের ভণিতায় 'কবিরত্ন' নামটি বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন। হেমচন্দ্র গোস্বামীর কথা-গীতার ভাষার কোমলতার সম্পর্কে করা মন্তব্যের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কথা-গীতার ভাষা যথার্থই গুরু-গম্ভীর সাধু ভাষা। বিরিঞ্চকুমার বরুয়া বলেছেন,

"চুটি চুটি বাক্য-সংযোগেৰে গধুৰ বিষয়বস্তু লেখকৰ অতুলনীয় ৰচনা ক্ষমতা পৰিলক্ষিত হৈছে।... এনেহে লাগে যেন নামঘৰত ৰাইজ গোট খাইছে আৰু ভাগবতীয়ে শাস্ত্র পাঠ কৰি টীকাসহ ব্যাখ্যা কৰিছে, মাজে মাজে গভীৰ বিষয়ৰ প্রশ্ন তুলি নিজেই যেন তাৰ সমাধান কৰিছে।"

(ছোট-ছোট বাক্য-সংযোগে গভীর বিষয়বস্তু বোঝাতে লেখকের অতুলনীয় রচনাক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়েছে।... এরকম মনে হয় যেন নামঘরে জনতা জমায়েত হয়েছে এবং ভাগবত পাঠক টীকা সহ ব্যাখ্যা করছেন, মাঝে মাঝে গভীর বিষয়ের প্রশ্ন তুলে নিজেই যেন তার সমাধান করছেন।) প্রকারান্তরে বলা যায়, শ্রোতাকে সামনে রেখে বলে যাওয়া গীতার তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা ভট্টদেবের অসামান্য প্রতিভার কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভট্টদেব নিজেই ছিলেন সংস্কৃতে বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি 'ভক্তিসার' নামে একটি সংস্কৃত পুঁথি রচনা করেছেন। তাঁর 'শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক' গ্রন্থটি অধ্যাপক লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদনা করে প্রকাশ করে গেছেন। কথা ভাগবতের বেশ কয়েকটি খণ্ড 'শ্রীমদ্ভাগবতকথা' শিরোনামে মহেশ্বর নেওগ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। তদুপরি নলবাড়ির পূর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ভট্টদেবের রচনাবলি একত্রে ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছেন।

'কথা-গীতা' বা 'ভাগবত-কথা' গ্রন্থ মূলের সরাসরি অনুবাদ নয়, বরং বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম ও আত্মসাৎ করে নিজের মতো করে প্রকাশের মধ্যেই ভট্টদেবের মৌলিকতা এবং রচনারীতির সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলেছেন—

"ভট্টদেৱৰ শব্দ সংগঠন সংস্কৃত প্রভাবান্বিত আৰু সংস্কৃত ব্যাকৰণ অনুসৃত। গতিকে এক প্রকাৰে তাক

নিখুঁত বুলি দর্শাব পাৰি। শব্দৰ ব্যৱহাৰো সঙ্গত হৈছে। শব্দৰ সুসঙ্গত প্রয়োগত ভাব প্রকাশ সুস্পষ্ট হয় আৰু উদ্দেশ্যও সফল হয়।"

(ভট্টদেবের শব্দ সংগঠন সংস্কৃত প্রভাবান্বিত এবং ব্যাকরণ অনুসৃত। কাজেই তাকে এক প্রকার নিখুঁত বলে দেখাতে পারি। শব্দের ব্যবহারও সংগত হয়েছে। শব্দের সুসংগত প্রয়োগে ভাবের প্রকাশ সুস্পষ্ট হয় এবং লেখকের উদ্দেশ্যও সফল হয়।)

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের একজন পণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'আসাম ছাত্র সম্মিলন'-এর তেজপুরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তির ভাষণ থেকে কিছু কথা নীচে তুলে ধরছি—

> It should naturally thrill your hearts with pride that the great apostles of Vaishnavism in Assam, namely Sankar Deva and his worthy disciple Madhava Deva, both of them Kayasthas and who were precursors of Chaitanya wrote their classical works in verse at a time when Bengali had not produced a Krittivasa or a Kashiram Dasa nor even a prose literature worth the name. Indeed, the prose Gita of Bhattadeva composed in the sixteenth century is unique of its kind. Since I penned these lines I had an opportunity of coming across an excellent edition of this book (Katha Gita) which we owe to the patriotism and scholarchip of Pandit Hemchandra Goswami. It is a valueless treasure. Assamese prose literature developed to stage in the far distant sixteenth century which no other literature of the world reached except the writing of Hooker and Latimer in England.
>
> There has been a controversy for long about the independence and identity of the Assamese language. This is extremely foolish.

ভট্টদেবের গদ্য অঙ্কীয়া নাটের অসমিয়া ব্রজাবলী থেকে শিষ্ট অসমিয়া গদ্যের স্তর ষোলো শতকে প্রতিষ্ঠা করে। তদুপরি তাঁর ভাগবত কথার গদ্য অসমিয়া গদ্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। কখনো ভাবকে অধিক প্রকাশযোগ্য করে তুলতে ব্যবহার করেছেন কথা গদ্যের মতো ছোট ছোট বাক্য এবং কখনো-বা বিষয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে বাক্য রচনা করেছেন। বাক্যের এই দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তদুপরি অক্ষরবিন্যাসে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ মেনে চলার ফলে শব্দের রূপ স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত আদর্শকে অনুসরণ করেছে। অসমিয়া লিখিত গদ্যের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর ভট্টদেবের হাতেই সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

॥ চার ॥

**অসমিয়া লিখিত গদ্যের প্রথম পর্বের বিস্তার**

বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলেছেন, "ভট্টদেৱৰ ৰচনাৰ ৰীতি অনুসৰণ কৰি সমসাময়িক ভালেমান পণ্ডিতে সংস্কৃত পুথি অসমীয়া গদ্যলৈ অনুবাদ কৰে। এইসকলোবোৰ পুথি এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই।"

(ভট্টদেবের রচনার রীতি অনুসরণ করে সমসাময়িক অনেক পণ্ডিত সংস্কৃত পুথি অসমিয়া গদ্যে অনুবাদ করেন। এই সবগুলো পুথি এখনও জনসম্মুখে আসেনি।)

সাধারণত সংস্কৃত পুঁথির টীকা ভাষ্য টীকাকার পণ্ডিতেরা সংস্কৃতেই করেছিলেন। অসমেও শংকরদেব তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থের টীকা সংস্কৃত ভাষাতেই করেছেন। লক্ষণীয় যে অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত অসমিয়া পুঁথির টীকাভাষ্যের গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। এরকম প্রথম গ্রন্থ হল মাধবদেবের 'নামঘোষা' পুঁথির পরশুরামের করা গদ্য অনুবাদ—'কথাঘোষা'। এই গ্রন্থে প্রত্যেক স্তবকে ঘোষা তুলে ধরে গদ্যে তার অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তদুপরি প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক মনে করে টীকা সংযোগ করা হয়েছে। এই পুঁথি ১৬৩৭ শকে অর্থাৎ ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হয়েছে। একই সময়ে গদ্যে আরো কয়েকটি পুঁথি রচিত হয়েছে। তার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সাত্বত তন্ত্র পুঁথির অনুবাদ, রঘুনাথ মহন্তের কথা-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থও স্মরণীয়। হেমচন্দ্র গোস্বামী 'অসমীয়া পুথির বর্ণনাত্মক তালিকা' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকশিত হেমচন্দ্র গোস্বামীর Descriptive Catalogue of Assamese Manuscript) শীর্ষক গ্রন্থে 'পদ্মপুরাণ' নামে একটি গদ্য পুঁথি (১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)-র উল্লেখ করেছেন। এই পুঁথির ভাষা ভট্টদেব বা তাঁর পরবর্তী লেখকদের মতো নয়। বরং কথিত শিষ্ট গদ্যের আদর্শ হয়ে পড়েছে। এই সময়ের অসমিয়া গদ্য পুঁথিগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত ও অধীত হয়নি।

### ব্যাবহারিক বিষয়ের পুঁথির গদ্য

ঊনবিংশ শতকের পূর্বে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের পুঁথিগুলি অসমিয়া গদ্যের বিকাশ ও বিবর্তনের এক বিশেষ অধ্যায়ের পরিচয়বাহী। এই পুঁথিগুলির মধ্যে অনেকগুলির বিষয় সংস্কৃত থেকে অনুবাদ নতুবা সংস্কৃতকে আধার করে রচনা করা হয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুবাদ করা এরকম পুঁথিতে সংস্কৃতের প্রভাব থাকলেও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের ব্যাখ্যার সময় তৎসম শব্দ ব্যবহার না-করে কথ্য শিষ্ট গদ্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এইসব গ্রন্থের মধ্যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, নিদান, জ্যোতিষ, অঙ্কের আর্যা, নৃত্য-গীতের পুঁথি, ঘরদুয়ার নির্মাণ বিষয়ক পুঁথি প্রভৃতি প্রধান। হস্তিবিদ্যার্ণব, ঘোড়ানিদান প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমেই হস্তায়ুর্বেদ নামের সংস্কৃত গ্রন্থটিও রচিত হয়েছিল। হস্তিবিদ্যার্ণব সচিত্র গ্রন্থ। এর ভাষার দুটি উদাহরণ নীচে তুলে ধরা হল—

ক) সিকলৰ আগ-মঙ্গহৰ পৰা জি জাত হস্তি হৈছে তাৰ লক্ষণ কাণৰ ওপৰ ভাগ ডুখৰিয়া হেঙুলৰ বর্ণৰ সদৃশ তাৰ প্রকৃতি বালকে ওঁমোলাভাৱে ঊমলি থাকে। এই হস্তি ছন্দনৰ গছ থকা হাবিত থাকে। এক দেউঁবৃসিএ অৰণ্যত ফুৰোতে সেই হস্তিক দেখি সাম্পতি নামে ৰাজাত কলেহি। পাছে ৰাজায়ে গৈ সেই হস্তিক ধৰি আনিলে। তাৰে পৰা অনেক ৰাজ্যলৈ বিয়াপিল। এতেকে ৰাজাসকলে এনে হস্তিক ছিনি ৰাজ্যলৈ আনিব তেহে ৰাজাৰ সম্পত্তি বাঢ়ে। তাত জি মাউত উঠিব তাৰ লক্ষণ। তাৰ জন্ম পুস মাসত হ'ব ধনুৰসিয়া বানৰবর্গ গাৰবর্ণ কলা হ'ব দিঘলে তিনি হাত এক বেগত হয়। এনে মাউঁত টো উঠি টিপনি নেৰিব জদি মন বাঢ়ে তেহে খুছিব তেহে ভাল।

খ) ঘোৰা টাঙ্গন ব্যাধি

লক্ষণ— এক ভৰি খোৰাই যদি তাকে ঘোৰা টাঙ্গন ব্যাধি বোলে। দৰৱ— তিনটা বেত গজালি পুৰিব, তেজমুইৰ সিফা, দোম চোৰথৰ সিফা, ভোটাজালুক তিনিকো একত্র কৰি বঙ্গ লালোনৰে খুৱাব ঘোৰাটাঙ্গন ব্যাধি নাস। অথবা লাইতৰুণ নাঙ্গল ভঙ্গাৰ সিপা, তেজমুইৰ সিপা গুনৰাজ, হাগা দেণ্ডাৰাৰ গু উইৰ মাটি সবাকে একত্র কৰি খুন্দি টেকেলিত ভৰাব। গুনৰাজ করা ভাটুৰি, ৰতৰাজ তিনিকো খুন্দি টুপলিকৈ টেকেলি মুখত দি তপতাই সেক দিব ঘোৰা টাঙ্গন ব্যাধি নাস।

এই গদ্য অসমিয়া বুরঞ্জীর গদ্যের স্তরের। ধর্ম সম্বন্ধীয় পুঁথির গদ্য থেকে কথ্যভাষার গদ্যে অসমিয়া লিখিত গদ্যের বিবর্তন মধ্যযুগে এভাবেই ঘটেছিল।

॥ পাঁচ ॥

### কাল-নিরপেক্ষ গদ্য

অসমিয়া মন্ত্র সাহিত্য অসমিয়া গদ্যের অন্য এক নিদর্শন। এই গদ্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিতে আর্য ও অ-আর্য দুই ধারারই প্রভাব পড়েছে। একদিকে অথর্ববেদের যেমন উল্লেখ আছে অন্যদিকে এই গদ্যে বিভিন্ন অসমিয়া লোকভাষা এবং অ-আর্য লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতির প্রভাবও পড়েছে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, ভূত, প্রেত, ডাইনি, যক্ষিণী, দৈত্য, দানব, জীব-জন্তু, সরীসৃপ, অপেশ্বরী, বুঢ়াডাঙ্গরীয়া ইত্যাদি লোককল্পনায় প্রবেশ করে মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে বিশ্বাস করে লৌকিক-অলৌকিক অনেক বিষয় থেকে রক্ষা পেতে ঝাড়-ফুঁক, বনৌষধির ব্যবহার ইত্যাদির প্রয়োগবিধির সঙ্গে মন্ত্রগুলি জড়িত। অন্যদিকে কোনো অপ্রিয় ব্যক্তির বা শত্রুর ক্ষতি বা অমঙ্গল করার জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রও আছে। তার সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য সেই লোকের চুল, নখ, পরার কাপড়ের অংশ ইত্যাদি সামগ্রী ব্যবহার করার বিধান আছে। শুধু তা-ই নয়, কাউকে আকর্ষণ করতে, বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য, বিবাহ ভেঙে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত কিছু মন্ত্রও প্রচলিত ছিল। এইগুলি অথর্ববেদের 'স্ত্রী-কর্মাণি'-র সঙ্গে মেলে। অপদেবতা তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রে যেমন গালি-শাপ দেওয়ার, হুমকি দেওয়ার, ভয় দেখানোর মন্ত্র আছে তেমনি সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত কিছু ভালো শব্দও আছে। মন্ত্রপুঁথিসমূহের নামগুলিই ভিতরের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয়। যেমন পক্ষীরাজ মন্ত্র যাতে বন্ধন করার উদ্দেশ্য আছে, সুদর্শন মন্ত্র যাতে ক্ষতি বা অমঙ্গল ঘটানোর বিষয় নষ্ট করার মন্ত্র আছে। তাম্বুল ঝেড়ে দেওয়া, ফুল ঝেড়ে দেওয়া, কলাপাতা ঝেড়ে দেওয়া, শসা ঝেড়ে দেওয়ার মন্ত্র আছে। করতী মন্ত্রপুঁথির কয়েকটি ভাগ আছে— বরকরতী, সরুকরতী, ব্রহ্মকরতী প্রভৃতি মন্ত্রপুঁথি। সবগুলির মধ্যে সরাসরি গদ্যের ব্যবহার থাকলেও প্রয়োগরীতিতে দ্রুতলয়ের ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মন্ত্রপুঁথিগুলির

গদ্যে যেমন প্রাক্-শংকর যুগের দুই-একটি প্রসঙ্গ আছে তেমনই শংকর-যুগ এবং শংকরোত্তর যুগের ভাষার ও বিষয়ের প্রসঙ্গও রয়েছে। তা ছাড়া মহাযানী বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবও এতে পড়েছে। অন্যদিকে লৌকিক আখ্যান, লোকবিশ্বাস এবং লোককল্পনা ইত্যাদির প্রভাবে মন্ত্রগুলি লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ আর উপাদান ধরে রেখেছে। এমন-কি ইসলামীয় দুই-একটি শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়। মন্ত্রপুঁথির গদ্যের অল্প কিছু নিদর্শন নীচে দেওয়া হল—

ক) মহাদেৱৰ আজ্ঞা দুর্গাব বৰ। বান্ধিলো বিড়া পশি থাক ঘৰ। মোহোৰ হুঙ্কাৰ মহাদেৱৰ বৰ। উত্তৰে বান্ধো কুবেৰৰ গড়। আকাশে বান্ধো দেৱতাগণ পাতালে বান্ধো ধনপতিগণ। জলে বন্দি কৰো জল কোৱাঁৰ সশ্যে বন্দি কৰোঁ চুচিয়া গণ।

খ) ওঙ্কাৰ শবদে ব্রহ্মাকে স্মৰিলা। চাৰিখান বিদ্যা এৰি বাপৰ বিদ্যা কাটো। বায়ু বান কাটো। ইন্দ্র বান কাটো। চন্দ্র বান কাটো। সূর্য্য বান কাটো। চন্দ্র শৰ কৰো খণ্ড খণ্ড। মহেশ্বৰৰ আজ্ঞা কুমন্ত্র কাটি কৰো ৰণ্ড ভণ্ড। কুরু মহেশ্বৰৰ শৰ কাটো। বায়ু শৰ কাটো। বহ্নি শৰ কাটো। মুষ্ঠি শৰ কাটো। উলতা শৰ কাটো। পালটা শৰ কাটো। উভতা শৰ কাটো।

গ) সুদর্শন চক্রৰ ভয়ত পলোৱা ভূত-প্রেতৰ বর্ণনা থকা এটি মন্ত্র এনে ধৰণৰ — কাৰো একো খান কাণ কুলাৰ সমান। এক কাণে দুই আৰু চাৰি কাণ। এক ভৰি দুই ভৰি কাৰো কোঙা ভৰি। চক্রৰ ভয়ত সবে পলাই লৱৰি। অতি কতো ঢেলা কতো কলা কতো কুজা কতো খোলা কতো বেজীমুৱা। কতো দান্ত আছন্ত জোঙ্গা জোঙ্গা। চক্রৰ ভয়ত লাগ পলাই নিৰন্তৰ।

গদ্য-পদ্য মিশ্রিত এই রচনাগুলিই অসমিয়া গদ্যের একটি কাল-নিরপেক্ষ মিশ্রিত রূপ ধরে রেখেছে।

॥ ছয় ॥

**বুরঞ্জীর গদ্য : কথিত মান্যভাষার শিষ্টরূপ**

অসমিয়া গদ্যের একটি নিটোল রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে অসমের বুরঞ্জীর মধ্যে। বুরঞ্জী শব্দের অর্থ হল জ্ঞানের ভাণ্ডার। তেরো শতকে (১২২৮) চুকাফার নেতৃত্বে আহোমরা বর্তমান অসমের উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে এই দেশে প্রবেশ করে। চুকাফা স্থানীয় বরাহী, মরাণ আদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সঙ্গে আগত লেখকদের আদেশ করেছিলেন 'যা দেখেছ, যা শুনেছ' সব লিখে যেতে। টাই-আহোম ভাষায় বুরঞ্জী লেখার এটাই ছিল সূত্রপাত। এর পর প্রত্যেক স্বর্গদেবের (রাজার) বুরঞ্জী লেখার জন্য নিযুক্ত করা লোকেরা সব ঘটনা লিখে গিয়েছিলেন। সব রাজকুমার ও পাত্রমন্ত্রীরা সকলে বুরঞ্জী জানা এবং বুরঞ্জী লিখে বা লিখিয়ে সংরক্ষণ করার কাজকে একটি দায়িত্বরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে আহোম ভাষায় বুরঞ্জী লেখা হলেও রাজা ও পাত্রমন্ত্রীদের তথা পদস্থ আধিকারিকদের প্রজার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল সে-সময়ের অসমিয়া ভাষা। পরবর্তীকালে আহোম ভাষার পরিবর্তে অসমিয়া ভাষায় বুরঞ্জী রচনার প্রথা স্বাভাবিকভাবে প্রবর্তিত হল। সেকালের সমগ্র ভারতবর্ষে এরকম নিয়ম করে বুরঞ্জী লেখার রীতি অন্য কোথাও প্রচলিত থাকার কথা জানা যায় না।

অসম বুরঞ্জীর ভাষা প্রচলিত অসমিয়া ভাষার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। পরবর্তীকালে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচলিত অসমিয়া ভাষার মান্য রূপটির ভিত্তি গড়েছিল বুরঞ্জী সাহিত্যই। অসমিয়া বুরঞ্জী সাহিত্যের বিষয়ে Sir G.A. Grierson লিখেছেন—

> The Assamese are justly proud of their national literature. In no department have they been more successful than in a branch of study in which India, as a rule is curiously deficient. The historical works or Buranjis are numerous and voluminous. A knowledge of the Buranjis was an indispensible qualification to an Assamese gentleman. (Linguistic Survey of India).

বুরঞ্জীগুলি সম্ভ্রান্ত আধিকারিকদের দ্বারাই লেখানো হয়েছিল। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই ভাষা একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ মান্যরূপ লাভ করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে ঘটে-যাওয়া সত্য ঘটনার বিবরণ হওয়ায় ভাষায় অলংকারের ব্যবহার বা আবেগপ্রবণতা থাকার প্রশ্নও ছিল না। বুরঞ্জীর ভাষা ষোলো শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অসমিয়া ভাষার গদ্যের রূপকে ধরে রেখেছে। এই বিশাল বুরঞ্জী সাহিত্যের অধিকাংশ এখনও মুদ্রিত হয়নি। ড. সূর্যকুমার ভূঞা হরকান্ত বরুয়ার লেখা অসম বুরঞ্জী এবং দেওধাই অসম বুরঞ্জী, শ্রীনাথ বরবরুয়ার লেখা তুংখুঙীয়া বুরঞ্জী এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের কছারী বুরঞ্জী, জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী,

ত্রিপুরা বুরঞ্জী, সাতসরী অসম বুরঞ্জী প্রভৃতি বুরঞ্জী অসম সরকারের 'বুরঞ্জী ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ' থেকে প্রকাশ করেছেন। 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'ও পুরনো অসম বুরঞ্জী বের করেছেন। মুক্তি চৌধুরী ইতিপূর্বে ত্রিপুরা বুরঞ্জী বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী বলেছেন,

ইয়াৰ (পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ) লিখাত ক'তো বাহুল্য কথা নাই। ক'তো অতিৰঞ্জনৰ চেষ্টা নাই, ভাষা যেনে সৰল, তেনে আঁৰ নলগা কোনো সঁচা কথাকে গোপন কৰিবৰ চেষ্টা নাই। ৰজাঘৰৰ অনেক চেঁকা লগা কথাও এই বুৰঞ্জীত খোলাখুলিভাবে লিখা আছে।

[এর (পুরনো অসম বুরঞ্জীর) লেখায় কোথাও বাহুল্য কথা নেই। কোথাও অতিরঞ্জনের চেষ্টা নেই, ভাষা যেমন সরল, তেমনি নির্দোষ, কোনো সত্য কথা গোপন করার চেষ্টা নেই। রাজপরিবারের অনেক গুপ্ত কথাও এই বুরঞ্জীতে খোলাখুলিভাবে লেখা আছে।]

অন্যান্য বুরঞ্জীর ক্ষেত্রেও কম-বেশি পরিমাণে এই এক কথাই খাটে। অবশ্য লেখকভেদে নিজস্ব রচনাশৈলীর একটি বিশিষ্টতাও স্বাভাবিকভাবে অনুভব করা যায়। লক্ষণীয় যে সুকুমার মহন্তের বাড়িতে পাওয়া পুরনো বুরঞ্জীটিতে কিছু সংলাপ লিপিবদ্ধ করা আছে। যেমন—

১৪৭৭ শকের ১৪৯৮ জ্যৈষ্ঠ মাসে ২১ মঙ্গলবারে গোহাঁই বোলে—

"কালকেতু, ধুমা, উদ্ভণ্ড, চামৰায়, তহঁতক যে ৰাজ্য নৰনাৰায়ণে আমাৰ ঠাইক পঠাইছে কি নিমিত্তে?" কালকেতু চর্দ্দাৰে বোলে,— "স্বর্গদেও, আমাৰ নৰনাৰায়ণ ৰাজাএ আমি চাৰি জনকঁ ঠাইক পঠাইছে বোলে এইখান কহিবি যাই, — যেখন গৌড়েশ্বৰ সহিত সম্বন্ধ কৰিলেন সেকাল আমাৰ পিতা মহাৰাজ সহিত প্রীত হৈল। আৰ অত দিবস আমি জানিয়াছিল যে স্বর্গ ঁৰাজাসে আমাৰ আশ্রয়ৰ স্থান। আৰ ৰামচন্দ্র, হোমধৰ, দীপসিংহ ঁকোঁৱৰ ভ্রমৰাকুণ্ডত স্নান কৰিবাক গৈছিল, সেই জাজ্ঞাসৰ পৰা যে কোঁৱৰক মাৰি -ধৰি নেই ইগোট মিত্রৰ কোন ব্যবস্থাত কমাই হৈল?" আতে গোহাঁয়ে বুলিলে, বোলে,— "ক্ষেত্রিয়ৰ কত সম্বন্ধ ৰহে? আৰ দন্তে-ওঠেও কামোৰ খাই, তত্রাপিনেকি ভেদ কৰিবাক পাৰি? তাঞি যদি ঁঠাই মিত্রতা ৰাখে, এতেকে সমস্তে সিদ্ধি হৈতে আছে। আমি কি অধিক বুজাম।"

বুরঞ্জীর ভাষার আরো একটা উদাহরণ নীচে তুলে ধরা হল—

"বঙ্গাল (বংগৰ নৱাবৰ সৈন্যবাহিনী) দুই-চাৰি দিন ধৰি তিনি প্রহৰৰ বাট খেদি নি বিজুলী নদী পালেগৈ। পাচে আমাৰ মানুহে জীয়ায়ে ঘোঁৰা পালে ১৪০, হিলৈ পালে বৰে-সৰুৱে ৬০, গুলী-খাৰ ৩০০, ঢলা তৰোৱাল পালে ২৬৭, জামদাৰ খবুৱা পালে ৩০, বাৰু ১২৭, তামৰ বৰদবা ১, এই বস্তুসকল পাই নেওগৰ পুতেকেৰ ঠাইক দিলে। নেওগৰ পুতেকেও মহাৰাজাই দি পঠালে।"

আহোম স্বর্গদেবরা (রাজাগণ) প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে প্রয়োজনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেও সাধারণত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়াস করতেন। সেজন্য চিঠিপত্রে যোগাযোগও করতেন। এমন-কি, ফারসি ভাষায় লেখা চিঠি পড়ার জন্য রাজা 'ফার্চী জানা' মানুষ রেখেছিলেন। তা ছাড়া বঙ্গের নবাবের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করতে গিয়ে বাংলা প্রকাশভঙ্গির ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন। অনেক পণ্ডিত এই চিঠিগুলিকে বাংলা ভাষার নিদর্শনরূপে দেখাতে চেয়েছেন। এই ধারণা ঠিক নয়। এমন-কি দেখা গেছে যে অনেক অসমিয়া শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি না-বোঝার ফলে পাঠোদ্ধারে ভুল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অসমিয়া, বাংলা, ফারসি স্থানভেদে মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল। মোমাই তামুলী বরবরুয়ার আলিয়ারখাঁকে লেখা চিঠির একাংশ নীচে তুলে ধরা হল—

স্বস্তি নিখিলগুণৈক ধামসর্ব্বোপমাযোগ্য শ্রীযুত নবাব আহলাদ খাঁ সুজাবৰেষু। সস্নেহপূর্ব্বক লেখনংকার্য্যঞ্চ। আগে তোমাৰ কুশল শুনি শ্রীল গুণৰ আশ্রয় সকলোপমাযোগ্য শ্রীযুত শুভচিত্ত স্নেহ কৰি লিখিছোঁ। আমাৰ কুশল সর্ব্বত্রে চাহি। পৰং সমাচাৰ তোমাৰ কুশল শুনি পৰম সন্তোষ। উকীল চেকমেদা ও কটকী মুখে তোমাৰ কুশল শুনিয়া পৰম সন্তোষ হৈলাম। আৰ তুমি বুলি আছা উত্তৰে বৰনদী, দক্ষিণে অসুৰ-আলি ইতিমধ্যে বন্ধ-নিবন্ধানুক্রমে বদকৰাল হৈলে উভয় পক্ষ ৰক্ষা হয়।

তুংখুঙীয়া বুরঞ্জীর গদ্যশৈলী ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের অসমিয়া গদ্যশৈলীর নিদর্শন—

গৌৰীনাথসিংহ স্বর্গদেৱৰ পাছত, আন কোনো কোঁৱৰক ৰাজপাট খাবলৈ উপযুক্ত বিবেচনা নকৰি পূর্ণানন্দ

বুঢ়াগোঁহাই আৰু আনোসব পাত্ৰ-মন্ত্ৰীয়ে কিনাৰাম গোঁহাইক ৰজাৰ উপযুক্ত বুলি আনিলে। এওঁ মহাৰাজ ৰুদ্ৰসিংহ ঁদেৱৰ ভায়েক লেচাই নামৰূপীয়া ৰজাৰ পুতেক আয়ুসূত গোহাঁইৰ পুতেক কদমদীঘলৰ সন্তান আছিল। ১৭১৭ শকৰ শাওণৰ ২৩ দিন যাওঁতে ডাঙ্গৰীয়াসকলে গোহাঁয়ে কমলেশ্বৰ সিংহ নাম থ'লে। এওঁৰ মৃত্যুত ভায়েক চন্দ্ৰকান্তসিংহ চাৰিঙ্গী ৰজা ঁদেৱ হ'ল, ১৭৩২ শক ৬ মাঘ। মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই প্ৰমুখ্যে অন্য বিষয়াসকলে চন্দ্ৰকান্তক ৰজা ভাঙ্গি ৰাজেশ্বৰসিংহ ঁদেৱৰ নাতিয়েক ব্ৰজনাথ গোহাঁইদেৱৰ পুতেকক পুৱন্দৰ সিংহক ৰজা পাতে, ১৭৩৯ শকৰ ১১ ফাগুন।

রাজাদের লেখা চিঠির আরম্ভ সংস্কৃতে করে পরের অংশ আঞ্চলিক ভাষার গদ্যে লেখা এক প্রকার নিয়ম ছিল। তা ছাড়া চিঠির গদ্যে একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। সেটা হল, যাকে চিঠি লেখা হয়েছে সেই প্রাপকের কাছে যাতে ভাষাটি বোধগম্য হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। কোচবিহারের রাজার আহোম রাজাকে এবং আহোম রাজার কোচরাজাকে দেওয়া চিঠি-পত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বুরঞ্জীর গদ্যের একটি বৈশিষ্ট্য হল ভাবপ্রকাশের জন্য অনেক সময় ছোট-ছোট বাক্যের প্রয়োগ। দীর্ঘ বাক্য যে নেই তা নয় কিন্তু যৌগিক বাক্যের ব্যবহার ছিল না, যদিও পরবর্তীকালে বুরঞ্জীর মুদ্রিতরূপে সম্পাদক যতিচিহ্ন, ঊর্ধ্বকমা ইত্যাদির ব্যবহার করে আধুনিক পাঠকের কাছে বুরঞ্জীর অধ্যয়ন সহজেই গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। পুরনো বুরঞ্জীর পাতায় এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি, কোলন চিহ্ন ইত্যাদির প্রয়োগ ছিল। যতিচিহ্নের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে করেন মিশনারিরা।

বুরঞ্জী ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পুরনো রীতিতেও লেখা হয়েছিল। এমন-কি গদ্যের স্থানে পদ্যেও দুটি বুরঞ্জী লেখা হয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আসার পরে পুরন্দর সিংহের রাজসভার আধিকারিক কাশীনাথ দ্বিজ তামুলীফুকন 'আসাম বুরঞ্জী' পুঁথিতে অসমের ইন্দ্রবংশীয় মহারাজাদের বিবরণ গদ্যে দিয়েছেন। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মণিরাম দেওয়ান 'বুরঞ্জী বিবেকরত্ন' নামে দুই খণ্ডে একটি বুরঞ্জী লেখেন। অসমে মানের তৃতীয়বার আক্রমণের সময় চারিঙ-এর রামদত্ত তাঁর পুত্র মণিরামকে নিয়ে উজান অসম থেকে সপরিবারে যোগীঘোপা, চিলমারী, বঙালকাটা ইত্যাদি স্থানে ঘোরাঘুরি করে গোয়ালপাড়ায় এসে অবস্থান করেন। এভাবে থাকার সময় রামদত্ত নবদ্বীপের একজন বাঙালি পণ্ডিতকে নিয়ে এসে মণিরামের সংস্কৃত, বাংলা এবং ফারসি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মণিরাম অসম থেকে মান চলে যাওয়ার পরে উত্তরে ফিরে আসেন। এবং ইতিমধ্যে অসমে শাসন কায়েমকারী ব্রিটিশকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এই আশায় যে, ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ঘোষণা করেছিল মান যাওয়ার পর অসম রাজ্য অসমের রাজাকে ফেরত দেবে। সে যা-ই হোক, মণিরাম নিজের অনুপ্রেরণাতেই দুই খণ্ডে অসমের একটি বুরঞ্জী লিখতে শুরু করেন এবং ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন। এই বুরঞ্জীটির ভাষায় অসমিয়া, সংস্কৃত, বাংলা এবং মাঝে মাঝে ফারসি শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়। বুরঞ্জী গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর প্রথম পরিচয় অংশ সংস্কৃত, পরের অনুচ্ছেদের ভাষা বাংলা আর তৃতীয় অনুচ্ছেদে অসমিয়া ও বাংলা মেশানো ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এর পরের কয়েকটি অংশ অসমিয়া এবং একটি অংশ বাংলায় আরম্ভ করে পরে অসমিয়াতে স্বচ্ছন্দে পরিবর্তিত হয়েছে। এরকম মিশ্রণের প্রধান কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার প্রথমে প্রশাসনে অসমিয়া ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেছিলেন, যদিও ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে অপরিচিত অসমিয়াদের পক্ষে প্রশাসনিক দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালিত না-হওয়ায় ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কলকাতার বাঙালি কর্মচারী এনে নিযুক্ত করতে শুরু করেন। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির ২৯ নং আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা প্রশাসন ও আদালতের ভাষারূপে প্রবর্তন করা হয়। প্রথম অবস্থায় অসমে ব্রিটিশরা অসমিয়া ভাষা ব্যবহার করলেও উল্লিখিত আইনের বলে অসমে অসমিয়া ভাষার স্থানে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করা হল। তার কারণ, ব্রিটিশ শক্তি ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে অসম অধিকার করলেও অসমকে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে গঠন করার পরিবর্তে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করে বঙ্গের অংশরূপে শাসন চালাতে শুরু করে। তাই আইন অনুসারে বঙ্গদেশে যেহেতু বাংলা ভাষা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তিত ছিল, বঙ্গের অংশ হিসাবে অসমেও এই ভাষা প্রবর্তিত হল। এখানে সংক্ষেপে একটি বিষয় বলে রাখি। সেই সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে অসমিয়া ভাষা সম্পর্কে উচ্চ শ্রেণির অসমিয়া, ইংরেজ আধিকারিক এবং বাঙালি কর্মচারীদের মনে গেড়ে-বসা এক ভ্রান্ত ধারণার কথা বলা প্রয়োজন। শাসিত ব্যক্তিরা শাসকদের সব বিষয়ে উচ্চস্তরের বলে স্বভাবতই গণ্য করে। তাই হলিরাম

ঢেকিয়াল ফুকন, মণিরাম দেওয়ান প্রমুখের মতো অসমিয়াদের মনেও ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে জড়িত ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা তাঁদের নিজস্ব অসমিয়া ভাষার চেয়ে উন্নত বলে ধারণা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত একই উৎস থেকে সৃষ্ট অসমিয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যে বিদ্যমান অনেক সাদৃশ্যও ব্রিটিশ ও বাঙালিদের মধ্যে এরকম একটি ধারণার জন্ম দিল যে অসমিয়া ভাষাটি বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা হতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময়ের অসমের কমিশনার জেনকিন্স ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'ফোর্ট উইলিয়াম'-এ পাঠানো প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন অসমের সব সরকারি কার্যালয়ে একশো শতাংশ বাঙালি নিযুক্ত হওয়ার তথ্য। এরকম এক অবস্থায় অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ইংরেজ ও বাঙালিদের মনে যে কোনো ধারণা ছিল না সে-কথা শুধু প্রমাণিতই হয়নি, সেইসঙ্গে অসমিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মনেও হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ের অসম ও বঙ্গের দুয়রীয়া বরুয়া (অনেক সময়ে দুয়লীয়া বরুয়াও বলা হয়) পদে থাকা হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন বাংলা ভাষায় 'আসাম বুরঞ্জী' লিখে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম ইতিহাস। মণিরাম দেওয়ানের 'বুরঞ্জি বিবেকরত্ন'ও মিশ্রিত ভাষার প্রয়োগে নিজস্ব ভাষা-সম্পর্কে প্রায় সমতুল্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। তাহলেও মণিরাম দেওয়ানের ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা হয়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে গিয়েও মণিরাম অসমিয়া বিভক্তি এবং প্রত্যয়ের ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো বাক্যে গেলেন, করিলেন প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়া এবং আসিয়া, বসিয়া, হইয়া ইত্যাদি অসমাপিকা বাংলা ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করলেও ডেকাহতে, পথারতে, সত্রতে, নকরতে, লওাতে, খাওতে, পাওাতে, হওয়াতে, নালরে, জানিবা, তাহান, কেঁচা প্রভৃতির ব্যবহারেও নিজস্ব ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশ রয়েছে। মণিরাম তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান হয়েছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ নাম ছিল মণিরাম দত্ত বরভাণ্ডার বরুয়া দেওয়ান।

অসমিয়া ভাষা-সম্পর্কে ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালিদেরও স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। বেশিরভাগ পণ্ডিতেরই প্রাচীন অসমিয়া ভাষা সম্পর্কে জানা ছিল না এবং ঊনবিংশ শতক থেকে যখন ক্রমে ক্রমে জানতে শুরু করলেন তখন তাঁরাও অসমিয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করে এই ভাষাকে বাংলা ভাষার উপভাষা রূপেই মনে করলেন এবং এমন-কি শঙ্করদেব-মাধবদেবের রচনা সহ প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্যকেও কোনো কোনো পণ্ডিত বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত বলে ভেবেছিলেন। তাই ব্রিটিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে অসমিয়া ভাষাকে এক জীবন-মরণ সংকটের সম্মুখীন হতে হল।

॥ সাত ॥

### অন্যান্য বিষয়ের গদ্য

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বুরঞ্জীর গদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো কয়েক প্রকারের গদ্য গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ভূমিদানফলকে ব্যবহৃত অসমিয়া গদ্য, রাজদরবারের রায়দানের গদ্য এবং বাক্সে ভরে-রাখা জমির দলিলের গদ্যের কথা বলা যায়। বর্মন বংশের কালে ভূমিদানের তাম্রশাসনে সংস্কৃত ব্যবহৃত হয়েছিল। আহোম শাসনকালে অসমিয়া ভাষার ব্যবহার শুরু হল। অবশ্য বিভিন্ন দেবালয় ও মন্দিরে ভূমিদানকালে শাসনগুলি সংস্কৃতেই লেখা হয়েছিল। অসমিয়া ভাষায় লেখা শাসনগুলির গদ্যের নমুনা নীচে তুলে ধরা হল—

ক) বেঙেনাআটি সত্রের ভূমিদান— এতদ্বিৰৰনং ১৬৯৯ শকত বেঙেনাআটী সত্ৰৰ এই তিনিজন দেৱতাক প্রতি ৰাজমাঐঁওদেৱৰ পুণ্যার্থে ঁৰে ভূমি সমেত এই মনুষ্যসকলক উৎসর্গি দেৱোত্তৰ কৰি দিলে আৰু এই তাম্রপত্রো কৰিলে।

ঁৰ আড্ডা বৰবৰুৱাত কৈ ঢেকিয়াল ফুকনে মজিন্দাৰে কাকত কটোৱা মানুহ ৰায়ডঙিয়া ফুকনৰ ভাগৰ সিঙিয়া খাতৰ বেঙেনাআটীত ভোগ ৰন্ধা ব্রাহ্মণ মন, ভাঃ সত।

খ) হয়গ্রীব-মাধবের অখণ্ড-প্রদীপের হয়ে দেবালয়ের জমির তাম্রফলক : শ্রীশ্রীস্বৰ্গনাৰায়ণদেৱৰ শ্রীগৌৰীনাথসিংহ নৰেশ্বৰে ঁ৭ শ্রীশ্রীহয়গ্রীৱ-মাধৱৰ অখণ্ড প্রদীপ জলাবৰ কাৰণে ৭২৭ পুৰা দেৱালয়ৰ জমি শ্রীকৃষ্ণদাহ আঠপৰীয়া ও শ্রীমোলান ভৰালকাকতিক তাম্রফলি কৰি দিয়ে। এই মাটীৰ ৰূপ শ্রীকৃষ্ণদাহ আঠপৰীয়া শ্রীমোলান ভৰালকাকতি। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সাধি থাকিব। ইতি। শক ১৭১০ ৯ কার্তিক।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের রাজদরবারের গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় সেই সময়ের রাজদরবারের বিচারের রায়দানের গদ্যে। এরকম গদ্যে দীর্ঘ একটি বাক্যেই সম্পূর্ণ রায় অন্তর্ভুক্ত করতে দেখা যায়। নীচে একটি দীর্ঘ রায়ের অংশ (সমগ্র রায়টি

অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় কেবল একটি অংশ তা থেকে উদ্ধৃত করা হল)—

এতদ্বিবৰণং শ্রীশংকৰ দেৱৰ বটদ্রৱা স্থানৰ নাম ঘৰৰ মৃতিকাৰে পৰা সলগুৰীয়া শ্রীৰাম চৰণ আতাবে নৰো আৰ শ্রীৰামদেৱ আতাৰে বিবাদ জন্মিলত ঁদেৱে কুঐে গঞা ৰাজমন্ত্রী শ্রীপূর্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঞি ডাঙৰীয়াকৈ সন্দিকৈৰ শ্রীভদ্রকান্ত বৰ বৰুৱাকে সুধিব দিলত দুয়োজনা ২ দুয়ো মহন্তক সাক্ষাৎ কৰি সুধি স্থানৰ ঠাইলৈকো লম্বো দোলাখৰিয়া বড়ুৱাকে চাউডাঙৰ বিদ্ধ সই কিয়াকে বৰবৰুৱাৰ টেকেলা বড়া চকৰ ধৰা হেমোদৰকে পঠাই স্থানৰ সমীপৰ মহন্ত ভকত চহৰিয়া দুয়োভাগৰ কেৱলিয়া আশ্রমী ভকত এই সকলকো একত্র কৰি দুয়োজন আতাক আগত থৈ সোধাত সেই সকলেও পূর্ব্বীয় ৰাজাসকলৰ সিদ্ধান্তনুসৰি স্থানৰ মাটিৰ সীমা দেখাই পদশিলা মাটি দুয়ো ভাগে সমে পাই বুলি কলত নৰোৱা আতা গাত বলৰে সজা নাম ঘৰটো সলগুৰীয়া আতাৰ ভাগৰ খুটাৰ ভিতৰত মাটি পৰিলত সোধাত নৰোআ আতা ঘাটিলত শলগুৰীয়া আতা জিকিলত ঁৰে ডাঙৰীয়া বৰুৱা সৈতে পূর্ব্ব সীমানাৰ দৰে মাটি ভাগ কৰি নামঘৰ দুয়োজনাৰ ভাগৰ মাটিত সাজি লবলৈ আজ্ঞা কৰি স্থানৰ মাটি খনিকো দুভাগ কৰি পদশিলাকো দুয়োভাগে ৰাখি খুটা মৰাই দি তৰে ধর্ম্মার্থে শ্রীশলগুৰীয়া ৰামচৰণ আতাক স্থানৰ + ভাগৰ + মাটি ভকত খনিয়ে সৈতে তাম্র পত্র কৰিক দিলে দুয়ো ভাগৰ মাটিৰ সীমা পূবে কঠাল পশ্চিমে পুলি শিমলু উত্তৰে কেলিকদম্ব দক্ষিণে কঠাল...

পেড়াকাকত শব্দটির অর্থ হল বাক্সে বা তোরঙে ভরে রাখা জমির দলিল। এই বাক্স বা তোরঙে রাখা দলিলের জন্য প্রথমে সাঁচিপাত ব্যবহার করা হলেও পরে হাতে প্রস্তুত করা তুলাপাতাও (তুলোট কাগজ) ব্যবহার করা হয়েছিল। এরকম কাগজে জমি ও মানুষের হিসাব লিখে রাখা হত। তদুপরি এভাবে রাখা জমি ও মানুষের হিসাব রাখার বাইরেও মানুষ ও জমির ক্ষেত্রে হওয়া বিচারের সিদ্ধান্ত এবং আদেশ-নির্দেশও পেড়াকাকতে লেখা হয়েছিল। তা ছাড়া 'বেটি বন্দি' (দাস-দাসী) বেচাকেনার রায় প্রভৃতিও সংরক্ষিত হয়েছিল। সেরকম পেড়াকাকতের নমুনা নীচে তুলে দেওয়া হল—

স্বস্তি শ্রীবিষুঞচৰণাম্বুজ...কমলেশ্বৰ সিংহ ভূপো...কামৰূপ দেশৰ বড়ুয়া ও বড়কায়স্থ ও চৌধাৰী ও পাটোৱালী ও তালুকদাৰ ও ঠাকুৰিয়া ও গয়ৰহ সকলেও জানিব পূর্ব্বে বঙ্গলা আমোলত চুলতান গেয়াচদ্দিন বলবন্ত মৃত্যু হোৱা থান হাজোৰ গৰুড়াচল পর্ব্বতৰ ওপৰে পওমোকা মর্চ্চিদত এবং ৰজোৱাত চাহ জাহানৰ পুত্র মহম্মদ চুজায়ে ফতিহা কৰি থাকিবাৰ জন্যে দি যোৱা মাটি মানুহ আৰু আচামি আমোল হ'লত সন্দিকৈ বৰফুকনে পৰে দৰঙ্গিৰজাই দি যোৱা মাটি মানুহ এই সকলোবোৰত অলবিন্ধ হৈছে যে শ্রীশ্রীকমলেশ্বৰ সিংহে শুনি ৰাজমন্ত্রি শ্রীবুড়া গোহাঞি ডাঙৰীয়াক বাহৱৰিয়া ৰুদ্র কটকীক পঠাই শ্রীবড়ফুকশত আজ্ঞা কোৰাই ফুকণৰে সজাতি কটকীএ মোকালৈকে গৈ মাটি মানুহ বুজ বিচাৰ কৰি আহি শ্রীবুড়া গোহাঞি ডাঙৰীয়াত জনালতহি শ্রীবুড়া গোহাঞি ডাঙৰিয়াই চুজাই দি যোৱা মহজৰ বোৰো আগলৈকে নিয়াই মজুন্দাৰ ৰড়ুয়াক আগত থৈ দেশি বিদেশি পার্চ্চি পঢ়াৰ মুখে সেই মহজৰ বোৰ শুনি, মহজৰো জীন্ন, অক্ষৰো উৰা, ফটাচিটা জোৰাদিয়া দেখি আৰু সকলোবোৰ মাটি মানুহ পীড়ৰ নামে নোলোৱাত হাল মৌৰলুক নামে ওলোৱাত মিথিলাৰ লগত অসমৰ বহু বিষয়ত মিল আছে। অন্য প্রসঙ্গত সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে।

॥ আট ॥

## গুরু-চরিতের গদ্য

মধ্যযুগের অসমে যেভাবে বুরঞ্জী লেখার প্রথা অসমিয়া ভাষায় ষোলো শতকে শুরু হয়েছিল তেমনই শ্রীমন্ত শংকরদেব, মাধবদেব প্রমুখ সন্ত তথা আতাদের জীবনচরিত লেখার প্রথাও আরম্ভ হয়েছিল। এই জীবনচরিত অবশ্য পদ্যে লেখা হয়েছিল। এরকম জীবনচরিতগুলিতে স্বাভাবিকভাবে সন্তদের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য অলৌকিক কাহিনিও ছিল না এমন নয়। কেবল অসমেই নয়, বিশ্বের যে-কোনো স্থানের ধর্মগুরুদের জীবনচরিতে এরকম বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজিতে ব্যবহৃত Hagiography শব্দটিতে কাল্পনিক কাহিনির বিশেষত্ব ধরে রাখার জন্য একসময় এরকম চরিতপুঁথিগুলির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু চরিতপুঁথিগুলির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ কল্প-কাহিনির আবরণ

সরিয়ে সত্য-কাহিনি তুলে ধরার ফলে এরকম গ্রন্থগুলিতে থাকা ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যবহারে আধুনিক কালে এখন আর কোনো বাধা নেই। সে যা-ই হোক, অসমের গুরু-চরিতগুলির অধিকাংশই হল শংকরদেব-মাধবদেব এবং আতাদের নিয়ে লেখা পুঁথি। গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল, ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে অর্থাৎ শংকরদেবের তিরোভাবের পর থেকে শংকরদেবের তিরোধান তিথিতে নাম-কীর্তন ইত্যাদি ছাড়াও তাঁকে স্মরণ করে কোনো একজন ব্যক্তির কিছু কথা বলার দৃষ্টান্ত থেকে পরে এরকম স্মরণ একটি প্রথায় পরিণত হল। এই প্রথাকে 'চরিত-তোলা-প্রথা' বলে অভিহিত করা হত। কমলাবাড়ি সত্রে এখনও গুরু-তিথিতে প্রথা অনুযায়ী দায়িত্বে থাকা একজন ব্যক্তি শংকরদেব-মাধবদেবের জীবন-বৃত্তান্ত কথায় তুলে ধরেন। এরকম দায়িত্বশীল ভকতকে, বয়সের দিক থেকে নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে, 'বুঢ়া ভকত' নামে অভিহিত করা হয়। এরকম ভকত সত্রের যে 'হাটী'*-তে বুঢ়া ভকত থাকেন সেই বসার স্থানকে 'বরবহা' বলা হয় এবং এরকম বহায় গুরুচরিতের বিশেষ চর্চা হয়। কখনো আবার কোনো কোনো ভকত গুরুচর্চা করতে নিজের বসার জায়গায় (বহা) অন্য ভকতকে নিমন্ত্রণ করেও আনেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এরকম চরিত-তোলা প্রথা মুখে মুখেই চলে আসছে। তাই বলার মানুষটি বা কথক সমস্ত গুরুচরিত যেভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন সেইভাবে কোথাও না-থেমে বলে গিয়েছেন। সেজন্য কথনশৈলীতে নিজের অভিজ্ঞতায় পাওয়া বিষয়বস্তু পরম বিশ্বাসে তুলে ধরার ফলে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গুরুচরিতে থাকা সত্রিয়া ভাষার কথনশৈলী। এই কথনশৈলীতে প্রথম পুরুষের একবচনের পরিবর্তে সর্বদা বহুবচন এবং যাঁদের সামনে কথা বলা হয় তাঁদেরও সরাসরি সম্বোধন না-করে বহুবচন ও কর্মবাচ্য প্রয়োগ করা হয়। যেমন 'আপনি ভাত খেয়েছেন কি' ('আপুনি ভাত খালেনে'), এভাবে না-বলে বলা হয়, 'আপনাদের সকলের চাল ধরা হয়েছে তো' ('আপোনাসবর চাউলমুঠি ধরা হ'লনে')। সেজন্য সত্রে একটি প্রবাদবাক্য আছে: 'আমি' নামে অহংকার, 'তুই' নামে গালি ('মই' নামে অহংকার, 'তই' নামে গালি)। গুরুচরিত কথার ভাষায় এই কথনশৈলীর স্বাদ আদ্যন্ত আছে। যতিচিহ্নের মধ্যে এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি এবং কোলন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল।

'গুরু চরিত কথা'-য় লেখকের নাম ছিল না। এখানে নামহীন বক্তা এবং শ্রোতা থাকে। বরপেটাসত্রে থাকা 'গুরু-চরিত-কথা' গ্রন্থটি প্রথমে উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু, পরে মহেশ্বর নেওগ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ড. মহেশ্বর নেওগ পরোক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অনুমান করেছেন, এই গ্রন্থটির বক্তা ধনঞ্জয় বৈরাগী বা চক্রপাণি বৈরাগী এবং এই কথাও অনুমান করা চলে যে হয় চক্রপাণি বৈরাগীর মুখের কথা তাঁর জীবনের শেষদিকে কেউ লিখে রেখেছিলেন, নয়তো ১৬৮০ শকে (১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) চক্রপাণি বৈরাগী আতের মৃত্যুর পরে চরিত পুঁথিটি সংকলিত হয়েছিল। মহেশ্বর নেওগ এরকম কথাই বলেছেন। পুঁথিটির ভাষায় থাকা আরবি, ফারসি, তুর্কি আর ইংরেজি মূলেরও কিছু শব্দ এই কথা প্রমাণ করে যে দিল্লির বাদশাহ এবং বঙ্গের নবাবের সঙ্গে অসমের যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এইসব শব্দ অসমিয়া ভাষায় প্রবেশ করেছিল। যেমন— কাজিখত, খবরদার, খাণ্ডান, গোলা, গোলাম, চকীদার, চফারী, চাকর, চিচা, চিপাহী, জংঘল, জমিদার, টুপী, ঠাণ্ডা, থানাদার, দোকান, দর্জী ইত্যাদি ইত্যাদি। শংকরদেবের তীর্থ ভ্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষারও দু-একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'গুরু চরিত কথা' ছাড়াও গদ্যে লেখা 'বরদোয়া চরিত' আদি পুঁথির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে গদ্যে লেখা 'গুরু চরিত' পুঁথি যেভাবে ভক্তিধর্মের সঙ্গে জড়িত একটি বিশিষ্ট অসমিয়া সত্রিয়া গদ্যশৈলী ধরে রেখেছে সেইভাবে অসমের বুরঞ্জীগুলিও ধরে রেখেছে অসমের মান্য গদ্য শিল্পের রূপ ও স্বরূপ। নীচে গুরু চরিত কথা-র ভাষার একটি আভাস তুলে ধরা হল—

ক) পাছে সূর্য্য ভূএগৰ দুহিতৃ আএ খুজি বাঢ়ি শুভ মাহ বাৰ তিথিত গুৰুজনৰ একৈচ বর্ষ আই চৈধে বর্ষত বিবাহ কৰালে। গুৰুজনাৰ বাইশ্য বৎসৰ ঃ আইৰ পোন্ধেৰে বর্ষত পুষ্পবৎসৰ হল। সান্তিৰনি কৰাই ৰতিসম্ভোগে আছে। সপ্তদশ বর্ষত মনুকন্যা জন্মিল ঃ ন মাহৰ অন্তে আই চলিল।। (আহিনৰ এদিন জাঞতে বুদবাৰে ঃ ৰামচন্দ্র কাথৰ বেটা হৰি জমাইত বিহা দি গৃহে থৈ গৈছে ঃ) কৃয়াকর্ম্ম আচৰি তেৰ বর্ষ ৰহি ঃ (কতো মুখভেদে কই তেহু বর্ষত আপিক

*'হাটী হল সত্রের নামঘর-মণিকূট, সত্রাধিকারের বাসস্থানের চারদিকে ভকতবৃন্দের থাকার দীর্ঘ এক-একটি ঘর। এরকম দীর্ঘ ঘরে এক-একজন ভকত থাকতে পারার মতো ভাগ-ভাগ করে এক-একটি নিজের 'বহা' (বসার) রূপে আজীবন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

হৰি জমাইত বিহা দি গৈছে) বিৰকত বৈৰাগ্য হৈ ঃ বাহুজন ভক্তেৰে পচিম ক্ষেত্র কৰিবলৈ জাত্রা কৰিলে। ৰামৰাম ঃ সৰ্ব্বজাই ঃ পৰ্ম্মানন্দ ঃ বলোৰাম ঃ বলোভদ্র ঃ গোবিন্দ ঃ নাৰায়ণ ঃ ৰৰচিৰামঃ গোপাল ঃ চোট বলোৰাম ঃ মুকুন্দ ঃ মুৰাৰি এইসৱ চাতেৰে ওলাই।।

খ) তৈতে গৰুড়পুৰাণ চাই ভকতি প্রদীপ কৰিলে ঃ হৰিবংশৰ পৰা ৰুক্মিণীহৰণ কৰিছে। তেহে বাহু কন্ধ কৰিবৰ মন দিলে ঃ মূল আর্ষা নাইকাৎ সুচক খলুৱা নিন্দে বুলি তোচা খাই আছে। তেনেতে পচিমৰ পৰা বাহু কন্ধ ভাগৱত লৈ ঃ জগদিশ মিশ্র পালেহি ঃ গাওঁমুৰতে ৰাই আতাক পাই বার্ত্তা সুধিলে ঃ শ্রীশংকৰ কৎ থাকে বহা ঃ বোলে আছে নাই ম চাই আহো ঃ তুমি খানেক তম্ভা।

গ) পাচে গুৰু সুধিলে ঃ তোম্রা কৰপৰা অহা জাই ঃ কি শাস্ত্র আৎ বিপ্রে বোলে বাৰানাসি তিৰুতিয়া গ্রামে গৃহ ঃ পঢ়িলো ব্রহ্মানন্দৰ ছাত্রসালে বাহু বর্ষ ঃ গুৰু নাম দিলে জগদীশ। । বাহু কন্ধ কণ্ঠোগত হৈ জগন্নাথলৈ সুনাবলৈ নিলো ঃ স্বপ্নত জগন্নাথে বোলে কিৱ আহিলা ঃ বোলো ভাগৱত সুনাবলৈ ঃ বোলে মই অন্তৰে চৈতন ঃ লোক দেখাই ঝৰভাএ আচো। দোষণ সিধান্ত কেনেকৈ দিম ঃ মই অৎ কলাহে পূন্নে শঙ্কৰ তৎহে ঃ তত্ত কলেহে আমিও পাওঁ শঙ্কৰেও পাই মাতা জগন্নাথ তাৰাহে জোৱাগৈ সুধি পূব দেশে বআদি গ্রাম ঃ চই মাসে সুধি পাইচোহি আপুনাক।

ঘ) পাছে দশম পঢ়োতে ওলাল ঃ বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি নন্দৰ পোক।। দেখাইলা বৈকুণ্ঠ ব্রজৰ লোক। সুনি ভক্তে প্রার্থনা কৰিলে বাৰেভূওঁগ সমে ঃ গোপ গুপিক জে কৃষ্ণে দেখালে আমাৰো কৃষ্ণ তুমি (চাবৰ) ইচা গৈচে দেখোৱা জক।। তেহে ভূওঁগসবে দল কৈলে ঃ গুৰু কপিলিমুখৰ কলঙ্গকাখৰ কুমাৰত খোল গৰালে জোখা দি ডাইনা সাত আঙ্গুল বেওঁগ তেৰ আঙ্গুল।। হল চালে ঃ (ঘুন দিবৰ ভূ নেপাই মাত নোলাই কষ্টপাই অসন্তোসে আছে ঘুমাই ভাত খাই পাতৰ কাকে ঠোট ঘহালে মাত ওলাল তেহে বৰা ভাতৰে খোলাগুৰি বটি দিছে ঃ) নাট সূত্র মর্ত্তা আৰিয়া জোকৈ পাতিলে ঃ (চন্মকৈ সন্ন্যাসী রূপ ধৰি একৰূপ ধৰি দেখাইচেহি লোক দেখাই) তুলাপাতত সাৎ বৈকুণ্ঠ লিখিছে ঃ কল্পতৰু দিবলৈ ভ্রম হৈ ঠগিৎ খাই আছে। চন্দৰি আএ ধান হতাইছিল ঃ বোলে ডেকাগিৰি সেইখিতে নিদিয়া কিয় ঃ শ্রীমন্দিৰ কাখে সপ্তম দ্বাৰ আগ কৈ।। তেহে গুৰু দিচে ঃ পচিমে বাহুভূওঁগ চাপি দৌল বান্ধি জাত্রা পাতিলে ঃ

॥ নয় ॥

## পরিবর্তনের যুগ

ব্রিটিশ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অসমিয়া ভাষার গদ্য সপ্তম শতক থেকে গঠিত হয়ে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হয়ে একটি উন্নত বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। এই কথা সর্বদা স্মরণযোগ্য যে কোনো ভাষা এককভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে না, বিকশিত হতে পারে না। ভাষার সঙ্গে সমাজ ও সভ্যতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটি ভাষার প্রত্যেক শব্দই তার নিজের নৃতাত্ত্বিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির মধ্য থেকে সৃজিত হয়। সমাজ জীবনে ঘটে-যাওয়া বিভিন্ন সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির ফলে কখনো জনসংকোচন, কখনো জনবিস্ফোরণ ঘটে। তদুপরি স্বাভাবিক অভিবাসনও এরকম বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। মানুষের সঙ্গে হওয়া সংঘাত ও সমন্বয় মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। তদুপরি সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয়ের সঙ্গে আসা নতুন নতুন শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি ভাষার পরিবর্তন সাধন করে। অসমিয়া ভাষা কমপক্ষেও এক হাজার বছর ধরে এরকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশপূর্ব যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। অবশ্য এই প্রবাহ নিঃসন্দেহে সর্বাধুনিক কাল পর্যন্ত ছিল ধীর গতির। অসমিয়া ভাষা এই সময়সীমার মধ্যে তৎসম, তদ্ভব এবং দেশী শব্দভাণ্ডার ছাড়াও বাংলা, মৈথিলী, ওড়িয়া, হিন্দি, উর্দু, ফারসি, আরবি, তুর্কি, ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আসা পশ্চিমের অন্যান্য ভাষার কম সংখ্যক হলেও শব্দ আহরণ করেছে এবং এই শব্দগুলি ভাষাটির মধ্যে মিশ্রিত হয়ে একে সমৃদ্ধি দান করেছে। কখনো ভাষাটি নিজের দুই-একটি শব্দের স্থানে বাইরে থেকে আসা শব্দ নিজের করে নিয়েও এরকম সমৃদ্ধি সাধন করেছে। ব্রিটিশ আসার পূর্ব পর্যন্ত অসমিয়া ভাষা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত

হয়ে এসেছিল। এই নিয়ন্ত্রণ কিছু পরিমাণে ব্রিটিশ যুগ আরম্ভ হওয়ার পরে পরিবর্তনের সম্মুখীন হলেও পুনরায় সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ইংরেজি ব্যাকরণেরও কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে ভাষাটি নতুন পথ খুঁজে নিল।

**আধুনিক অসমিয়া ভাষা তথা গদ্যের শুরুর যুগ**

কমিশনার জেনকিন্স অসমে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারি পাঠাবার কথা জানালে ব্রিটিশ প্রশাসন সেই সময়ে ব্রিটিশ মিশনারি অসমে পাঠাতে না-পেরে আমেরিকার American Board of Commissioners for Foreign Missions-কে এই বিষয়ে জানালে তারা এই বোর্ডের বার্মা মিশনের নাথান ব্রাউনকে জানায়। তিনি সম্মতি দিলেন এবং অলিভার টি. কাটারের সঙ্গে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে শদিয়ায় আসতে প্রস্তুত হলেন। তিনি বঙ্গদেশ থেকে স্থানীয় নৌকায় ব্রহ্মপুত্রের বুক দিয়ে সুদীর্ঘ চার মাস কষ্টকর যাত্রার শেষে শদিয়ার এসে পৌঁছন। তাঁদের এই ধারণা ছিল যে 'শান' ভাষা শিখলে শদিয়া থেকে তাঁদের এমন-কি চিনদেশে যেতেও সুবিধা হবে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নৌকায় থাকার সময়েই শান ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। শদিয়া আসার পরে তাঁরা দেখলেন যে শান ভাষা কেউ বোঝে না এবং এই ভাষা শিখে চীনে যাওয়া সম্ভব নয়। তখন তাঁদের শদিয়া এবং এর আশেপাশে প্রচলিত স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষা শেখার বাইরে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। এই কথাও জানলেন যে শদিয়া থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিম পর্যন্ত একটি ভাষাই ব্যবহৃত হয়, সেই ভাষাটির নাম অসমিয়া। মিশনারিরা অতি কম সময়ের মধ্যে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অসমিয়া ভাষা শিখে ফেললেন। নাথান ব্রাউন ভাষা শিক্ষায় খুব পারঙ্গম ছিলেন। প্রায় এক বছর পরে ডক্টর ব্রনসনও শদিয়ায় এসে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে নাথান ব্রাউন অসমিয়া ভাষা শিখে ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস নাগাদ ইংরেজি গ্রন্থ অসমিয়াতে অনুবাদে সক্ষম হলেন।

পরবর্তীকালে মিশনারিরা শদিয়া ত্যাগ করে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ দিকে আসেন এবং জয়পুরে অবস্থান করেন। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা শিবসাগরে মিশন স্থানান্তর করেন তাঁদের নিয়ে-আসা ছাপাখানা সহ। অন্যদিকে জেনকিন্সের পরামর্শ অনুযায়ী মাইল্‌স ব্রনসন নগাঁও যান এবং সেখানে মিশন খোলেন। শিবসাগর মিশন থেকে তাঁরা খ্রিষ্টধর্মের পুস্তিকা অসমিয়া ভাষায় লিখে প্রকাশ করা ছাড়াও অসমিয়া বুরঞ্জী পুঁথি, অসমিয়া-ইংরেজি শব্দকোষ ইত্যাদি আধুনিক গ্রন্থ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে 'অরুনোদই' নামে একটি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। আধুনিক অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্রিকা একটি নতুন দরজা খুলে দিল। মিশনারিরা অসমে সরকারের বাংলা ভাষা প্রবর্তন করাকে উচিত সিদ্ধান্ত বলে ভারতে পারলেন না। কারণ প্রশাসনে, আদালতে, স্কুলে এই ভাষা অসমের সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে বুঝতে পারা এবং তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ভাব প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। মিশনারিরা বাংলা ভাষায় সঙ্গে অসমিয়ার পার্থক্য সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে শাসিত অসমিয়া মানুষ বাংলা ভাষা বাধ্য হয়ে শিখলেও তা শেখা ও ব্যবহার করাকে সম্মানজনক বলে ভাবতেন না। তাঁরা 'অরুনোদই' পত্রিকায় কেবল সংবাদ পরিবেশন এবং খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত কাহিনি আর ধর্মীয় জ্ঞান দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, বরং অসমিয়া মানুষের মনে এক ভাষিক জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অসমিয়া কথ্যভাষা এবং বুরঞ্জীর ভাষাকে আশ্রয় করলেও তাঁদের ভাষা নিজস্ব একটি নতুন রূপ নেয়।

উল্লেখযোগ্য যে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জেনকিন্সের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গুয়াহাটি সেমিনারির প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন একজন ব্রিটিশ মিশনারি উইলিয়াম রবিনসন। তিনিই প্রথমে Grammar of the Assamese Language নামে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় অসমিয়া ভাষার প্রথম লিখিত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। তা হলেও, অসমিয়া ভাষার মঙ্গল সাধন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না ; বরং ইচ্ছুক ইংরেজরা যাতে এই ভাষা শিখে অসমে ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে পারে তার জন্যই তিনি এই ব্যাকরণ লিখেছিলেন। রবিনসন বরং অসমে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের ঘোর সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে ডক্টর নাথান ব্রাউন ছিলেন অসমিয়া ভাষার শক্তিশালী সমর্থক। তিনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে Grammatical Notices of the Assamese Language নামে অসমিয়া ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেন। ভাষার বিষয়ে রবিনসনের সঙ্গে মিশনারিদের বিপরীতমুখী স্থিতি ছিল। সে যা-ই হোক, মিশনারিদের চেষ্টা অসমিয়া মানুষের মনে কেবল ভাষিক জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করেনি, সেইসঙ্গে শিক্ষিত অসমিয়াদের অসমিয়া ভাষাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার কাজে এগিয়ে আসার ব্যাপারেও প্রেরণা জোগায়। এক্ষেত্রে

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের পুত্র আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া এবং হেমচন্দ্র বরুয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিশনারিদের অসমিয়া ভাষা কেমন ছিল তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুআরিতে প্রকাশিত 'অরুনোদই' সংবাদপত্রের প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যার একটি খবরের অংশ—

ক) বঙ্গাল হিন্দুস্থান দেসত ধুঁআৰ ৰথ জোতা ৰেলপদ পাতিবলৈ অনেক মানুহে নিবেদন কৰাত ইংলণ্ডত থকা বীজুক্ত কম্পানি বাহাদুৰে তাৰ উপাই কৰিবৰ নিমিত্তে এই দেসাধিপতি গবৰ্ণৰ জেনৰেল চেৰ হেনৰি হার্ডিঞ্জলৈ মেই মাহৰ ৭ তাৰিখত চিঠি লিখি দিলে। সেই কথা সিধি হলে এই দেসৰ মানুহে আন দেসি লোকৰ নিচিনা শ্রম নোহোৱাকৈ অতি বেগেৰে অহা জোআ কৰি অনেক লাভ পাব। ইংলণ্ড আদি কৰি মানুহ থকা দুখান, গৰু মেৰ চাগ থকা দুখান, মুঠে সাতখান ৰথ একে ভাপৰ কলেৰে টানি নিয়া হৈচে।

খ) কানিয়া মানুহ এজনি মৰাৰ কথা
শিৱসাগৰ জিলাৰ কাঠপৰা গাঁৱৰ সুমথিৰি নামে এজনি বুৰি মানুহ বর্তমান মাহৰ ১২ তাৰিখত ম্রিত্যু হল। পূর্বে কলিতাৰ জিয়ৰি, সো নাই নামে এক আহম মানুহে তাইক নিচিলে। সেই পৈএক মৰিবৰ ৬ ৭ বছৰ মান হ'ল। পৈএক কানিয়া, ঘৈনি একেও কানি খাইচিল। সিহঁতৰ পুতেক এটা, জিএক মুজনি এতিয়ালৈকে আচে। কোনো এদিন চোৰৰ বস্তু সেই মানুহৰ ঘৰত ওলাল ; তাতে সি চোৰ দেখাব নাঅৰাত উপাই কৰিলে।

১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'অরুনোদই'-এর একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ :

হিন্দু ধৰমৰ বিবৰন
হিন্দু সকলে জি জি পুথি ইস্বৰে দিয়া বুলি জানে, তাক সাস্ত্র বোলে। বিষ্ণুৰ অংসে অৱতাৰ হোআ জি বিয়াস, তেঁও আগৰ বেদ ভাঙ্গি ৰিগ, জুজুৰ, সাম, অথর্ব, এই চাৰি বেদ লিখিলে। ৰিগ বেদে কবিতাকৈ লিখা হৈচে; জুজুৰ সাধাৰন ৰুপে লিখা আচে; সামবেদ গিত ৰুপ প্রার্থনা; অথর্ব বেদত অনেক মন্ত্র প্রার্থনা আচে। চাৰিবেদ সংস্ক্রিতেৰে লিখা হৈচে; ১১ খন পুথিত সম্পর্ন বেদক এজন সেনাপতি চাহাবে ব্রিটিস্য মুচিয়ম, অর্থাত আচৰিত বস্তুৰ ভঁৰালত দিলে।
তাত বাজে উপবেদ নামেৰে আৰু চাৰিখন পুথি আচে, সেই বিলাকৰ নাম আয়ুৰ, ধনু, গন্ধর্ব, ডণ্ড নিতি। তাত বৈদ্য, গানিকা, নাচনি, ৰন কৰা, মন্দিৰ সজা, এই সকলো বিদ্যা লিখা আচে।

'অরুনোদই'-এর ভাষাকে যদিও হেমচন্দ্র গোস্বামী 'ভালো করে কথা না-ফোটা দুগ্ধপোষ্য ছেলের কথায় যেমন একটি মনোমোহা শ্রুতিমধুর ভাব আছে' ("ভালকৈ মাত নুফুটা কেঁচুৰা লৰাৰ মাতত যেনে এটা মনোমোহা শুৱলা ভাব আছে") সেইরকম ভাব থাকার কথা বলেছেন এবং এই ভাষাকে 'খ্রিষ্টিয়ানী অসমীয়া' ভাষা বলেছেন, তথাপি দেখা যায় যে মিশনারিরা অসমিয়া ভাষাটির মূল রক্ষা করেও নতুন শব্দ-সম্ভার, যৌগিক বাক্য গঠনের রীতি, আধুনিক যতিচিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নতুন রূপ দিতে যথেষ্ট অবদান জুগিয়েছেন। অক্ষর যোগ করার ক্ষেত্রে তাঁরা উজান অসমের কথ্য ভাষার উচ্চারণ অনুসরণ করেছেন এবং সংস্কৃত ভাষার ণত্ববিধি, ষত্ববিধি, সন্ধি, সমাস ইত্যাদির ব্যবহার করেননি। হেমচন্দ্র গোস্বামী বলেছেন, তাঁরা অসমিয়া ভাষার শব্দ-সম্ভার সমৃদ্ধ করা ছাড়া যেসব পুরনো শ্রুতিমধুর শব্দ অব্যবহৃত হতে বসেছে সেই শব্দগুলির সামান্য সংস্কার সাধন করে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁরা আমাদের ভাষাকে একটি সুর শিখিয়ে গেলেন। এই সুরটি পূর্বে অসমিয়া ভাষায় জানা ছিল না; ভারতবর্ষের কোনো ভাষারই জানা ছিল না— সেটা ইংরেজি সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি... এই সুরের তন্ত্রী ভারতবর্ষীয় সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা দুয়ের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধার মতো হয়েছে।' ("তেঁওবিলাকে আমাৰ ভাষাক এটা সুৰ শিকাই গ'ল। এই সুৰটি আগেয়ে অসমীয়া ভাষাই নাজানিছিল; ভাৰতবর্ষৰ কোনো ভাষাই নাজানিছিল— সি ইংৰাজী সাহিত্যৰ নিজা সম্পত্তি...এই সুৰৰ তাঁৰডালি ভাৰতবর্ষীয় সভ্যতা আৰু পাশ্চাত্য সভ্যতা দুইৰো মাজত লগুণ গাঁঠিৰ নিচিনা হৈছে।")

'অরুনোদই'-এর পৃষ্ঠায় খ্রিষ্টান লেখক, অখ্রিষ্টান লেখক দুই শিবিরই স্থান লাভ করেছিল। মিশনারিদের উদ্যোগে অসমিয়া ভাষা তথা গদ্য সাহিত্যের ভাব, বিষয় ও রূপের পরিবর্তন

আরম্ভ হয়েছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা হলেও দেখা যায় যে সামাজিক, নৈতিক, ব্যাবহারিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল বিষয়ে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অসমিয়া খ্রিষ্টান লেখকেরা আকৃষ্ট হলেও ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং ভাষার অক্ষরবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের 'অসমীয়া ল'রার মিত্র' গ্রন্থে পাশ্চাত্য নৈতিক এবং ব্যাবহারিক বিষয়ের প্রতি থাকা তাঁর আকর্ষণ বিষয়-নির্বাচনে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির বেশিরভাগ পাঠই ইংরেজি থেকে নেওয়া। কিন্তু এর পূর্বে প্রকাশিত অসমিয়া লেখকের প্রথম মুদ্রিত পুঁথি 'আসাম বুরঞ্জী'-তে সেভাবে 'বিলাতী সুরটো' নাই, আনন্দরামের ভাষায়ও সেই বিলাতি সুর নাই। আনন্দরামের 'অসমীয়া ল'রার মিত্র'-এর 'পাঠকের প্রতি নিবেদন' এই শিরোনামে লেখা প্রথম পাঠটি থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে দেওয়া হচ্ছে—

> "বিদ্যা সকলো সদগুণৰে মূল, তাৰ পৰা মনুষ্যৰ ইহ কালত আৰু পৰ কালতো অসীম উপকাৰ হয়, বিদ্যাৱন্ত মানুহ নির্ধনী হলেও তেওঁক সকলোৱে মন সৎকাৰ কৰে, কিন্তু ধনৱন্ত মূর্খে জ্ঞানীৰ সমাজলৈ গলে তাক কেৱে নুসুধি পণ্ডিতকহে আদৰ কৰিব। বিদ্যাৰ দ্বাৰা মনুষ্যৰ মন পোহৰ হয়, কিয়নো নানা শাস্ত্র পঢ়িলে নানা কথা জনা জায়, বিদ্যা জানিলে এই পৃথিৱী কেনে ইয়াত কি আচে আৰু আকাশ নক্ষত্র প্রভৃতি নো কেনে এইসকল সুন্দৰে জানি, কিন্তু যাৰ বিদ্যা নাই সি এইসকল একোকে নেজানে আৰু তাৰ মন গোটেই এন্ধাৰ হৈ থাকে।"

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের গদ্যের মধ্যে অসমিয়া ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রূপবিন্যাস দেখা যায়। তদুপরি, অক্ষর-রচনার ক্ষেত্রেও বরং সংস্কৃত ব্যাকরণ নিয়ন্ত্রিত অসমিয়া ভাষার কথিত শিষ্ট রূপটি ফুটে উঠেছে। তিনি যে মিশনারিদের উদ্যোগে অসমিয়া ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধের একজন অগ্রণী সৈনিক ছিলেন সে-বিষয়ে তিনি মোফাট মিল্‌সকে পাঠানো প্রতিবেদন এবং বাংলা ভাষা থেকে অসমিয়া ভাষার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে রচিত 'অসমীয়া ভাষা বিষয়ক' গ্রন্থটি তার সাক্ষী। 'অরুনোদই'-এর পৃষ্ঠায় একটি অসমিয়া অভিধান রচনার নমুনাও তুলে ধরেছিলেন। একপ্রকার বলতে গেলে, ২৯ বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগকারী আনন্দরামই ছিলেন আধুনিক অসমিয়া ভাষার সর্বপ্রথম অসমিয়া গদ্যলেখক।

॥ দশ ॥

**আধুনিক অসমিয়া গদ্যের সবল প্রতিষ্ঠা**

আধুনিক অসমিয়া ভাষায় প্রথম খ্রিষ্টীয় ত্রিমূর্তি ছিলেন ডক্টর নাথান ব্রাউন, ডক্টর মাইল্‌স ব্রনসন এবং অলিভার টি. কাটার; অসমিয়া 'ত্রিমূর্তি' ছিলেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া এবং হেমচন্দ্র বরুয়া। এই তিনজনই আধুনিক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। প্রথম দুজন কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র বরুয়া বাড়িতেই সংস্কৃত, আদালতে কাজ করতে গিয়ে বাংলা এবং অভিভাবকদের না-জানিয়ে (সে-সময়ে ইংরেজি শিখলে জাত যায় বলে এক ধারণা নৈষ্ঠিকদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল) গোপনে ইংরেজি ভাষা শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি অসমিয়া, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি এই চারটি ভাষাতেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, রবিনসন ও ব্রাউন ইংরেজি ভাষায় অসমিয়া ভাষার ব্যাকরণ লিখছিলেন। হেমচন্দ্র বরুয়া ব্রাউনের ব্যাকরণ রচনার এগারো বছর পরে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে অসমিয়া ভাষায় সর্বপ্রথম অসমিয়া ব্যাকরণ লিখে প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে হেমচন্দ্র বরুয়ার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে লেখা। এই ব্যাকরণের প্রভাব মিশনারিদের উপরেও পড়েছিল। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'অরুনোদই' শব্দের অক্ষরবিন্যাস নামপৃষ্ঠাতে পরিবর্তিত হয়ে 'অরুনোদয়' হয়েছিল। এই কথাও স্মরণীয় যে মাইল্‌স ব্রনসনের রচিত অসমিয়া ভাষার প্রথম অভিধানটি ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্র বরুয়ার 'হেমকোষ' প্রকাশ পায় তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পরে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে। আধুনিক অসমিয়া ভাষার গদ্য রূপের বিবর্তনে হেমচন্দ্র বরুয়ার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মিশনারিদের গদ্যরীতি এবং অক্ষরবিন্যাস নীতি সমর্থন করেননি। বরং প্রথম অসমিয়া খ্রিষ্টান নিধিরাম লিবাই ফারওয়েল মিশনারিদের অক্ষরবিন্যাস নীতি থেকে বিন্দুমাত্র সরে না-আসায় হেমচন্দ্র বরুয়া তাঁর 'আত্মজীবন চরিত' শীর্ষক ছোট রচনাটিতে নিধিরাম লিবাই ফারওয়েল সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। ভাষার ক্ষেত্রে গুণাভিরাম বরুয়া কিছুটা অংশে নম্র হলেও হেমচন্দ্র বরুয়া ছিলেন এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীতিনিষ্ঠ। নীচে এই দুইজনের গদ্যের এক-একটি ছোট অংশ তুলে ধরা হল। প্রথমে গুণাভিরাম বরুয়ার

লেখা :

ক) আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীত খেল বন্ধণীয়া মতে খেলৰ বান্ধণীএ ৰান্ধিলে সকলোএ খায় নতুবা আন প্ৰকাৰে হ'লে অনেক লোকে এক লাগে খোৱাৰ নিয়ম নাই। সকলোৰে হাতে সকলো বস্তু খোৱাৰ নিয়ম নাই। কাৰো কটা তামোল, কাৰো ধোৱা মাছ চাউল কাৰো কেঁচা জলপান কাৰো কোমল চাউল, কাৰো চীড়া পীঠা কাৰো পৰমান্ন কাৰো ভাত খোৱা যায়। সম্পৰ্ক, আচাৰ, নীতি, ঘণিষ্টতা বিবেচনাৰ মতে খোৱাৰ এইৰূপ তাৰতম্য হয়। আমাৰ মানুহে সাধাৰণতঃ ভাত খোৱাৰ পূৰ্বে স্নান কৰে। কোনোএ আকৌ চীড়া পীঠা বা কোমল চাউল খোৱাৰ পূৰ্ব্বেও স্নান কৰে।

দেখা যায় গুণাভিৰাম বৰুয়া (১৮৩৪-১৮৯৪)-ৰ গদ্যে আধুনিক অসমিয়া ভাষাৰ যে-প্ৰবাহ ছিল সেখানে হেমচন্দ্ৰ বৰুয়াৰ ব্যাকৰণৰ নিয়মে দেওয়া গুৰুত্বের চেয়ে ভিতৰের স্বতঃস্ফূৰ্ততাৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব ফুটে উঠেছে। তদুপৰি বাংলা ভাষাৰ দু-একটি শব্দ, যেমন এবং, ও যেভাবে পাওয়া যায় সেভাবে বুৰঞ্জীৰ দু-একটি শব্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়। বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শে আসা এবং অন্যদিকে অসম বুৰঞ্জী পাঠের সঙ্গে পৰিচিত হওয়া এ দুটিই এৰকম বৈশিষ্ট্যের কাৰণ ছিল বলে ধৰতে পাৰি। উল্লেখযোগ্য, তিনি একদিকে ব্ৰাহ্মধৰ্ম গ্ৰহণকাৰী প্ৰথম অসমিয়া। বাংলা ভাষাৰ প্ৰভাব থেকে অসমিয়া ভাষাকে মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্রেও তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কৰে গেছেন।

গুণাভিৰাম বৰুয়াৰ সমসাময়িক হেমচন্দ্ৰ বৰুয়া (১৮৩৫-১৮৯৮) ছিলেন আধুনিক অসমিয়া গদ্যের এবং সমাজের প্ৰধান অভিভাবকস্বৰূপ। গুণাভিৰাম ও হেমচন্দ্ৰ যেভাবে অসমিয়া ভাষাৰ পুনঃপ্ৰতিষ্ঠায় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰেছিলেন সেইভাবে অসমিয়া সমাজের সংস্কাৰও চেয়েছিলেন। গুণাভিৰাম যেভাবে বিধবা বিবাহের সমর্থন কৰেছিলেন হেমচন্দ্ৰও ঠিক সেইভাবেই সমর্থন কৰেছিলেন। গুণাভিৰাম নিজেও বিধবা বিবাহ কৰেছিলেন এবং তাঁৰ লেখা 'ৰাম-নবমী' নাটকে (১৮৫৭) বিধবা বিবাহ সমর্থন না-কৰলে সম্ভাব্য বেদনাদায়ক ঘটনাৰ ইঙ্গিতও দিয়েছেন। হেমচন্দ্ৰ বৰুয়া, স্বামীৰ মৃত্যু হলে স্ত্রীৰ দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ কৰাৰ অধিকাৰ না-থাকাৰ প্ৰথাৰ বিৰোধিতা কৰে পত্নীৰ মৃত্যু হলে স্বামীৰও দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ কৰা উচিত নয় বলে ভেবেছিলেন, এবং সেইজন্য তিনি পত্নীৰ মৃত্যুৰ পৰ দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ কৰতে সম্মত হননি। গুণাভিৰামের মতো তিনিও 'কানীয়াৰ কীৰ্তন' এবং 'বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোবা ভাতুৰি' গ্ৰন্থ দুটিতে অসমিয়া সমাজ-জীবনের দোষ-ত্রুটিকে কঠোৰভাবে ব্যঙ্গ কৰেছেন। তিনি আধুনিক অসমিয়া ভাষায় কঠোৰ ব্যঙ্গ ৰীতিৰও প্ৰবর্তক। হেমচন্দ্ৰ বৰুয়াৰ গদ্য একদিকে যেভাবে সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত, অন্যদিকে তেমনই সুনিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিপূৰ্ণ। যেমন—

খ) সকলোকে মিঠা মুখেৰে মাতিব লাগে। কৰ্কশ মাত কেৰে ভাল নেপায়; মিঠা কথা হলে সকলোকে বশ কৰে। আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ কি সমনীয়া মানুহৰ কথাকে নকওঁ, আমাতকৈ নীহ মানুহকো সাদৰেৰে কথা কোৱাত একো হানি নহয়, বৰং তাৰ বাবে আমি প্ৰশংসা হে পাওঁহক। কিন্তু বৰ ডাঙ্গৰ লোকৰো আনক কটূকথা কোৱা অভ্যাস হলে তেওঁ আটাইৰে অপ্ৰিয় হয়। সকলো মানুহ একে জাতিৰ জীৱ, কেৱল কোনো বিশেষ কাৰণৰ নিমিত্তে অৱস্থাৰ হীন-ডেঢ়ি হয়, এই মাত্ৰ প্ৰভেদ; এতেকে যি যেনে অৱস্থাৰ মানুহ, তেওঁক তেনে অৱস্থাৰ উপযুক্ত সম্বোধন কৰি মতাটো, ভদ্ৰতা আৰু সুশিক্ষাৰ চিন; কিন্তু হুঁটা মাতে, যাৰ প্ৰতি সেই মাত প্ৰয়োগ কৰা যায়, সেই মাতে তেওঁৰ অসন্তোষ জন্মাইয়ে নেথাকে যি সেই মাতৰ ব্যবহাৰ কৰে, তাৰো নীচতা আৰু শিক্ষাৰ অভাব দেখায়।

দেখা যায়, হেমচন্দ্ৰ বৰুয়াৰ হাতেই অসমিয়া ভাষাৰ গদ্য আধুনিক, স্থিৰ ও সুদৃঢ় ৰূপটি লাভ কৰে। ১৮৭২ খ্ৰিষ্টাব্দে অসমের স্কুল ও আদালতে অসমিয়া ভাষা পুনঃপ্ৰবর্তিত হলে সে-সময়ের লেফটেন্যান্ট গভর্নৰের আদেশ অনুযায়ী অসমের স্কুলের জন্য অসমিয়া ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্ৰণয়ন কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰতে অসমের প্ৰশাসন আধিকাৰিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এবং সেই সূত্রে অসমের দশজন ব্যক্তিৰ ৰচিত গ্ৰন্থ প্ৰথম বাছাই পর্বে ওঠে। এই দশজনের মধ্যে প্ৰথম স্থান লাভ কৰেন হেমচন্দ্ৰ বৰুয়া। তাঁৰ 'আদিপাঠ' নামের পুথিটি অর্জন কৰে পাঁচশো টাকাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনের 'অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্র' এবং হেমচন্দ্ৰ বৰুয়াৰ 'আদি পাঠ' ও 'পাঠমালা' গ্ৰন্থ সেই সময়ে অসমিয়া পাঠ্যপুস্তকের

অভাব পূরণ করে।

উল্লেখযোগ্য যে এই প্রতিযোগিতায় কয়েকজন বাঙালি এবং আমেরিকান মিশনারি লেখকও যোগদান করেছিলেন। অব্যবহিত পরবর্তীকালে ব্রজপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ সেন প্রমুখ বাঙালি লেখকের লিখিত পুস্তকও ঊনবিংশ শতকের মধ্যে পাঠ্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিল।

হেমচন্দ্র বরুয়া 'আসাম নিউজ' নামে একটি দ্বি-ভাষিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সেই সময়ে বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি পরে আত্মজীবনী 'মোর জীবন সোঁৱরণ'-এ লিখেছেন যে আসাম নিউজ পড়ে তাঁরা অসমিয়া আধুনিক ভাষা শুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে শিখেছিলেন। অসমিয়া ভাষার এবং অসমিয়া গদ্যের নতুন প্রবাহ এভাবেই আরম্ভ হল। বেজবরুয়া বলেছেন যে মাতৃভাষার উন্নতি জাতীয় উন্নতির মঙ্গলময় মন্দিরের সিংহদুয়ার স্বরূপ। প্রায় ৩৬ বছর ধরে অসমিয়া ভাষা বিদ্যালয়, আদালত তথা প্রশাসন থেকে অপসারিত হয়ে থাকার ফলে ভাষাটির অগ্রগতি যে ব্যাহত হয়েছিল সে-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। অসমিয়া গদ্য ঊনবিংশ শতকের শেষের এক-তৃতীয়াংশ সময় থাকতেই পুনরায় নিজের আধুনিক কালের যাত্রা আরম্ভ করার জন্য সরকারি অনুমোদন লাভ করে।

ভাষার সঙ্গে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক তথা ব্যাবহারিক জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে থাকে। সভ্যতার বিকাশ তথা পরিবর্তনই সমাজের পরিবর্তন সাধন করে। নতুন ভাব, বিষয়, শব্দ-সম্ভার একটি ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ করে। তাই কোনো জীবন্ত ভাষাই স্থির হয়ে থাকতে পারে না। অসমিয়া ভাষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের এই ধারা স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখা যায়। গদ্য সাহিত্যের মধ্যে এই পরিবর্তনের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অসমিয়াদের যাতায়াত শুরু হয়। তার প্রায় অর্ধেক শতাব্দকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বঙ্গদেশ আধুনিক যুগে পা রাখে। বাংলা লিখিত গদ্যের জন্ম এবং বিকাশ এক প্রকার বলতে গেলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতেই শুরু হয়। জন্ম নিয়েই বাংলা গদ্য আধুনিকতার স্পর্শ পায়। তদুপরি বাংলা গদ্য তৎসম এবং তদ্ভব শব্দসম্ভারের ভিত্তিভূমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। অসমিয়া গদ্যের জন্ম পঞ্চদশ শতকে হলেও ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধেই আধুনিক যুগে এই গদ্য সবেমাত্র পা রাখে। কিন্তু এর যেটা আধার তা হল প্রধানত উজান অসমের কথ্য ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং বুরঞ্জীর ভাষার একটি সংমিশ্রিত সুদৃঢ় আশ্রয়। ফারসি, হিন্দি, উর্দু, তুর্কি এবং মাঝে মাঝে পশ্চিমের ভাষার সংস্পর্শে এসে অসমিয়া ভাষা তথা গদ্য নতুন কিছু শব্দ আহরণ করলেও সেগুলির সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু ব্রিটিশ অসম অধিকার পরার পর ফারসি, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার প্রয়োগের ফলে অসমিয়া ভাষা অনেক নতুন শব্দ আর প্রকাশভঙ্গি সংগ্রহ করেছিল। বিশেষভাবে ফারসি ও ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ভাষাটিকে একটি নতুন মাত্রা দান করে। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে প্রশাসন ও আদালতে বাংলা মিশ্রিত ফারসিই ব্যবহৃত হত। নবাবের রাজত্বকালে প্রবর্তিত ফারসি জানা মানুষের সংখ্যা প্রশাসনে ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করায় প্রশাসনিক ভাষা বাংলা-মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পদ ও বিষয় বোঝানোর মূল শব্দগুলি ছিল ফারসি। অসমের প্রশাসন ও আদালতে নিয়োজিত বাঙালি কর্মচারীরা বাংলা ভাষার সঙ্গে সেরকম ফারসি শব্দগুলি অনায়াসে ব্যবহার করে যাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এইসব শব্দের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে অসমিয়া ভাষায় মিশে যায়। আদালত, হামিক, হুকুম, দলিল, দস্তাবেজ, উকিল, মুন্সিফ, পিয়াদা, কাগজ, কলম, দোয়াত, চিয়াঁহী, কিতাপ, ফরমান, তহবিল, তলব, বাবুর্চী, খানা, খানচামা, চকী, মেজ ইত্যাদি অজস্র শব্দ যেভাবে প্রবেশ করেছে সেইভাবে টেবুল, বেঞ্চ, চামন, অর্ডার প্রভৃতি ইংরেজি শব্দও আদালতের মাধ্যমে প্রবেশ করে। শিক্ষা, যানবাহন, যাতায়াত প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শব্দ ধীরে ধীরে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে অনেক ইংরেজি ও পশ্চিমের শব্দ প্রবেশ করল। এমন-কি বাড়িতে ব্যবহারের নতুন জিনিসপত্রগুলিও নিজের নিজের এক-একটি নাম নিয়ে এল। এই নতুন শব্দ-সম্ভার অসমিয়া ভাষায় লিখিত এবং কথিতরূপে স্থান গ্রহণ করল। অসমিয়া শব্দ-সম্ভার নতুন করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমিয়া সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে "জাতীয় সাহিত্যৰ লগত জাতীয় জীৱনৰ সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী...জাতীয় জীৱনৰ উন্নতি, অৱনতিত জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি অৱনতি অনিবার্য।"

অসমিয়া ভাষা ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে নতুন

গতিশক্তি লাভ করে। এর মূলে রয়েছে উচ্চ-শিক্ষার্থে কলকাতায় যাওয়া অসমিয়া ছাত্রদের উৎসাহ ও উদ্যোগ। বঙ্গের নবজাগরণ এবং আধুনিক বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ দেখে তাঁরা সে-সময়ের অসমের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য যে অনেক করণীয় কাজ আছে সে-কথা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা প্রবাসী অসমিয়া ছাত্ররা 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা' (অ. ভা. উ. সা. সভা) নাম দিয়ে গঠন করা সভা থেকে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাস থেকে 'জোনাকী' নাম দিয়ে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিকা অসমিয়া ভাষার লিখিত আধুনিক রূপটির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। 'জোনাকী'র ভাষা তথা গদ্য হেমচন্দ্র বরুয়ার ব্যাকরণ ও অভিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভাষা তথা গদ্য।

'জোনাকী'তে প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় 'আত্মকথা' শিরোনামে লেখা সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল—

> "ভাষালৈ আমাৰ বিশেষ চকু থাকিব। অসমৰ আটাই শ্রেণীৰ মানুহে যেন আমাক মৰম কৰে তালৈ আমি যত্ন কৰিম। নকৈ উঠি অহা অসমৰ নিমিত্তে আমাৰ আটাই শক্তি ব্যয় কৰিম। এই পাছপৰি থকা আন্ধাৰ দেশলৈ অলপ 'জোনাক' সুমুৱাব নোৱাৰিলেও, যদি নিজে নিজেও যত্নৰ ফিৰিঙ্গতিৰ পোহৰত বাট পাওঁ, তেনে আমাৰ শক্তিৰ মিছা ব্যয় হোৱা নাই বুলি ভাবিম। আমি জানো আমাৰ দেশ শিক্ষাত পাছ, জ্ঞানত ভিখাৰী, ধনত দুখীয়া, সংখ্যাবলত শক্তিহীন, স্বাস্থ্যত ৰুগীয়া, কামত এলেহুৱা ও পৰাধীন— কিন্তু আমি নিজ শক্তি অনুযায়ী হৈহে কামত হাত দিব পাৰোঁ। আমি যুঁজিবলৈ ওলাইছো 'আন্ধাৰৰ' বিপক্ষে ঃ উদ্দেশ্য দেশৰ উন্নতি, 'জোনাক'।"

'জোনাকী' অসমিয়া ভাষা তথা গদ্যের যে-আকৃতি হেমচন্দ্র বরুয়ার ব্যাকরণের ভিত্তিতে গ্রহণ করল সেই রূপই আধুনিক অসমিয়া ভাষার প্রকৃষ্ট ভিত্তিরূপে রূপান্তরিত হল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া, রজনীকান্ত বরদলৈ, বেণুধর রাজখোয়া, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, মফিজুদ্দিন আহমদ হাজরিকা, আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা এঁদের হাতে অসমিয়া গদ্য যে-রূপ নিল তার নায়ক ছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। 'জোনাকী'-র আরম্ভ করা ভাষার রূপ এবং সাহিত্যের রোমান্টিক চরিত্র এই দুটির উপরে বেজবরুয়ার অধিকার ছিল সবচেয়ে বেশি প্রবল। সেইজন্য ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বেজবরুয়ার মৃত্যুর কিছুকাল পর পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাধিক বছরের এই যুগটিকে 'বেজবরুয়ার যুগ' বলেও অভিহিত করা হয়। বেজবরুয়া বিষয় অনুযায়ী ভাষাকে ওজঃগুণসম্পন্ন, মাধুর্যগুণসম্পন্ন ও প্রসাদগুণসম্পন্ন করে অনায়াসে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি যেভাবে ভাব ও বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে ভারতীয় বা বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সেইভাবে সম্পূর্ণ গ্রামীণ শব্দও স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। হাস্যরসকে তাঁর ভাষা করে তুলেছিল সহনীয় এবং গ্রহণীয়ও। তাঁর গদ্যের দুটি উদাহরণ—

ক) ঈশ্বৰে পৃথিৱীখন সকলোকে জোৰাকৈ ইমান ডাঙৰ-দীঘল, আহল-বহল কৰি দিছে যে ভাই-ভাইৰ ভিতৰত চুলিয়াচুলি নকৰাকৈও স্বচ্ছন্দে নিজকে ভালকৈ মানুহমুৰা হৈ তাক ভোগদখল কৰি থাকিব পাৰি। এটাৰ গাত লয় নগ'লেও এটাই এটাক গিলি নথ'লে একতা স্থাপনত কোনো বিঘিনি নহয়। দুই ভাই বঙলা আৰু অসমীয়াই কটাকটি, মৰামৰি নকৰাকৈ বন্ধুভাৱে এই বহল সংসাৰত ডাঙৰ-দীঘল হৈ চলিব পাৰে। এটাক জীয়াই ৰাখিবলৈ আনটোক ধৰিবৰ আৱশ্যক নাই।

খ) উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র আৰু গীতা এই তিনি ভাগ গ্রন্থক যে আমাৰ শাস্ত্রত প্রস্থানত্রয় বোলা হয় ইয়াৰ ভাবার্থ এনে অনুমান হয় যে মূল হিন্দুশাস্ত্রৰ ভিতৰত এই তিনিটি ভাগ প্রকৃত ঈশ্বৰ প্রতিবাদক আৰু ঈশ্বর সাধনসমূলক আৰু সেইদেখি এই তিনিটিৰ শিক্ষা আশ্রয় কৰি জীৱই নির্ভয়ে ইহলোকৰ পৰা অনন্তলোকলৈ প্রস্থান কৰিব পাৰে। ব্রহ্মসূত্রৰ বিশদ ব্যাখ্যা উপনিষদবিলাকতো পোৱা যায় আৰু গীতা উপনিষদৰ সাৰ। এই নিমিত্তে গীতাক প্রস্থানত্রয়ৰ সাৰ বুলিব পাৰে। সচৰাচৰ কোৱা হয় যে সহস্র নামৰ নাম, ভাগৱতৰ সৎসঙ্গ আৰু গীতাৰ একশৰণ, এই লৈয়ে মহাপুরুষীয়া ধর্ম। (তত্ত্বকথা)

বেজবরুয়ার কৃপাবর বরবরুয়া নামে লেখা রচনায় হাস্যরসের স্ফুরণ ঘটেছে। কৃপাবরের 'মোর জন্ম রহস্য' থেকে কয়েকটি

বাক্য তুলে দেওয়া হল—

"ঘুনুক-ঘানাক শুনো বোলে মোৰ যশয্যাৰ কাকতীফৰিঙে শদিয়াৰ পৰা মানাহলৈকে, ভোটৰ পৰ্বতৰ পৰা নগা পৰ্বতলৈকে জুৰি, আনবিলাক অসমীয়া ভাইৰ অসমীয়া খ্যাতিৰ থোক এডালো, নোখোৱাকৈ উপান্ত কৰিলে। হেনো মোৰ সদ্‌নামৰ কুম্ভকর্ণই আঁ কৰিলে কি, লাখে লাখে, জাকে জাকে, অসমৰ গুণ-যশৰ ভালুক-বান্দৰ মুখৰ ভিতৰলৈ সোমাল কি। হেনো দিহিঙৰ পাৰৰ জাম্বৱন্ত, দিখৌৰ কাষৰ ডেকা হনুমন্ত, লুইতৰ দাঁতিৰ মলুৱা সুষেণ, কলঙৰ কাণৰ পেটাল বিভীষণ, পূবৰ নল, পশ্চিমৰ নীলকে প্রমুখ্য কৰি যত যি অংগদ সুগীৰ আছিল মানে, সকলো খিনি সসৈন্যে নিজ দলবল লৈ এই মুখগহ্বৰত প্ৰৱেশ কৰিলে।"

এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে লেখকের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের উপর রচনারীতির স্বাভাবিক প্রভাব পড়ে। একটি যুগের বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিগত রচনারীতির পার্থক্য সর্বদা ঘটে থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক লেখকের রচনাশৈলী তাঁর লেখার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমন্বিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এই রচনাশৈলী বা স্টাইল লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও শৈলীর পরিচায়ক। এরকম পার্থক্যকে আমরা কোনো একটি ভাষার গদ্যের সাধারণ পরিবর্তন বলতে পারি না। পরিবর্তন বা বিবর্তন আমরা তখনই বলতে পারি যখন একটি ভাষার একটি যুগে রূপ নেওয়া গদ্যরীতিতে শব্দের প্রয়োগ, বাক্যের গঠন বা বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্রোত পরিবর্তন করতে আরম্ভ করে।

বিংশ শতকের অসমিয়া গদ্যকে হেমচন্দ্র বরুয়া এবং সত্যনাথ বরার ব্যাকরণ আর বেজবরুয়ার গদ্যের আদর্শ অগ্রগতির দিকে নিয়ে এসেছিল। লেখকভেদে গদ্যরীতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও গদ্যের মূল গঠন সদৃশ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বেজবরুয়ার গদ্য পল্লবিত, পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়ার গদ্য নিয়ন্ত্রিত। সত্যনাথ বরার গদ্য ছোট ছোট বাক্যের অর্থবোধক গদ্য। এরকমভাবে প্রত্যেক লেখকের গদ্যশৈলীর পার্থক্য থাকলেও বিশ শতকের গদ্যের মূল প্রবাহটি ইতিপূর্বে যেমন বলেছি সেইরকম মৌলিকভাবে সদৃশ আকৃতির। কেবল অসমিয়া গদ্যে নিম্নের রূপটির বাইরের আকৃতির কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু সেরকম গদ্যের তুলনামূলকভাবে কম শব্দ বা প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতাই পরিবর্তনের সূচনা করে না। বরং একে অসমিয়া গদ্যের আঞ্চলিক একটি ধরন বলতে পারি।

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর গদ্যে থাকা ওজঃগুণ অসমিয়া গদ্যকে একটি নতুন মাত্রা দিয়ে গেছে। যেমন—

"উক্ত সকলোবিলাক অন্তৰায়ৰ আঘাত যিজন পুৰুষে অপৰাজেয় শক্তিৰে বুকু পাতি লৈ জয় কৰি ধর্ম-কর্ম-সমাজ ক্ষেত্রত মূক নিষ্পেষিত জনগণৰ বাবে সমানাধিকাৰৰ মুক্তিদ্বাৰ খুলি দিলে, সেইজন পুৰুষৰ বিপ্লৱী ব্যক্তিত্ব আৰু অৱদানৰ বিশেষত্ব নিশ্চয় আছে,— আৰু সেইজন পুৰুষক মানৱীয় আদি অধিকাৰ-আকাঙ্ক্ষীসকলে জগদ্‌গুৰু, জয়গুৰু অৱতাৰী মহাপুৰুষ আদি আখ্যাৰে ভক্তিসেৱা কৰাটোত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। তাৰো কিছু আগৰপৰাই, স্থানীয় ভাষাক আশ্রয় কৰি গীত-পদ, নৃত্য-বাদ্য, ভাওনা-সবাহ আদিৰ ভিতৰেদি একো পৰিকল্পনাহীনভাৱে স্বতঃস্ফূট সহাৰি এটাৰ আভাস কিছু পোৱা গৈছিল যদিও, তাত জাতি গঠন সংস্থানৰ একো ইঙ্গিত নাছিল। সেইবাবে, জাতি সংগঠক শ্রীমন্ত শংকৰসূর্য্যৰ উদয়ত তেৰাক কেন্দ্র কৰি ঘূৰি ঘূৰি সেইসকলে অসমীয়াৰ জাতীয় সৌৰজগত সৃষ্টি কৰিলে।"

বাণীকান্ত কাকতি অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের সম্পর্কে শংকরদেব ও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে গেছেন। ডিম্বেশ্বর নেওগ প্রমুখ প্রায় সব পণ্ডিতই এই বিষয়ে একমত। বলতে গেলে আধুনিক অসমিয়া গদ্যে বেজবরুয়া নিয়ন্ত্রক এবং আদর্শ হয়ে আছেন এই একবিংশ শতকেও। যদিও বেণুধর শর্মার গদ্যে বুরঞ্জীর গদ্যের এবং উজান অসমের কথ্য শিষ্ট গদ্যের একটি বিশিষ্ট রূপ ব্যাপৃত হয়ে আছে তথাপি ব্যক্তিগত এরকম বিশিষ্টতা বিবর্তনের রূপ নয়। বরং বলতে পারি, এই গদ্য একপ্রকার কথকতার গদ্য। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক লেখকের রচনায় যে থাকে সে-কথার আভাস ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। বেণুধর শর্মার পরে এরকম বৈশিষ্ট্য লীলা গগৈ-এর গদ্যে নিজস্ব রূপের আকৃতি লাভ করেছে। অন্যদিকে তীর্থনাথ শর্মার হাতে অসমিয়া গদ্যের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাঁর গদ্যে তৎসম, তদ্ভব শব্দের সঙ্গে মধ্যযুগের অসমিয়া পদ-পুঁথির শব্দ এবং গ্রামীণ অসমিয়া ভাষার শব্দ অনায়াসে কোথাও কোনো গুরুচণ্ডালী দোষ না-ঘটিয়ে ব্যবহার করে যাওয়ার নিজস্ব দক্ষতা লক্ষণীয়।

॥ এগারো ॥

## যুগ-পরিবর্তনের ছাপ

আধুনিক অসমিয়া গদ্যের বিবর্তনের একটি রূপ পঞ্চাশের দশক থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন লেখকদের রচনার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায়। এরকম গদ্যে শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। হেম বরুয়া থেকে শুরু করে ইংরেজি সাহিত্যের অসমিয়া লেখকদের রচনায় সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এরকম প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়। এমন-কি তাঁর এই বিশেষত্ব বাংলায় লেখা 'লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া' শিরোনামের ছোট বইটিতেও ফুটে উঠেছে। ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা অসমিয়া লেখকদের, বিশেষ করে গত শতকের শেষার্ধের কোনো কোনো লেখকের রচনায় এই লক্ষণটি দেখা যায়। অন্যদিকে, সৃষ্টিশীল রচনায় ভাববোধক বিষয়ের সঙ্গে সংগতি যুক্ত অর্থ বোঝানোর জন্য একটি মিশ্রভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে। গল্পকার সৌরভকুমার চলিহার রচনায় এরকম শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির প্রয়োগ তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, হোমেন বরগোহাঞির রচনায় নিজস্ব শৈলীর শক্তিশালী অসমিয়া গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মামণি রয়সম গোস্বামী বিষয়ের সঙ্গে সংগতি যুক্ত হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি প্রভৃতি শব্দও তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি গত শতকের ষাটের দশক থেকে ক্রমান্বয়ে অসমিয়া গদ্যকে এর পূর্বের গদ্য থেকে কিছু পরিমাণে পৃথক করে তুলেছে। পশ্চিমের সাহিত্যের বিভিন্ন নতুন ধারার প্রকাশভঙ্গির নিদর্শন অসমিয়া গদ্য এই সময় থেকেই সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। চেতন বা অবচেতনের বিষয় বোঝাতে ব্যবহৃত গদ্য একটি বিশিষ্ট গতিবেগ লাভ করেছে। ব্যাকরণ-নিয়ন্ত্রিত পথ থেকে কখনো-বা এরকম গদ্য নতুন রাস্তা বের করতে যত্নবান হয়েছে। ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি দেশী-বিদেশী কোনো কোনো শব্দ অপ্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কিন্তু চিন্তাশীল বা বিষয়জ্ঞাপক রচনায় পূর্বের মতোই নিয়ন্ত্রিত গদ্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে স্কুলে সংস্কৃত ভাষা ঐচ্ছিক ভাষায় পরিণত করার পর থেকে ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পথ বন্ধ হল। ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের অসমিয়া ভাষার মূল ভিত্তির সঙ্গে পরিচয় হল না। এমন-কি রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃত ভাষা অ-আর্য মূলের ভাষাগোষ্ঠীর মূল ভাষা নয় এমন একটি ধারণারও জন্ম হল। কিন্তু আর্যভাষী বা অ-আর্যভাষী প্রভৃতি মূল থেকে আসা অসমিয়াভাষীদের ভাষার সঙ্গে যে সংস্কৃতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি চাপা পড়ে গেল। সংস্কৃত ভাষা তাই অব্যবহার্য হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অসমিয়া ভাষার জ্ঞানও ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু হল। তদুপরি ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের শিক্ষাদান করার পরিবর্তে প্রায়োগিক ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি প্রয়োগেও অসমিয়া ভাষার ব্যাকরণ শেখার আগ্রহ কমতে শুরু করল। যেসব ছেলেমেয়ে এভাবে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা লাভ করে বেরিয়ে এল তাদের অসমিয়া ভাষা স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যকীয় মান বহু সময়ে রক্ষা করতে পারল না। অন্যদিকে, উল্লেখযোগ্য যে বিশ শতকের আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে অসমে সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং নতুন নতুন 'টিভি চ্যানেল' স্থাপিত হয়েছে। এরকম সংবাদ পত্র-পত্রিকা এবং টিভিতে অনেক শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী নিযুক্ত হল। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয়হীন এইরকম যারা নিযুক্ত হল তাদের কারো কারো হাতে অসমিয়া ভাষা ব্যাকরণের এবং ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আবশ্যক শুদ্ধরূপ হারাতে শুরু করল। তদুপরি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে এরকম বিদ্যালয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে অসমিয়া ভাষার আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। এই কারণগুলি কথিত অসমিয়া ভাষার মান বহু পরিমাণে হ্রাস করেছে দেখা যায়। বাজার-দোকানে ব্যবহৃত অ-অসমিয়াভাষীর মুখের এবং হিন্দি সিনেমা বা সিরিয়ালের অনেক শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি অপ্রয়োজনীয় আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকারকরূপে কথ্য ভাষায় এক শ্রেণির যুবক-যুবতীর মধ্যে চলতে আরম্ভ করেছে। অসমিয়া ভাষার নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্যেরও এরকম শব্দ ও প্রকাশভঙ্গিতে ক্ষতি করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। একবিংশ শতকের এরকম ঘটনা অসমিয়া ভাষার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে না-পারলেও কথ্যরূপে যে-বিকৃতি লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে ভাষাটির ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং এই অবস্থাকে ভাষার সুস্থ বিবর্তনের লক্ষণ হিসেবে মেনে নেওয়া কঠিন, বরং এর মধ্যে মান ও সৌন্দর্যের মৌলিকত্ব তথা বৈশিষ্ট্যের ক্ষতির সংকেত বেজে উঠেছে।

॥ বারো ॥

## সমাপ্তি

অসমিয়া গদ্যের বিবর্তনের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে জড়িত হয়ে আছে ক্রমবিবর্তিত কয়েকটি যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যাবহারিক ও বৌদ্ধিক জীবন। আর্য ও অ-আর্য লোকজীবন, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতির সমাহারই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলার উপাদান জোগান দিয়ে এসেছে। এর মধ্যে ভাষিক-সাংস্কৃতিকভাবে আর্য উপাদান নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে থাকলেও লোকবিশ্বাস সমন্বিত লোকসংস্কৃতি আর রক্তের দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু পরিমাণে সমৃদ্ধ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ঘরদুয়ার যেভাবে এখানে স্বাভাবিকভাবে হওয়া ঘাস-বন, বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত ঠিক তেমনই পঞ্চম শতক থেকেই পাথরের মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের এবং সমগ্র উপত্যকা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে সেরকম অজস্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তিশালী প্রভাবের পরিচয় বহন করে আসছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্মন বংশের সময় থেকে সংস্কৃত ভাষা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করার সাক্ষ্য অসমিয়া ভাষাকে নিজস্ব রূপ দিতে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রমাণ বহন করে এনেছে। একদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কথ্যভাষারূপে এবং অন্যদিকে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত পালি-প্রাকৃতের প্রভাব পরবর্তী কাল পর্যন্ত সমান শক্তিশালী হয়েছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত চলেছে। ত্রয়োদশ শতকে আহোমদের আগমনে অসমিয়া কথ্যভাষার উপরে গুরুত্ব প্রদান এই ভাষার প্রচলন বৃদ্ধির জন্য অনেকটাই দায়ী। তাই অসমিয়া ভাষার কথিত গদ্যরূপের ক্রমান্বয়ে লিখিতরূপ পাওয়ার রাস্তা খুলে গেল। অসমিয়া ভাষায় বুরঞ্জী রচনা কথিত গদ্য-রীতিকে লিখিত মান্য রূপ জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান জোগাল।

অঙ্কীয়া নাটের সংলাপের গদ্য, কথা-ভাগবত এবং কথা-গীতার গদ্য, বুরঞ্জীর গদ্য, ব্যাবহারিক বিষয়ের গদ্য এই সমস্তের মধ্য দিয়ে এসে অসমিয়া গদ্য ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এর শক্তিশালী গতি ও প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা করল। এই কালসীমার মধ্যে দেখা গেল, দুই-একটি আরবি-ফারসি মূলের শব্দ, হিন্দি এবং বাংলা মূলের শব্দও জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য এই শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই প্রবেশ করেছে।

অসমিয়া গদ্যের আধুনিক যুগ যে ব্রিটিশ আসার পর মিশনারিদের হাতে আরম্ভ হয়েছে সে-কথাও ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। মিশনারি গদ্যে মিশনারিরা ইংরেজি বা বিদেশী শব্দকে ঘরোয়া অসমিয়া প্রতিশব্দে (যেমন বরফকে পানীশিল বলে, বেপটাইজ করাকে বুর পাওয়া বলে) অনুবাদ করেছিল। তথাপি এই ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষার একটা ছাপ স্বাভাবিকভাবেই পড়েছিল। হেমচন্দ্র বরুয়া সেই ছাপ বিনষ্ট করে তাকে নতুন গ্রহণীয় রূপ দান করেন। যৌগিক বাক্য আর যতিচিহ্ন সহ ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেও আধুনিক অসমিয়া গদ্য একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করল। যদিও নামনি অসমে কথিত গদ্যের একটি নিজস্ব ভঙ্গি ছিল, লিখিত মান্য গদ্যে সেরকম আদর্শের প্রভাব চোখে পড়ার মতো হয়ে উঠতে পারেনি।

আধুনিক অসমিয়া গদ্যের পরিবর্তন কিছু পরিমাণে সূচিত হল স্বাধীনতা লাভের পরের সময়কালে। এই সময় থেকে ইংরেজি ভাষা ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নতুন শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার রাস্তা করে দিল। তাহলেও অসমিয়া আধুনিক গদ্যের যে-ধ্রুপদী শৈলী প্রতিষ্ঠা করলেন হেমচন্দ্র বরুয়া, বেজবরুয়া, সত্যনাথ বরা প্রমুখ তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তী সময়ের গদ্যরূপ পল্লবিত হয়েছে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক মন্থর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন লেখক, সাংবাদিকদের একাংশের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারে সচেতনতা হ্রাস পেয়েছে। এমন-কি, অনেক সময় কোনো শব্দের উৎস ও প্রকৃত অর্থ না-বুঝে করা ব্যবহারও খাদ্যে মিশে-থাকা ছোট ছোট কাঁকরের টুকরোর মতো হয়েছে। অন্য একটি লক্ষণীয় দিক হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গড়ে-তোলা সভ্যতার বিশ্বায়নে অনেক নতুন শব্দ আর প্রকাশভঙ্গির সহজ আমদানি ঘটেছে। অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় স্থানেও কিংবা অপ্রয়োজনীয়ভাবেও এরকম শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি ভাষার সৌন্দর্য ভবিষ্যতে নষ্ট করতে পারে বলে শঙ্কা হয়। তাহলেও এখনও পর্যন্ত অসমিয়া ভাষার লিখিত মান্য গদ্যরূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেও নিজের বিশিষ্ট চরিত্র রক্ষা করে চলেছে। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটবেই। প্রাচীন অনেক শব্দ, বাক্যাংশ, উপমা, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, প্রকাশভঙ্গি অব্যবহৃত হয়ে পড়বে। নতুন কিছু এসে সেই স্থান অধিকার করবে। কিন্তু

পরিবর্তনের বাতাস যাতে গাছটিকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে না-পারে তার প্রতি ভাষা-ব্যবহারকারীদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অসমিয়া ভাষা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেও এখনও পর্যন্ত নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। অনেক নতুন শব্দ, প্রকাশভঙ্গি গ্রহণ করে নিজের করে নিয়েছে। "দিবে আর নিবে/মিলাবে মিলিবে" এই দৃষ্টিতেই অসমিয়া ভাষার গদ্য নিজেকে যুগোপযোগী করে তুলেছে এবং ভবিষ্যতেও করে যেতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। ❑

❑ অসমিয়া থেকে অনুবাদ : **মন্দিরা দাস**

**নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি**


১) New Light on History of Asamiya Literature, Dimbeswar Neog, 1962.

২) Growth of the Asamiya Language Development of the Asamiya Script, Dimbeswar Neog, 1964

৩) অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, ডিম্বেশ্বৰ নেওগ, ১৯৫৭।

৪) Assamese, Its Formation and Development, Banikanta Kakoti, 1941.

৫) অসমীয়া প্রচীন লিপি, সর্বেশ্বৰ কটকী, ১৯৩৩।

৬) Development of Script in Ancient Kamrupa, Dr. T.P. Verma, 1976.

৭) অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা, মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৬২।

৮) অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, ১৯৮১।

৯) The Evolution of Assamese Script, Mahendra Bora, 1981.

১০) History of Assamese Literature, Birinchikumar Barua, 1964.

১১) অসমীয়া কথা-সাহিত্য, বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুয়া, ১৯৫০।

১২) অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ, উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ১৯৯১।

১৩) অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষণাৱলী (প্রথম খণ্ড), সম্পা. অতুলচন্দ্র হাজৰিকা, ১৯৫৭।

১৪) অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষণাৱলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পা. অতুলচন্দ্র হাজৰিকা, ১৯৫৭।

১৫) অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষণাৱলী (তৃতীয় খণ্ড), সম্পা. অতুলচন্দ্র হাজৰিকা, ১৯৬১।

১৬) ক্রমবিকাশত অসমীয়া কথাশৈলী, প্রফুল্ল কটকী, ১৯৭৯।

১৭) অংকাৱলী, সম্পা. কালিৰাম মেধি, ১৯৫০।

১৮) গুৰু চৰিত কথা, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৮৭।

১৯) বৰদোৱা-গুৰু চৰিত, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৭৭।

২০) ভাগবৎ-কথা, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৫৯।

২১) কথা-গীতা, সম্পা. হেমচন্দ্র গোস্বামী, ১৯১৪।

২২) অসম বুৰঞ্জী, সম্পা. সূর্য্যকুমাৰ ভূঞা, ১৯৪৫।

২৩) তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী, সম্পা. সূর্য্যকুমাৰ ভূঞা, ১৯৩২।

২৪) কামৰূপ বুৰঞ্জী, সম্পা. সূর্য্যকুমাৰ ভূঞা, ১৯৩০।

২৫) কামৰূপশাসনাৱলী, সম্পা. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, ১৯৩১ (বঙ্গাব্দ, ১৩৩৮)।

২৬) কামৰূপশাসনাৱলী (পৰিবর্ধিত সংস্কৰণ), সম্পা. ডিম্বেশ্বৰ শর্মা, ১৯৮১।

২৭) Inscriptions of Ancient Assam, Mukunda Madhava Sharma, 1978.

২৮) অৰুনোদই, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৮৩।

২৯) বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুয়া ৰচনাৱলী, সম্পা. নগেন শইকীয়া, ২০১৫।

৩০) লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, সম্পা. নগেন শইকীয়া, ২০১০।

৩১) Hastividyarnava, P.C. Choudhury, 1976.

৩২) ভাষণমালা (অসম ছাত্র সম্মিলন), সম্পা. অতুলচন্দ্র হাজৰিকা, ১৯৬০।

৩৩) চর্যাপদ, সম্পা. পৰীক্ষিত হাজৰিকা, ১৯৭৩।

৩৪) চর্যাগীতিকোষ, সম্পা. বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা, ২০১২।

৩৫) চর্যাগীত আৰু বৌদ্ধ-তন্ত্র, সম্পা. প্রণৱজ্যোতি ডেকা, ২০০১।

৩৬) প্রাচ্য-শাসনাৱলী, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৭৪।

# ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

## (১৮৯৪-১৯৫৫)

বিখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্র, রবিবার। পিতা বিরজানাথ ছিলেন কাত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। সেখানে রামনাথের ছেলেবেলা কেটেছে বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। শৈশবে পড়াশোনা হয়নি। প্রায় আট বছর বয়সে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা উভয়েই প্রয়াত। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হত। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

বানিয়াচং হাইস্কুলে পড়াশোনার পরে তরুণ বয়সেই বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত হন রামনাথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলি পল্টন'-এর সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নেন ১৯২৪ সালে। সাত বছর পরে, যখন তিনি প্রকৃতপক্ষে কপর্দকহীন তখন ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেলে তাঁর বিশ্ব-পর্যটন শুরু হয়। অদম্য ভ্রমণস্পৃহায় রামনাথ চারটি মহাদেশ সফর করেন সাইকেলে চেপে এবং বেশ কয়েকবারের পর্যটনে ওইসব দেশের কারুজীবী, শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

যদিও রামনাথ বিদ্যালয়জীবনের পরে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বাংলা ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর রচনার মাধ্যমেই আমরা কামাল পাশার পুনর্গঠিত তুরস্কের বিষয়ে জানতে পারি এবং আধুনিক চিনের বিশাল তৎপরতার বিষয়েও তিনিই বাঙালি পাঠকদের প্রথম অবহিত করেন। অর্থবল না-থাকায় বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি কতবার কতরকম সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারও চিত্তাকর্ষক বিবরণে তাঁর ভ্রমণকাহিনিগুলি সমৃদ্ধ।

ভ্রমণকাহিনি-রচয়িতা হিসাবে রামনাথের অনন্যতা যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনই ভূপর্যটক হিসাবেও তিনি সার্থকনামা। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে 'তরুণ তুর্কী', 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন', 'জুজুৎসু জাপান', 'ইরানের আর্য' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ❑

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

# বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর

তরুণ মুখোপাধ্যায়

"ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা সেই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।"
('কাব্য ও ছন্দ'/রবীন্দ্রনাথ)

বাংলা কবিতার আদি-মধ্যযুগের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ছন্দোবদ্ধ পদ্যই কবিরা ব্যবহার করেছেন। কেননা গদ্য মানেই বাস্তব ও প্রাত্যহিক কাজের ভাষা। কালান্তরে এই ধারণার অবসান ঘটেছে। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন, 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার' না-রেখেও 'বাংলা গদ্যে কবিতার রস' দেওয়া সম্ভব। তিনি এও দেখেছিলেন, "পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে... একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা" আছে। সেখানে "অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।" কথাগুলি কবি 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় বলেছিলেন। তাঁর মতে, গদ্যকবিতা 'রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থভারবহ গদ্য নয়।' গদ্যে তিনি অনুভব করেছেন 'নিয়মের শাসন নেই'। গদ্যছন্দ 'পঙ্‌ক্তিসীমানায় বিভক্ত'। তাই গদ্য কবিতার ছন্দকে তিনি 'ভাবচ্ছন্দ' নাম দিতে চান। বলেছেন—

> "...কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে।" ('গদ্যছন্দ')

প্রসঙ্গত 'ছন্দ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দাবি জানিয়েছেন, 'বাংলায় নূতন ছন্দ অনেক আমিই প্রবর্তিত করেছি' যার মধ্যে গদ্যছন্দ বা গদ্যকবিতা অন্যতম।

বিতর্কটা এখানেই। রবীন্দ্রনাথ প্রচুর গদ্যকবিতা লিখেছেন; কিন্তু গদ্যকবিতার জনক তিনি নন। সচেতনভাবে গদ্য ও পদ্যের বিরোধ ভঞ্জন যিনি প্রথম করেছিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৬-এ রবীন্দ্রনাথের দাবির ঢের আগে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১-এ 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখেন—

> "এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী।"

পরবর্তীকালে মৈত্রেয়ী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই কথা বলেছিলেন। যেমন, 'বাঁশি' কবিতা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, এই কবিতায় ভাববস্তু 'অন্য কোনো ছন্দেই চলত না, গদ্যছন্দ ছাড়া', কিংবা বলেন, 'গদ্যেও নয়, মিলেও নয়, একমাত্র গদ্যকবিতাতেই যথার্থ সুন্দরভাবে প্রকাশ হতে পারে এমন কথাও আছে।' (দ্র. 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ')। ফিরে আসি বঙ্কিমচন্দ্রে। তাঁর নিজের দেওয়া 'তিনটি গদ্য কবিতা'— মেঘ, বৃষ্টি, খদ্যোত। নমুনা—

> *এসো কাঁদি— বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন?*
>
> ('খদ্যোত')

এই গদ্যকে পঙ্‌ক্তি ও পর্বে বিন্যস্ত করলে গদ্যকবিতার রিদ্‌ম পাওয়া যাবে।

*এসো কাঁদি— বর্ষার সঙ্গে*
*তোমার আমার সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ*
*কেন?*

*আলোকময় নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল*
*বসন্ত গগনে*
*আমার স্থান নাই*
*কেন?*

গদ্যকবিতা হিসেবে এখানে পর্বসাম্য নেই, সুষমা আছে; অন্তর্লীন ছন্দও পাওয়া যায়। অথচ 'লিপিকা'য় রবীন্দ্রনাথ যে-গদ্যকবিতা লিখলেন, সেখানে পদ্যছন্দের স্পন্দন মুছতে পারেননি। যেমন, 'পায়ে চলার পথ'—

*এই তো*
*পায়ে চলার পথ।*
*এসেছে*
*বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে,*
*মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে,*
*খোয়াঘাটের পাশে*
*বটগাছতলায়।*

এখানে 'গদ্যকে কাব্য' করে তোলা হয়েছে। কবি বিষ্ণু দে যেজন্য বলেছিলেন,

"...কবিতার পাঁচিল তিনিও (রবীন্দ্রনাথ) ভাঙেন না, দরকার মতো শুধু চমৎকার কাব্যমণ্ডিত করে পাঙ্‌ক্তেয় করেন।" ('জনসাধারণের রুচি')

এজন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'লিপিকা'-র রচনাগুলিতে 'গদ্যকবিতা' বলেননি। 'পুনশ্চ' পর্বে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল 'বাস্তব জগৎ আর রসের জগতের সমন্বয় সাধন'। যেমন,

*নাম রেখেছি কোমলগান্ধার*
*মনে মনে।*
*যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,*
*বলত হেসে, 'মানে কী'।*
*মানে কিছুই যায় না বোঝা সেই মানেটাই খাঁটি।*
('কোমলগান্ধার')

কিংবা বিখ্যাত 'শিশুতীর্থ' কবিতা—

*রাত কত হল?*
*উত্তর মেলে না।*
*কেননা, অন্ধকাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে,*
*পথ অজানা,*
*পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।*

প্রথমে কবি ইংরেজিতে লেখেন The Child (১৯৩১)। তার শুরুটা—

*'What of the night'? they ask.*
*No answer comes.*
*For the blind time gropes in a mare*
*and knows*
*not its path or purpose.*

'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন' এভাবেই তিনি এখানে ভেঙেছেন।

কীভাবে গদ্যকবিতাকে নির্মেদ করতে হয়, তা-ও দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯২৮) কবি রাণী মহলানবীশকে একটি চিঠি লেখেন—

"অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখিনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা।"

'শেষ সপ্তক' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতাটা পড়া যাক—

*অন্য কথা পরে হবে।*
*গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।*
*এতদিন খবর দিইনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।*
*যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।*
*ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।*

ছন্দ আর গদ্য প্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষ যা বলেছেন তা স্মরণ করতে পারি।

"পাউন্ড ছন্দের একটা সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন এই বলে যে এ হলো 'a form cut into time'। গদ্যকে বলা যাক স্বতন্ত্র আর একটি বিন্যাস যা ভাবনা জগতের অন্তর্বর্তী দেশ-কে (inner space) রূপায়িত করে আনে।" ('আধুনিক ছন্দ')

ব্ল্যাংকভার্স ও ফ্রিভার্স মনে রেখেও রবীন্দ্রনাথ যা রচনা করলেন, শঙ্খবাবুর মতে তা 'রবীন্দ্রিক গদ্যছন্দ'। কৌশলী বাক্‌স্পন্দ এনেও ম্যানারিজ্‌ম মুক্ত নয় তাঁর গদ্যকবিতা। একে 'গদ্যছন্দ' বলতে চান না ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন। তাঁর মতে, 'গদ্যকবিতায় ছন্দ থাকে না, কিন্তু ছন্দের ভঙ্গিটুকু থাকে।' কবি ও ছান্দসিক উত্তম দাশের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে পুনরুদ্ধৃত করা যায়।

"গদ্যকবিতা ও গদ্য-ছন্দ প্রসঙ্গে অনেকে ফ্রিভার্স জাতীয় ফরাসী verse libérés এবং verse libres শব্দদুটির উল্লেখ করেন। verse libérés-কে বলা

হয়েছে free verse— পদ্যছন্দের মধ্যে গদ্যধর্মের মিশ্রণ। ফ্রান্সে প্রতীকবাদী আন্দোলন পর্বে পল ভেরলেন এই রীতির প্রবর্তক।...

"অন্যপক্ষে verse libres হলো খাঁটি গদ্যে লেখা কবিতা। পদ্যবন্ধের কোন অবকাশ নেই এখানে।... গদ্যের মধ্যে কবিতার স্পন্দন ফুটিয়ে তোলাই প্রধান কবিকৃত্য।" ('বাংলা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি')

এই অনুবর্তনে রবীন্দ্রনাথ যে-গদ্যকবিতা লিখলেন তাতে শঙ্খ ঘোষের অনুমান, "ছন্দকেই নমিত করে আনলেন কবি গদ্যের দিকে, নিয়ে এলেন তাকে অনায়াস বাক্‌স্পন্দে।" রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা নানাভাবে সেই গদ্যকবিতার চর্চা করে গেছেন। কখনো কবিতার স্তবকে, কখনো টানা গদ্যে। যে-কোনো কাব্যিকতা ও ছন্দের দোলা থেকে বাংলা গদ্যকবিতা মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্ববাক হয়ে উঠল।

অরাবীন্দ্রিক হওয়ার তাগিদে তিরিশের বা বিশ শতকের তিনের দশকের কবিরা যেমন তত্ত্বের খোঁজে ফ্রয়েড ও মার্ক্সের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তেমনই পাশ্চাত্যের কবিদের কবিতা ছিল তাঁদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। এইসব কবির মধ্যে হুইটম্যান, লরেন্স, বোদলের, এলিয়ট, ইয়েট্‌স ছিলেন অন্যতম। যাঁরা সমিল কবিতা লেখার লোভ পরিত্যাগ করেছিলেন। হুইটম্যান যেমন তাঁর আমেরিকার 'ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষা' প্রকাশে 'বিস্তারিত গদ্যচরণ' নির্মাণ করেছিলেন, তেমনই সমর সেন 'ছন্দোহীন পরিহাস্য এই সামাজিকতাকে' ধরার জন্য মোহভাঙা গদ্যবন্ধে কবিতা লেখেন— এমনই বলেছেন শঙ্খ ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্বে দেখেছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকায় নতুন কবির দল নিয়ম ভেঙে নব্যরীতির ও ভাবনার কবিতা লিখছেন। সেইসব কবির মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ছিলেন কবির প্রিয়। তাঁকে একাধিক চিঠিতে কবি 'আধুনিক' কবিতা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তরুণ কবিদের কবিতা পাঠে কবিগুরুর প্রতিক্রিয়া, এখনো কারো কারো কবিতায় 'গদ্যের জুতোজোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুন্টিবিরল পদ্যনূপুরের উদ্বৃত্ত' জড়িয়ে আছে। তবে অকপটে এও বলেন তিনি (বুদ্ধদেব বসুকে)—

"প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তামাসা' কবিতাটিতে পাহাড়তলির বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগল ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক!...সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে।" ('কবিতা'/দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪২)

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন (২২ মে, ১৯৩৫)—

"... রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য।... গদ্যকাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথই গদ্যকবিতা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। যদিও আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। বলা যায়, প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো। হুতোম প্যাঁচার নক্সা-য় কালীপ্রসন্ন সিংহ 'রথ' প্রকরণের শুরুতে মুক্তক ছন্দে গদ্যাত্মক ভঙ্গিতে লেখেন—

*হে সজ্জন! স্বভাবের*
*সুনির্মল পটে*
*রহস্যরসের রঙ্গে*
*চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে।*

রাজকৃষ্ণ রায় 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে' লেখেন,

*থাক শুয়ে বিধুমুখি!*
*বিজয়-হৃদয়-পাখী!*
*সারা নিশি কষ্টভোগ—*
*আহা, কি রোগের জ্বালা!*
*জাগাব না— থাক শুয়ে—*
*জাগাইলে হবে পাপ।* ('নিভৃত নিবাস')

গিরিশচন্দ্র পরর্বতীকালে 'গৈরিশ ছন্দ'-এ যা লেখেন, সেও গদ্যছন্দের পথ প্রশস্ত করেছিল মনে হয়। রাজকৃষ্ণ রায় যে 'পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক পদ্যগদ্য' লেখেন, তাকে তাঁর মনে হয় 'গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব' আনা। যেমন,

*আকাশ নীল— অনন্ত নীল,*
*মানব-চক্ষু*
*অনন্ত নয়—*
*সুতরাং আকাশ*
*অনন্ত নীল!*

বাংলা ছন্দের পূর্বাপর ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন

তাঁদের কারো মতে, 'বাঙলায় পদ্যের মতো পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে প্রথম গদ্যকবিতা লেখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।' (দ্র. রবীন্দ্রকাব্যপ্রসঙ্গ : গদ্যকবিতা/সুশীলকুমার গুপ্ত) 'বিজলী' পত্রিকার ১৩৩২ সনের ১৫ জ্যৈষ্ঠ 'পথ' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় গদ্যকবিতা 'পাঁওদল' বেরোয় ১ শ্রাবণ 'বিজলী'-তে।

*এ জীবন ধরে এই পথটিতে যা কিছু দেখেছি,*
*শুনেছি, ভালবেসেছি,*
*সবের গান গাইব।* ('পথ')

আরো পরে তিনি লেখেন 'নীলকণ্ঠ' কবিতা—

*আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,*
*সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ায়!*
*আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু!*
*আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া,*
*—ফ্যাকাশে রুগ্‌ণ তাই সভ্যতা।*

এর পাশে গদ্যকবিতায় কখনো হপ্‌কিন্স, কখনো ই. কামিংসকে অনুসরণ করে অমিয় চক্রবর্তী লেখেন—

*আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।*
*মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝংকার*
*অবিরহ,*
*সেই সৃষ্টিক্ষণ*
*স্রোতঃস্বনা* ('বৃষ্টি')

কিংবা 'অভিজ্ঞান-বসন্ত' কাব্যে পড়ি—

*দিকে দিকে*
*উদ্ভিন্ন*
*বাজে অঙ্কুরে*
*অন্তিকে*
*বাজে দূরে*
*কঠোর অভিজ্ঞানে*

সেখানে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যকবিতার সুষমা লিরিকের ছোঁয়া আনে—

*কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়*
*কেমন করে বলি।*
*কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর*
*যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান*
*দিগন্ত থেকে দিগন্তে*
('চিল্কায় সকাল')

বিষ্ণু দে লেখেন—

*পদধ্বনি!*
*কার পদধ্বনি*
*শোনা যায়?*
*মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো*
*কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।* ('পদধ্বনি')

সমর সেন গদ্যকবিতাই লিখেছেন।

*বর্তমানে মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা,*
*মাঝে মাঝে মনে হয়,*
*দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে*
*তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি।* ('নিরালা')

চল্লিশের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র গদ্যকবিতায় স্বচ্ছন্দ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' কবিতা সকলের জানা। স্বল্পজানা 'নরক' কবিতার অংশ উদ্ধৃত করছি। সত্তরের রক্তাক্ত ভয়ার্ত পরিবেশে লেখা এই কবিতা।

*যত হত্যা তত জয়; যতবেশ্যালয়ে বেলেল্লার অশ্লীলদূষিত*
*রক্তে মুহুর্মুহু করতালি, তত উলুধ্বনি ঘরে ও বাহিরে;*
*নাচে নগরীর শ্রেষ্ঠ পুরোহিতগণ, নাচে মন্ত্রী, নাচে*
*বিরোধীদলের নেতা; নিষ্পাপ গর্ভের শিশু রক্তে ভাসে,*
*নাকি বেশ্যাদের গর্ভে জন্ম নেই,...*

ফরাসি কবিতার অনুরাগী অরুণ মিত্র লেখেন টানা গদ্যে —

*নিশুত রাত। আমি দুঃস্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠেছি। মনে হচ্ছে যেন ভোর ফুটছে। কোথা থেকে আসছে এই আলো?* ('অরুণোদয়ের পথে')

আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যকবিতায় পাই আলাপচারিতার ভঙ্গি—

*আমাকে কেউ কবি বলুক*
*আমি চাই না।*
*কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে*
*জীবনের শেষদিন পর্যন্ত*
*যেন আমি হেঁটে যাই।* ('আমার কাব্য')

পঞ্চাশের কবিরা মুখের ভাষাকে কবিতায় আনতে চেয়েছেন। সাদামাটা আটপৌরে গদ্য তাঁদের কবিতার সম্পদ।

১. *সব তো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া,*
*সবার দিকে চোখ,*
*যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম!* (ছুটি/শঙ্খ ঘোষ)

২. *তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে*
*সহজ হবে তুমি আমার মতো,*
*নৌকা হবে সব পথের কাঁটা,*
*কীর্তনাশা পথে নমিতা নদী!*
*গোধূলি হলো।*
(একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

৩. *নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙ্গার মেঘলা আকাশ*
*তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর*
*ফুসফুস-ভরা হাসি*
(উত্তরাধিকার/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৪. *আমার ঠিকানা আছে তোমার বাড়িতে*
*তোমার ঠিকানা আছে আমার বাড়িতে,*
*চিঠি লিখব না।*
*আমরা একত্রে আছি বইয়ের পাতায়।*
(হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ/বিনয় মজুমদার)

৫. *এখানে একটা বাড়ি ছিল*
*এখানে কোনো বাড়ি নেই।*
*চেঁচিয়ে বলি, বাড়ি তুমি কোন্‌খানে আছো।*
(শোনো জবাফুল/আলোক সরকার)

ষাট বা ছয়ের দশকে হাংরি ও শ্রুতি আন্দোলন কবিতার ভাব-ভাষা-ভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছে। অ্যান্টি-পোয়েট্রি ভাবনাও এসেছে। যেমন, তুষার রায় লেখেন—

*গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার*
*রুমাল নাড়ছি*
*নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন*
*পাপ ছিল কিনা।* ('দেখে নেবেন')

অন্যদিকে মলয় রায়চৌধুরীর বাগ্‌ভঙ্গি—

*আমি কি করব কোথায় যাব ওফ্ কিছুই ভালো লাগছে না*
*সাহিত্য-ফাহিত্য লাথি মেরে ধ্বংস করে যাবো।*
('প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার')

কবিরুল ইসলাম সহজ সারল্যে লেখেন,

*আমার পূজা শুধু শরৎকালে নয়*
*আমার পূজা প্রতিদিন* ('প্রতিদিন')

ভাস্কর চক্রবর্তীর গদ্যে লিরিক ও কথনভঙ্গি মিশে যায় —

*শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা, আমি তিন মাস ঘুমিয়ে থাকব*
*— প্রতি সন্ধ্যায়*
*কে যেন ইয়ার্কি করে, ব্যাঙের রক্ত*
*ঢুকিয়ে দেয় আমার শরীরে— আমি চুপ করে বসে থাকি।*
('শীতকাল কবে আসবে')

পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘকবিতায় মহাকবিতার মেজাজ এনে গদ্যকবিতাকে আরেক মাত্রা দেন—

*আমার দু'হাতে কুষ্ঠ, অক্ষমতা শয়তানের পঙ্গু প্রতিরূপ*
*চৈতন্যের মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে সংখ্যাহীন মর্গের ইঁদুর।*
('ইবলিশের আত্মদর্শন')

সত্তর-আশি-নব্বই এবং একুশ শতকের প্রথম দশক জুড়ে যেসব গদ্যকবিতা পশ্চিমবঙ্গে লেখা হচ্ছে, সেখানে কবিরা চাইছেন, কবিতা যেন নির্মাণ ও সৃষ্টির দ্বৈতরাগিণীতে বেজে ওঠে। মহিলা কবিদের মধ্যে দেবারতি মিত্র, কৃষ্ণা বসু, মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, যশোধরা রায়চৌধুরী প্রমুখ সংসার ও সমাজের যে-ভাষ্য রচনা করছেন, সেখানে প্রতিবাদ ও প্রেম, কাম ও বেদনা গদ্যকবিতায় মূর্ত হয়েছে। তবে এটাও ঠিক, পূর্বজ কবিদের গদ্যকবিতা ও গদ্যছন্দকে তাঁরা আমূল বদলে দিয়েছেন এমন নয়। পুরুষকবিদের ক্ষেত্রেও সে-কথা সত্য।

উত্তর-পূর্ব ভারতে যাঁরা বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেছেন, তাঁদের কিছু কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি, যাতে তাঁদের রচনাভঙ্গি কেমন বোঝা যাবে।

১. *সপ্রাণ সফেন সব নরনারী কাপড়েরই মতো শুকনো মাড়ে*
*খরখর করছে; নাও ইস্ত্রি করো, প্রাণ ঐ দু'তিন ভাঁজের*
*তেনা তেনা।* (ক্রমশ ধোপানি আসে/বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত)

২. *কবির বুকের শব্দ পাঠকেরও বুক ছুঁয়ে থাকে*
*তার মাঝে মায়াজাল তার মাঝে রহস্য পরিখা।*
(কবি পাঠক সংবাদ/শক্তিপদ ব্রহ্মচারী)

৩. *বন্ধু আমি সুদীর্ঘকাল বাত্যাহত*
*ছিন্নপালে পাগল হাওয়ার অট্টহাসি।*
(বাত্যাহত/উদয়ন ঘোষ)

৪. *আমি তো তোমাকে দেখতে চেয়েছি/চাঁদের চোখে*
(রমানাথ ভট্টাচার্য)

বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর এভাবেই বহমান। ❑

# মোসলমান নাম তত্ত্ব

## পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

আমাদের শিক্ষিত মোসলমান ভ্রাতৃগণ বঙ্গ-সাহিত্য চর্চায় তেমন মনোযোগী নহেন; মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত বাংলা গ্রন্থ-প্রণয়নে অথবা বঙ্গের মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতে কাহাকেও দেখা যায় না। ইহা বাংলা ভাষার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের কথা। আরব্য ও পারস্য-সাহিত্যে যেসকল রত্নরাজি বিরাজমান, ওই সকল আহরণ পূর্বক মাতৃভাষাকে অলংকৃত করা তাঁহাদের কর্তব্য ছিল, কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে প্রায়শ উদাসীন। অনুচ্চ-শিক্ষিত মোসলমানগণ কর্তৃক পারস্য-ভাষার অনেক মনোহারী কাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের ভাষা বাংলার উর্দু— 'হয়' 'করে' প্রভৃতি দুই একটি অত্যাবশ্যক বাংলা শব্দ ব্যতীত ওই সকল মোসলমানি পুথিতে আরব্য ও পারস্য-ভাষার শব্দই ভূরিশ প্রযুক্ত হইয়াছে— বাংলা-সাহিত্যের পাঠকগণ এমন-কি সুশিক্ষিত মোসলমানগণ পর্যন্ত ওই সকল পুথি কদাচিৎ পাঠ করিয়া থাকেন, ফলত মোসলমান কর্তৃক বঙ্গসাহিত্যের সেবা অতি অল্পই হইয়াছে।

অতএব যাহা আরব্য পারস্যে সুশিক্ষিত ব্যক্তি (সুতরাং মোসলমান) কর্তৃক অনুশীলিত হওয়া উচিত ছিল তাহা, উক্ত ভাষাদ্বয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তি কর্তৃক আলোচিত হইতেছে, ইহতে ভ্রম-প্রমাদ থাকিবারই কথা।

মোসলমানের নাম বাংলায় লিখিতে অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন। এই ভুলের প্রধান কারণ এই যে লেখকেরা পারস্য বিশেষত আরব্য ভাষায় প্রায়শ অনভিজ্ঞ; আবার যাঁহারা এই ভাষাদ্বয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারা অর্থাৎ মোসলমানগণ প্রায়শ বাংলা-ভাষায় বিশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস করিতে তেমন মনোযোগী নহেন।

বলা বাহুল্য মোসলমানের নাম অধিকাংশই আরব্য শব্দ, কদাচিৎ দুই চারিটি পারস্য শব্দও দেখা যায়। বর্ণমালার পে (প) চে (চ) গফ্ (গ) পারস্য; সুতরাং এই অক্ষরগুলি সংবলিত কয়েকটি নাম (যথা, পির, চেরাগ, গোল) পারস্য। মোসলমানগণ নাম রাখিতে আরব দেশের ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষদিগের নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং মোহাম্মদ, আলি হাসান্ ইত্যাদি নামই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এখন 'চ' যখন আরব্য বর্ণ নহে, তখন "হাসান হোসেন" প্রভৃতি নামে 'চ' ব্যবহার সুতরাং নিষিদ্ধ; আমরা মধ্যে মধ্যে যে "হাচন" মিয়া কিংবা "হুচন আলি" দেখি, তাহা ভ্রমমূলক। 'চ' বরং পারস্যে আছে; কিন্তু 'ছ' আরব্য-পারস্য উভয়েই নাই। উর্দুতে 'ছ' লিখিতে, ইংরেজিতে যেমন মহাপ্রাণ বর্ণ লিখিতে অল্পপ্রাণ বর্ণে 'হ' (h) যোগ দিয়া কার্য সাধন হয়, তদ্রূপ 'চ'তেও 'হ' যোগ দিতে হয়। সৈয়দ' এই শব্দে অনেক স্থলে যে 'ছৈয়দ' লিখা হয় তাহা অত্যন্ত ভ্রান্তিসূচক। ফলত মোসলমানের নামে 'ছ' কদাপি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে যে স্থলবিশেষে— বিশেষত পূর্ববঙ্গ ও আসামে—ছ (এবং চও) ইংরেজি এস্ (s)-এর ন্যায়, উহা আরব্য-পারস্য সিন্ (স) সোয়াদ (স)-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, তখন 'ছৈয়দ' বা 'হাচন' লিখিতে হানি কী? ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে বঙ্গের সর্বত্র তো আর 'চ'— 'ছ' s-এর ন্যায় উচ্চারিত হয় না। বিশেষত 'স'-এর প্রকৃত উচ্চারণ 's'-এর মতো; বাংলা-ভাষায় তিন 'শ'-এর উচ্চারণ একই রূপ হইলেও র যোগে এবং তত্তদ্বর্গীয় বর্ণ যোগে শ-ষ-স এর প্রকৃত উচ্চারণ বাহির হইয়া পড়ে। আবার মোসলমানের নাম বঙ্গদেশে এক রূপ লিখিত হইবে, কাশী, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে অন্যরূপ লিখিত হইবে, তাহা তো ভালো দেখায় না। সুতরাং বর্ণমালার মূল সংস্কৃত উচ্চারণ

ধরিয়া ভাষান্তরের শব্দ বানান করিলে সর্বত্রই একরূপ বানান হইবে; 'সৈয়দ' শব্দের বানান বাংলায় যেরূপ 'স' দ্বারা হইবে ভারতবর্ষে অন্যান্য অঞ্চলেও সেইরূপ 'স' দ্বারাই হইবে। যাঁহারা বাংলা শব্দগুলির উচ্চারণ (তাহাও আবার পশ্চিমবঙ্গের) অনুসরণ করিয়া বাংলার বর্ণমালার উপর হস্তক্ষেপ করিতে যান, তাঁহারা যেন এই ভাবিয়া দেখেন যে বাংলার বর্ণমালার আকৃতি পৃথক হইলেও ইহা বাঙালির নিজস্ব নহে; ইহা ভারতবর্ষীয় জনসমূহের সাধারণ সম্পত্তি "সংস্কৃত" হইতে লব্ধ। বর্ণমালা সর্বত্র এক থাকায় নানা সুবিধা আছে; ভারতীয় ভাষান্তর শিক্ষা করিতে বানানের জন্য তেমন শ্রম করিতে হয় না। যাহা হউক, ইহা অবান্তর বিষয়।

আরব্য বর্ণমালায় 'স' কার চারিটি আছে; 'সে' (ইহার উচ্চারণ 'তে'র মতোও হয়) সিন্ শিন্ সোয়াদ্; প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থকে 'স' দ্বারাই তরজমা করিতে হইবে— আরব্যে ইহাদের উচ্চারণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে, কিন্তু বাংলা বর্ণমালা দ্বারা এই পার্থক্য বজায় রাখা যাইতে পারে না। তবে শিন্-এর উচ্চারণ অনেকটা 'শ' (বা ষ)-এর ন্যায়; "শেখ" "রশিদ" বখ্শ্" প্রভৃতি শব্দ শিন্ দ্বারা লিখিত হয়, সুতরাং এই সকল শব্দ বাংলায় লিখিতে গেলে 'শ'-এর ব্যবহারই করা উচিত। শেখ ও বখ্শ্ শব্দে অনেকে ডবল ভুল করিয়া থাকেন; তাঁহারা 'সেক্' ও 'বক্স' লিখেন। এই সকল শব্দে যে কেবল 'স'— 'শ' হইবে তাহা নহে, 'ক'ও 'খ' হইবে।

আরব্য বর্ণমালায় পাঁচটি 'জ' আছে; জিম্, জাল, জে, জোয়াদ (ইহার উচ্চারণ "দোয়াদ" হয়) এবং জোয়ে। কেবল প্রথমটিরই উচ্চারণ বর্গীয় 'জ'-এর ন্যায়; অন্যগুলির উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি জেড্ (z)-এর ন্যায়। আমাদের একটি মাত্র 'জ' সম্বল; ইহা দ্বারা আমরা 'জেম্স্' ও 'এলিজাবেথ' এই ইংরেজি জে ও জেড্যুক্ত শব্দদ্বয় যেমন লিখিয়া থাকি, ইহারই দ্বারা সুতরাং আমাদিগকে পঞ্চবিধ আরব্য জ-সংবলিত শব্দ লিখিত হইবে। কিন্তু 'জিম' অক্ষরটি যেসকল শব্দের আদিতে আছে, সেইগুলির একটু খবর মধ্যে মধ্যে রাখিতে হইবে; কী জন্য, তাহা লিখিত হইতেছে।

আরব্য বর্ণমালার দুইটি বিভাগ আছে; শামসি (সৌর) ও কাম্রি (চান্দ্র); উল্লিখিত চারিটি স এবং জিম্ ছাড়া অপর চারিটি 'জ', দুইটি [তে ও তোরে,] দ [দাল] র [রে] ল [লাম] ও ন [নুন]।

এই চতুর্দশ অক্ষর সৌর; অপরগুলি চান্দ্র, এই সৌর অক্ষরগুলির ঈদৃশ নামকরণ কী জন্য হইল তাহা জানি না; তবে সূর্যসন্নিধানে স্থিত জলাদি যেমন বাষ্পীভূত হইয়া রূপান্তরিত হয়, তদ্রূপ এইসকল অক্ষরের অব্যবহিত পূর্বে আরব্য সম্বন্ধবাচক উপসর্গ 'আল্'[২] থাকিলে উহার 'ল'-এর উচ্চারণ পরবর্তী বর্ণের সদৃশ হইয়া যায়। যথা 'শামস্-উজ্-জোহা' 'আব্দ্-আর্-রহমান্' 'আব্দ্-উন্-নুর' ইত্যাদি। জব্বরের 'জ'টি চান্দ্র, 'জিম' সুতরাং আব্দুল্ জব্বর হইবে, আব্দু জব্বর নহে। কেহ কেহ যে হারুণ-আল্-রশিদ বা আব্দুল্ রহিম লিখেন তাহা ভ্রমমূলক।

প্রায় প্রত্যেক নামের সঙ্গেই মহাপুরুষ মোহাম্মদের নাম সংযোজিত হয়; কিন্তু এই নামটি অনেক স্থলেই অশুদ্ধ লিখা হয়; 'মাহামদ' 'মহম্মদ' 'মহম্মদ' 'মাহাম্মদ' ইত্যাদি বহুপ্রকারে ইহার বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। আবার উহা সংক্ষেপ করিতে গিয়া কেহ 'মং' কেহ 'মাং' এইরূপ লিখেন, পরিশুদ্ধ বানান "মোহাম্মদ"[৩] হইবে।

এইরূপ স্থলে ম-এর উপর উ-কার উচ্চারণসূচক পেশ্ থাকে; কোনো কোনো নামে উহা উ-কার রূপে, কোনো স্থলে বা ও-কার রূপেও উচ্চারিত হয়। ইংরেজিতে 'u' দ্বারা সর্বত্রই এই পেশ্ অনূদিত হয়। কিন্তু বাংলার অধিকাংশ স্থলেই 'ও-কার' দ্বারা ইহার অনুবাদ হয়। যথা 'মোকদ্দমা' 'মোহকুমা' ইত্যাদি।

'মোহাম্মদ' 'মোকদ্দম' প্রভৃতিতে তৃতীয় অক্ষরটিতে তশ্দিদ্ থাকায় দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, তজ্জন্য 'ম্ম' 'দ্দ' প্রভৃতি শুদ্ধই লিখা হয়। "মোজাঃফর" "মোফাস্বল" প্রভৃতিতে 'ফ' ও 'স'-এর দ্বিত্ব হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সচরাচর 'বিসর্গাদি ফ' ও 'স্ব' লিখা হয়। আমার বোধ হয় এইরূপ স্থলে 'ঃফ' 'ঃস' এইরূপ লিখিতে দেওয়াই উচিত। 'ফ' 'স'-এর দ্বিত্ব বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেখা যায় না, এই নিমিত্ত "বিসর্গাদি" করিয়া উচ্চারণ ঠিক রাখা মন্দ নয়। "মোজাপ্ফর" না-লিখিয়া প্রচলিতানুরূপ "মোজাঃফর" লিখিলেই চলিবে অর্থাৎ যেসকল বর্ণের দ্বিত্ব বঙ্গভাষায় সচরাচর অপ্রচলিত, সেই সকল বর্ণের উপর তশ্দিদ্ থাকিলে "ঃ" পূর্বে প্রয়োগ করিয়া উচ্চারণ বজায় রাখিতে হইবে।[৪]

আমরা যেভাবে 'হ্ম' উচ্চারণ করি (অর্থাৎ "ম্হ") তাহাতে "আহ্মদ" লিখিতে "আহ্মদ" ঠিক নয়। এইরূপ স্থলে হ ও ম পৃথক্ রাখিয়া দেওয়াই ভালো, 'হ'-এ হসন্ত (্) চিহ্ন প্রয়োগ করিলেই ঠিক হইবে। "মাহমুদ" প্রভৃতিও এই নিয়মে লিখাই উচিত। ঠিক এই কারণে "আশ্রফ্" লিখা উচিত, কেননা "শ্র"

লিখিলে উচ্চারণ ঠিক হইবে না। "সোব্হান্" "মজহর" প্রভৃতি স্থলে "সোভান" "মঝর" ইত্যাদি লিখিলে যদিও বিশেষ কোনো হানি নাই, তথাপি আরব্য বর্ণমালায় যখন ভ ঝ প্রভৃতি "ঝষ্" নাই, তখন এই অক্ষরগুলি বাংলার অনুবাদেও পরিত্যাগ করাই সংগত।

অনেক সময় সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে আরব্য শব্দ অশুদ্ধ করিয়া লিখা হয়। কেহ কেহ মোসলমান লিখিতে গিয়া "মুসলমান" লিখেন[৫]; ঈদৃশ ব্যক্তিরাই ম্যাক্স্ মুলার (Max Muller)-কে "মোক্ষমুলর" করিয়া ভট্টাচার্যের পদবি প্রদান করিয়াছেন। আবার বোধ হয় ইংরেজি বক্স box শব্দের নমুনায় 'রহিম বক্স্' 'করিম বক্স্' প্রভৃতি নাম লিখা হয়। বক্স্ না হইয়া "বখ্শ্" হইবে। এইরূপে মধ্যে মধ্যে মনুওর আলির পরিবর্তে মনোহর আলি, খিরদ্বখ্ত-এর পরিবর্তে ক্ষীরোদ ভক্ত প্রভৃতি পাওয়া যায়।[৬]

পূর্বে বলা হইয়াছে যে 'প' অক্ষরটি আরব্যতে নাই, যদিও পারস্যে আছে; এবং কদাচিৎ দুই একটি পারস্য শব্দ (যথা পির পয়গম্বর) মোসলমানের নামে ব্যবহৃত হয়। এই অবস্থায় 'প' ব্যবহার করিতে সাবধান হওয়া উচিত। "সিপাৎ" বা "ইর্পাণ" না-লিখিয়া "শিফাৎ" "ইরফান্" লিখা উচিত।

মোসলমানের নামের পাছে প্রায়শঃ উল্লাহ্[৭] শব্দটি দেখা যায়; ইহা সচরাচর "উল্লা" এইরূপ লিখা হয়। আমরা 'শাহ্' লিখিতে কখনই 'হ' পরিত্যাগ করি না; এতদবস্থায় "উল্লাহ্" লিখিতেও 'হ' ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়; ইহা অনেকটা সংস্কৃত বিসর্গের মতো।

সচরাচর যেসকল নাম লিখিতে গোলযোগ দেখা যায়, এইরূপ কতকগুলি নামের তালিকা দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল। ❑

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| অলিমহম্মদ | ওলিমোহম্মদ | উজির মিয়া | ওজির মিয়াঁ |
| অহিদবক্স | অহিদবখ্শ্ | করিমউদ্দি | করিম্উদ্দিন[৮] |
| আছান | আহ্সান্ | জোয়াদুল্লা | জাদ্উল্লাহ |
| আজগর | আস্গর | নৈমুদ্দি | নায়িম্উদ্দিন |
| আজরহুসান | এজ্হারহোসেন | ফৈজুল্লা | ফয়েজউল্লাহ্[৯] |
| আব্দুল্ ছত্তর | আব্দুঃ সত্তার | মবশ্বির | মোবাঃশির |
| আস্রবালি | আস্রফ্ আলি | মস্তাপা | মোস্তাফা |
| আহাম্মদবক্ত | আহম্দ্ বখ্ৎ | মাংমঝর | মোংমজ্হর |
| ইনাৎ | ইনায়েৎ | মুসিন | মোহসিন্ |
| ইযুব | ইউসুফ্ | লতিবর রহেমান্ | লৎফুঃ রহ্মান |
| ইসন্ | এহ্সান্ | সেক্ সরিপ | শেখ শরিফ্ |
| ইসাক্ খা | ইস্হাক্ খাঁ | সেকায়ৎ | সাখাওৎ |
| উছমান্ | ওস্মান্ | | |

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৫, সংলেখ ৭৬২/১৫, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৮)

---

**সূত্রসংকেত**

১. পরিশুদ্ধভাবে লিখিতে গেলে "সায়য়দ" বা "সাইয়দ" হওয়া উচিত; যাহা হউক সুপ্রচলিত সৈয়দই গ্রহণীয়।

২. ইহার উচ্চারণ স্থলবিশেষে 'আল্' 'ইল্' ও 'উল্' এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে।

৩. অনেকে 'মোহম্মদ'ও লিখেন; আবার কেহ কেহ 'মুহাম্মদ'ই পরিশুদ্ধ বানান বলিয়া মনে করেন।

৪. যেখানে 'আল্'-এর 'ল' পররূপ প্রাপ্ত হয়, সেইস্থানেও এই বিধি খাটিবে। যথা— 'আব্দুস্ সোবহান্' ইত্যাদি।

৫. "মুষল" শব্দটির দন্ত্য স দ্বারাও বানান হইতে পারে; যা-ই হোক মুষল শব্দের পর 'মতুপ্' 'বতুপ্' হইয়া যাইবে, ইহাও ভাবা উচিত ছিল।

৬. মোসলমান ও হিন্দু পরস্পর এরূপভাবে মিশ্রিত হইয়াছেন যে অনেক সময়ে কৌলিক উপাধি একই রূপ দেখা যায়। যথা চৌধুরী, মজুমদার, খাঁ, বিশ্বাস প্রভৃতি। "ফকির বিশ্বাস' বলিলে হিন্দু কি মোসলমান ঠিক করা কঠিন; কেননা ফকির শব্দটি আরব্য হইলেও হিন্দু নামে ব্যবহৃত হইতেছে। মোসলমানদের মধ্যে ডাকনাম অনেক সময় হিন্দুর অনুরূপ হইয়া থাকে যথা "লালমিয়া" "চাঁদমিয়া" "সোনামিয়া" ইত্যাদি। তবে মোসলমানের আসল নামে কখনো হিন্দুর শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই বিষয়ে হিন্দুরা সর্বদাই উদার। তাই ফকিরচাঁদ, দুনিয়ালাল, গোলাবচন্দ্র প্রভৃতি নাম হিন্দুর মধ্যে দেখা যায়। বর্তমানে আবার ইংরেজি নামও শুনা যাইতেছে যথা, লাড্লি মোহন (বোধ হয় Lordly-এর অনুকরণে) এবং রিপনচন্দ্র রোমোলা ইত্যাদি।

৭. অর্থ "ঈশ্বরের" "নুর্ উল্লাহ" ঈশ্বরের জ্যোতিঃ [ নুর্ স্থানে অনেকে "নূর্" ঊ-কার দিয়া লেখেন। পরবর্তী তালিকা দ্রষ্টব্য।]

৮. কেহ কেহ এস্থলে "করীমউদ্দীন" এইরূপ ঈ-কার প্রয়োগ করেন। ফলত ই বর্ণের ও উ বর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করিয়া মোসলমান্ নাম লিখা বড় দুরূহ ব্যাপার। তাই সর্বত্র হ্রস্ব ব্যবহৃত হইল। ইহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় বলিয়া বোধ হয় না।

৯. "করিম্উদ্দিন" "জাদ্উল্লাহ্" "নায়িম্উদ্দিন" ফায়জ্উল্লাহ্ প্রভৃতি স্থলে "করিমুদ্দিন" "জাদুল্লাহ" "নায়িমুদ্দিন" "ফায়জুল্লাহ" এইরূপ লিখা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যবহারত প্রায়শ এইগুলি বিযুক্তই দেখা যায়।

# ভারত ভ্রমণ

(অখণ্ড ভারতের অংশবিশেষ)

## রামনাথ বিশ্বাস

### পরেশনাথ

পরেশনাথের মন্দির— কতলোক সেই মন্দির দেখতে যায় তার হিসাব কে রাখে? জিশুখ্রিষ্টের জন্ম হবার পূর্বে অবতার পরেশনাথের জন্ম হয়েছিল। তিনি জীবে দয়ার কথাই বলেছিলেন। তাঁর উপদেশমতো যারা চলে, তাদের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। প্রায় প্রতিটি বড় শহরেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুনেও তাদের দেখে এসেছিলাম। পরেশনাথের মন্দিরের কাছে এসেই পরেশনাথের উপদেশ ও কার্যাবলির কথা মনে হয়েছিল। চেষ্টা করে দেখব, সেই চিন্তাধারার কিছুটা লিপিবদ্ধ করতে পারা যায় কি না।

ভারতের এক শ্রেণির লোকের কাছে পরেশনাথ অবতার অর্থাৎ Incarnation of God। ইংরেজি শব্দ ক-টা লিখতে হল, নতুবা কথায় জোর থাকে না। যিনি ছিলেন ঈশ্বরের অংশ, যাঁর ভক্তরা ভারতের বড় বড় শহরে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা অর্জন করছে, তাদের কারো কি দয়া-মায়া আছে? এদের মুখ থেকে শোনা যায়, 'পূর্বজন্মের পাপের ফলে লোক খেতে পায় না, ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না' ইত্যাদি।

আমার জন্ম পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলায়। আমি কীর্তন করতে এবং কীর্তন শোনাতে অভ্যস্ত ছিলাম। সেখানেও জন্মান্তরবাদের কথাই বেশি শুনতাম; কিন্তু স্টালিনের সোভিয়েতে কী করে রাতারাতি সকলেই সুখী হতে পারল, তা কি চিন্তার বিষয় নয়? সেখানে কেউ অভাবে আছে দেখতে পাইনি। আমাদের দেশে যখন চালের সের দুই পয়সা ছিল তখনও লোক না-খেয়ে মরত, তারই-বা কারণ কী? হজরত মহম্মদ বলে গেছেন, যা আয় হবে তার দশ পারসেন্ট গরিব দুঃখীকে দিয়ে দেবে, কিন্তু যেসব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচলিত সেই দেশগুলিতে এত দারিদ্র্য কেন? অনেকে দিনান্তে একখানা রুটি খেতে পায় না, তার কারণ কী?

যাঁদের কাছে বসে এই ধরনের চিন্তা করছিলাম, তাঁরা কেউই ধর্মচর্চার ধার ধারতেন না। একজন হাত দেখতেন এবং তাঁর ফি ছিল পঞ্চাশ টাকা। অতএব তাঁদের কাছে এই ধরনের চিন্তার কথা বলা না-বলা একই কথা। তাঁদের ভাষায় বলছি, 'যো কুছ্ দেখ্‌তা হ্যায়, সবই বুজরুকি— পয়সা রোজগার কা ফন্দি হ্যায়।'

পরেশনাথের জন্ম নাকি কাশীতে হয়েছিল, সেখানে একটি মন্দিরও দেখেছিলাম এবং পরেশনাথের ভক্তের সংখ্যাও কম দেখতে পাইনি, তবে কেন কাশীতে দরিদ্রের সংখ্যা বেশি? জীবে দয়া যাদের মতবাদ, তাদের সামনে এত লোক উপবাস করে কেন? এত লোক রোগে কষ্ট পায় কেন? কোটিপতিরা একটি পয়সাও দরিদ্রের জন্য দেয় না কেন? অথচ তারা পিপীলিকাকে চিনি দিয়ে সন্তুষ্ট করে, গরুর জন্য পিঁজরাপোল খোলে। কিন্তু বৃদ্ধ নরনারীর জন্য কিছুই করে না।

পরেশনাথের ভক্তরা বড় বড় ধর্মশালা করেছে বটে, সেখানে নিয়ম আছে, আইন আছে। সেই আইন অনুযায়ী তিনদিনের বেশি কেউই ধরমশালায় থাকতে পারে না। রোগ হলে তো রক্ষা নাই, ধরমশালার কাছেও যাবার উপায় নেই— এক ফোঁটা জলের আশাও করা যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে, পরেশনাথের ভক্তরা শুধু মনুষ্যেতর জীবের সাহায্য করতেই ব্যস্ত, কিন্তু যে-মানুষের যথাসর্বস্ব আইনের মারপ্যাঁচে অপহরণ করা হয়েছে ও হচ্ছে, সেই মানুষকে সব দিক দিয়ে বঞ্চনা আর বর্জন করাই যেন এদের একমাত্র ধর্ম। এখানে অবতারবাদ সম্পূর্ণ রকমে

ফেল করেছে।

আমি যখন পরেশনাথের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছিলাম তখন একজন গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ভাবছেন বেদব্যাস?"

বলার মতো কিছুই ছিল না, চুপ করেই থাকলাম। গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধু বললেন, "পরেশনাথ দেখার কথাই ভাবছেন— কেমন নয় কি?" আমি বললাম, "অনেকটা তা-ই।"

গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধু বললেন, "এসব দেখে লাভ হবে না, আমাদের সঙ্গে থেকে চা ও দুধ খান এবং সেইসঙ্গে উত্তম খাদ্য খেতে থাকুন, তবেই লাভ হবে। পরেশনাথের মতবাদ যারা মেনে চলছে, তারাই আমাদের দেশের কোটিপতি, তাদের চিন্তাধারা অন্য রকমের। কী করে টাকার সংখ্যা বাড়াবে কেবল সেইদিকেই তাদের লক্ষ্য।

"বেশি কথা বলে লাভ নেই বেদব্যাস, আমাদের প্রত্যেকের বয়স সত্তরের উপরে। গঙ্গাযাত্রা করতে গিয়ে দেখেছি, আসলে গঙ্গাযাত্রা নয়, হত্যার একটা উত্তম ব্যবস্থা। নিজের ছেলে পিতার হত্যার ব্যবস্থা করে, এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? পরেশনাথ দেখে লাভ নেই। আমাদের সঙ্গে আরো কয়েকদিন থেকে শরীরটাকে সুস্থ করে আবার রওনা হন। যদি পারেন তবে একবার দোয়ারিকাশ্রম দেখে আসবেন। সেখানে আপনার যে-অভিজ্ঞতা অর্জন হবে, সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেও সেরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন না।"

"কেন, সেখানে এমন কী আছে?" এই ধরনের প্রশ্ন করা আমার অভ্যাস ছিল না। গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধুরাও বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু তাঁদের উপদেশ মনে রেখেছিলাম।

গঙ্গাপ্রাপ্ত সাধুরা অবতারবাদ মোটেই মানতেন না। তাঁরা বলতেন, "আরে ভাইয়া, অবতার হামলোগকা মাফিকই আদমি থা, উনকা বাত ইয়াদ করনেসে কেয়া ফায়দা হোগা?"

আমাদের দেশে সাধু-সঙ্গ মাত্র আরম্ভ হয়েছিল, সেজন্য বিশেষ কোনো কথা বলতে সাহস করতাম না। কিন্তু এঁদের সঙ্গে দু-দিন থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, সাধুদের মধ্যেও এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা মনের দুঃখে কষ্ট পাচ্ছেন অথচ লাল কাপড় পরিত্যাগ করতে পারছেন না।

সেইরকম একজন সাধুর সঙ্গলাভ হয়েছিল কলকাতায়। তিনি কোনো বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন, কিন্তু ভেতরের কাণ্ড দেখে দলত্যাগ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারত-ভ্রমণেই ব্যস্ত আছেন। সেই সাধুকে একদিন মাও সে-তুঙের জীবন-কথা বলেছিলাম। তিনি অবাক হয়ে রইলেন এবং কয়েকদিন পরে বলেছিলেন, "মহা কঠিন কাজ মাও করছেন যা আমাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হত না।"

**বাগদা**

দুইদিন সাধুসঙ্গ করে বাগদা নামক স্থানের দিকে রওনা হই। ইচ্ছা— ডান ও বাঁদিকের লোক দেখে যাওয়া। সকালেই উঠেছিলাম কিন্তু গঙ্গাযাত্রীদের অতি ভালোবাসায় চা না-খেয়ে যেতে পারলাম না। বেলা হয়েছিল। বিদায়ের সময় কেউ আশীর্বাদ করলেন না, শুধু বললেন, "যাত্রা শুভ হোক।"

যাত্রা-যে কত শুভ হয়েছিল তা পথে বের হয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। ক্রমাগত চড়াই ঠেলে যেতে হচ্ছিল। অনেক স্থানে সাইকেল ঠেলতে হয়েছিল। পথের দু-পাশে অনেকগুলি গ্রাম দেখতে পেয়েছিলাম। গ্রামের বাসিন্দা হিন্দু মুসলমান সকলেই, মাঝে মাঝে খ্রিষ্টানও দেখছিলাম। আসলে এরা সবাই সাঁওতাল। হালে হিন্দু-মুসলমান খ্রিষ্টান হয়েছে। আচার-ব্যবহার সাঁওতালদের মতোই রয়ে গেছে।

ক্রমাগত চড়াই ঠেলে বাগদার ডাকবাংলোতে পৌঁছই। মাত্র চোদ্দ মাইল পথ। দু-দিকেই ছিল সামান্য রকমের বন-জঙ্গল। শালবনই বেশি। ভবিষ্যতে বিড়ি বানাতে এবং কাঠ ব্যবহারে বন থাকবে না। তবে মরুভূমি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। প্রত্যেক গ্রামেই বৃক্ষের প্রাচুর্য দেখে আনন্দ হয়েছিল।

ডাকবাংলোর দারোয়ান বলছিল, এদিকে বিষাক্ত সাপের সংখ্যা বেশি। হবার কথাই, সবাই অহিংস হলে সাপ বাড়বেই। মনে হয়, এরা পূর্বে সাপপূজা করত নতুবা সাপের প্রতি এত মমতা কেন?

লজ্জার কথা— এই কালো লোকগুলির মধ্যেও অবতারবাদের গোঁড়ামি এত প্রবেশ করেছে যে এক অবতারবাদী অন্য অবতারবাদীর মৃত্যু কামনা করে। ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা কেউ পরিত্যাগ করতে পারে না, মানুষও পারে না, জীবজন্তু পারে না, কিন্তু পরিত্যাগ করতে পারে অবতারবাদ।

এখানকার ডাকবাংলোতে সাধারণত পাদ্রি সাহেবরাই থাকেন। প্রথমত আমাকে স্বদেশবাসী দেখে দারোয়ান থাকতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পরে যখন বুঝতে পারল যে, দরজা পদাঘাতেই খোলা হবে তখন দারোয়ানের হুঁশ হয়েছিল। তার উপর যখন মিশনারি সাহেব ডাকবাংলোতে প্রবেশ করেই

আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন, আদিবাসী সাঁওতালের তখন আমার প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছিল, সাহেবদের মতোই ব্যবহার করছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, 'শক্তের ভক্ত' সকলেই।

লোকে বলে, সাধুসঙ্গ সকলের সহ্য হয় না। আমারও কিন্তু ঠিক সেই অবস্থা। আমাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে শুনেছিলাম এবং অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও পড়েছিলাম, "ভারতভূমি পুণ্যভূমি, এখানে পাপীর স্থান নাই।" কিন্তু গঙ্গাযাত্রীদের দুঃখপূর্ণ কাহিনি শুনে সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সাধুসঙ্গ সহ্য হচ্ছিল না।

এর পরে উত্তর ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করার সময় অনেক সাধুর সঙ্গলাভ হয়েছিল, সর্বত্র একই কথা। দীর্ঘনিশ্বাস আর নিজের ভাগ্যকে গঞ্জনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে ও অনুভব করতে পারিনি। গয়ার নিকটবর্তী রামশিলা পাহাড়ের কাছে এক সাধুকে বলেছিলাম, "একটা পয়সার জন্য এত পরিশ্রম! অর্থাৎ কৃচ্ছ্র না-করে মজুরি করাই ভালো।"

পরেশনাথ থেকে বাগদার (Bagodar) পর্যন্ত রাস্তাটা বাস্তবিকই ভয়াবহ, কেবলই চড়াই। মাঝে মাঝে দু-এক জায়গায় উৎরাই রয়েছে, সেই উৎরাইগুলিতে বেশিক্ষণ সাইকেলে বসা চলে না। পথের দুইদিকে শালবন এবং ক্বচিৎ গ্রাম পাওয়া যায়, গ্রামের বাসিন্দা আদিবাসী। এদের ভাষা, স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তাতে মনে হয়, তাদের আচার-ব্যবহার এবং আমাদের আচার-ব্যবহারে পার্থক্য মোটেই নেই। অথচ নিজেদের আমরা কত বড় মনে করি।

**হাজারিবাগ**

বাগদার ডাকবাংলো বড়ই আরামের। চার্জ দুই টাকা, এখন বোধহয় বেড়েছে। চারদিকের পাহাড়ি দৃশ্যাবলি খুবই সুন্দর। রান্না করার জন্য একজন বাবুর্চিও ছিল। মোট চার টাকায় রাত কাটিয়ে পরের দিন হাজারিবাগের একটি বিহারি হোটেলে দৈনিক বারো আনা করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম।

এখানকার আবহাওয়া বড়ই সুন্দর— উপরন্তু সবজি, বন্যপাখি এবং মধু বেশ শস্তা। অনেক বাঙালি এখানে বাস করেন, অবশ্য তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ মোটেই হয়নি। শহরের মধ্যে একটি পাবলিক হলে কে বা কারা আমার কাহিনি শোনবার জন্য লেকচারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। ঘণ্টাখানেক লেকচার দিয়ে হোটেলে ফিরে এসেছিলাম এবং শুধু ভাবছিলাম, আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায়? হাজারিবাগে বসেই হাজারিবাগ সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখছিলাম।

হাজারিবাগে মাত্র একদিন ছিলাম, একদিনে কিছুই দেখা যায় না। পরের দিন আবার জি.টি. রোড ধরবার জন্য ফাঁড়ি পথে চলে বড়ই অসুবিধা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই পথ তৈরি হয়েছিল মিলিটারিদের ব্যবহারের জন্য; বোধ হয় ইউরোপিয়ান মিলিটারি সরে যাওয়ায় পথও 'কালো' হয়েছিল। বার বার সাইকেল থেকে নামতে হচ্ছিল। পথ ছিল একেবারে কুপথ। অতি কষ্টে জি.টি. রোডে এসেই পেলাম ডাকবাংলো। এই ডাকবাংলোর ভাড়া দৈনিক এক টাকা এবং বাবুর্চি না-থাকায় খরচ কমই লেগেছিল।

বাস্তবিকই আমাদের মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি খুব বেশি। কলকাতার বাবুসাহেবের শরীরের চামড়া এবং এদের শরীরের চামড়ায় বেশি পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ভাষায় আর 'সফেদ' কাপড়ে। কিন্তু এই পার্থক্যকে প্রকাণ্ড করে তোলা হয়েছে; নতুবা এই এলাকা জনগণের এলাকায় পরিণত করতে কতক্ষণ?

আমাদের মনস্তুষ্টির চিন্তাধারা এবং সামাজিক নিয়মই হয়েছে আমাদের এক নম্বর শত্রু। কলকাতায় দেখে এসেছিলাম বিপ্লবীরা আত্মগোপন করার স্থান পাচ্ছেন না, তাঁরাই যদি এদিকে এসে এদের সঙ্গে মিশে যেতেন তাহলে বিপ্লব ত্বরান্বিত হত এবং ব্রিটিশকে তাড়াতে বেশি বেগ পেতেও হত না; আমি তা-ই ভাবছিলাম আর পথ চলছিলাম। বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশেছিলাম বলেই এই ধরনের চিন্তা মনকে সব সময়েই চিন্তিত রাখত।

শোন্‌ডিরি পৌঁছনোর পূর্বে ঔরঙ্গাবাদ পর্যন্ত ভ্রমণ, আনন্দের অথবা দেখার মতো কিছুই ছিল না। ধরমশালায় রাত্রি যাপন এবং সুযোগমতো অশিক্ষিত ধনী অথবা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টেক্‌স্ আদায়ের মতো চাঁদা তুলে পথ চলা ছাড়া আর কিছুই করবার মতো ছিল না। আজ টেক্‌স্ বানান লিখতে যত কষ্ট পেতে হচ্ছে টেক্‌স্ আদায় করতে তেমন কষ্ট পেতে হত না। বর্তমানে অনেকেই 'ট্যাক্স' লিখতে আরম্ভ করেছেন, আমি কিন্তু সেরূপ লেখার পক্ষপাতী নই।

জোর-জবুর করে অশিক্ষিত ও শিক্ষিতদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় আমার দ্বারা সম্ভব হত, তার গোড়ায় ছিল তিনটি কারণ। প্রথম কারণ হল— আমার শরীরের মজবুত গঠন; দ্বিতীয় কারণ ছিল— মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া অনুপ্রেরণা; আর তৃতীয় কারণ— একজন জার্মান বলেছিলেন, "সব সময় মনে রাখবেন

এই পৃথিবীতে যত লোক আছে তারা সবাই আপনজন এবং World is yours।" এই তিনটি শক্তির উপর নির্ভর করে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

**গয়ার পথে**

গয়া যাবার সময় শেরঘাট নামক স্থানের কাছেই দুটো নদী পার হতে হয়েছিল। নদী পার হয়েছিলাম, বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম এবং কষ্টের অন্ত ছিল না, কিন্তু গয়া শহর যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিল একটিমাত্র আকর্ষণে।

সেখানে একজন পান্ডার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল ১৯১৩ সালে। তাঁর ছেলেরা আমাকে গয়ায় যেতে অনুরোধ করেছিলেন। পান্ডা বন্ধু প্রথম মহাযুদ্ধের পরই মারা গিয়েছিলেন; তাঁরই জায়গায় যাঁরা পান্ডা-কার্য সম্পন্ন করেছিলেন তাঁদের নিমন্ত্রণ অবহেলা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ আমার মন তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তবুও আকর্ষণ, তবুও স্মৃতিপটে ফল্গু নদী, নদীর অপর তীরের গ্রাম ক্রমাগত ভেসে আসছিল। গয়াতে মরলে নাকি অপর জন্মে গাধা হতে হয়! কিন্তু সে-ভয় আমার মোটেই ছিল না।

আমার মন থেকে ক্রমাগত অবতারবাদের অপসরণ হচ্ছিল। তার প্রথম কারণ, বৌদ্ধধর্মকে লোপ করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তার একটিমাত্র নিদর্শন লক্ষ্য ক'রে।

গয়া ও পাটনা জেলায় ভ্রমণ করার সময় প্রত্যেক দিন সকালবেলা এক দল লোক দেখতে পেতাম। তারা প্রত্যেকের বাড়িতে ভিক্ষা করার সময় সারেঙ্গি বাজিয়ে গান গাইত। গায়করা বৌদ্ধধর্মের নিন্দাসূচক গান গাইত, সঙ্গে শিব, পার্বতী, গণেশ, রাম-সীতা, হনুমানজি আর অজাতশত্রুর গুণাবলি গেয়ে ভিক্ষা চাইত।

যে-ভাষায় এরা গান গাইত সেই ভাষাকে ভোজপুরি অথবা গ্রাম্যভাষাও বলা যেতে পারে। গ্রাম্যভাষা মৈথিলি ভাষার অপভ্রংশ। বাস্তবিক মৈথিলি ভাষা পূর্ব-ভারতের অনেক ভাষারই মাতৃস্থানীয়। গায়করা প্রত্যেক বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অর্ধঘণ্টাব্যাপী গান গেয়ে এক মুঠো আটা বা চালের বেশি পেত না। এতে মনে হয়, পূর্বকালে এরা বৌদ্ধধর্মবিরোধী ধনী অথবা রাজাদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাহায্য পেত এবং পরবর্তীকালে এটা অভ্যাসগত ভিক্ষাবৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল। পরে ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করার সময় অবতারবাদের তাণ্ডব লীলার নিদর্শন দেখে নিজেদের এসব থেকে পৃথক করে নিয়েছিল।

গয়াতে যাবার সময় চব্বিশ মাইল পথ চলতে কী বিপত্তি হয়েছিল, তা-ই বলছি। ধীরে ধীরে পথ চলছিলাম, হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাতাস আসছিল বঙ্গোপসাগর থেকে, সেই বাতাস সাইকেলটাকে বাঁদিকে অবিরত ঠেলছিল, তাতে সুবিধাই হচ্ছিল। কল্পনাও করতে পারিনি যে বিহারে এমন অঝুম বৃষ্টি হয়!

মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। সড়কের দুপাশের মাটি-কাটার গর্তগুলি ভরে গেল। প্রবল স্রোত বইতে আরম্ভ করল। ভাবছিলাম, মাছের দেখা পাব কিন্তু কিছুরই দেখা পেলাম না। চপ্-চপ্, ভস্-ভস্ শব্দ করে সাইকেল চালাতে আরম্ভ করলাম। পাশের গ্রামগুলি দেখতে একটি বৃহদাকার স্তূপ মনে হচ্ছিল। পথে একটিও লোক ছিল না।

এদিকে মোটর-ট্রাক বেশ চলাচল করে, কিন্তু প্রত্যেকটি থামিয়ে ত্রিপলে ঢাকা দিয়ে ড্রাইভার ও তার সহকারীরা বসে ছিল। বৃষ্টিকে এরা মৃত্যুর মতো ভয় করে অথচ আমি আরাম করে পথ চলছিলাম দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করছিল, "বাঙালি ভূতটা কেমন চলছে!"

আমি যে বাঙালি, কপালে তা লেখা ছিল না। মনে হয়, এদের মতে বাঙালিরাই আজেবাজে কাজ করে অথচ দুঃসাহসিক কাজেও আত্মনিয়োগ করে, সেজন্যই আমাকে বাঙালি ভূত বলতে দ্বিধা করেনি।

**গয়া**

বিকেলে গয়াতে পৌঁছে একটি ধরমশালায় স্থান নিতে যাচ্ছি এমন সময় বেন্ডো হোটেলের মালিক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি দৈনিক বারো আনা করে খাওয়া-থাকার জন্য নেবেন এই বলে ধরমশালা থেকে তাঁর হোটেলে আমাকে নিয়ে গেলেন। 'বন্দ্যোপাধ্যায়' শব্দকে ইংরেজি ফ্যাশনে 'বেন্ডো' করা হয়েছিল।

ভাগলপুরের বাসিন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই উদার। তাঁর কাছে জাত-বেজাত ছিল না। যে-কোনো ধর্মের লোক তাঁর হোটেলে থাকতে পারত। সেজন্য মুসলমানরা তাঁরই হোটেলে আসত বেশি করে। খাদ্যের উপাদান থেকে সব রকমের মাংস বাদ দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে সমস্ত বিপদের গোড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আঘাত করেছিলেন। বাঙালি ধরনে মাছ রান্না করে হিন্দুস্থানিদের দেওয়া হত না। তাদের জন্য পৃথক করে পেঁয়াজের ও লঙ্কার

প্রাচুর্য বজায় রেখে রান্না করা হত।

পরদিন সকালে রোদ উঠল। ডানা ঝাড়া দিয়ে সকলেই ঘর থেকে বের হল। আমি গয়ালি পান্ডার বাড়িতে গেলাম। যাত্রী না-থাকায় পান্ডা আমাকে ঘরানা মতে গ্রহণ করলেন। বেশ আরামের সঙ্গে কথা আরম্ভ হল। পান্ডার ছেলে উদার ও শিক্ষিত। বিদেশের কথাই বেশি বলা-কওয়া হয়েছিল, সেইসঙ্গে আমাদের দেশের স্বাধীনতা কী করে পাওয়া যাবে তা-ও আলোচনা হয়েছিল।

পান্ডার ভাই দুইবার জেলে গিয়েছিলেন। তৃতীয়বার জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়েছিলাম, তাঁকে বলেছিলাম, "জেলে গিয়ে নাম করা যায় কিন্তু সাধারণের উপকার হয় না। বাইরে থাকুন এবং বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোন।

"১৯৪২ সালে আপনাদেরই স্বদেশীয় ভায়েরা— গয়ালি পান্ডারা যে-বিপ্লব করেছিলেন তার তুলনা কমই দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল, নিরক্ষর, নিরস্ত্র কৃষক কেমন বিপ্লব করতে পারে! চট্টগ্রামের বিপ্লব এক সপ্তাহ ছিল আর কৃষক-বিপ্লব যা বিহারে হয়েছিল, তা চলেছিল মাসের পর মাস!"

"বেশ ভালো কথা, এখন আমাদের চিনের বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু বলুন।" এই অনুরোধ একজন বাঙালি করেছিলেন।

উত্তর দিয়েছিলাম হিন্দুস্থানিতে। সকলে শুনেছিল। যা বলেছিলাম তার প্রতিধ্বনি ১৯৪২ সালে বিছানায় শুয়ে সংবাদপত্রে পড়েছিলাম। গর্ব অনুভব করেছিলাম সেদিন। হাজারো প্রপাগ্যান্ডিস্ট যা করতে পারেনি, এক ঘণ্টার কাহিনিতে তা-ই হয়েছিল। এখানেই পর্যটক-জীবনের সার্থকতা।

বিপ্লব ব্যর্থ হলে তার প্রতিক্রিয়া হয়। সেই প্রতিক্রিয়া সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য প্রকারে দেখা দেয়। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাই তার প্রমাণ।

গয়ালি পান্ডা কখনো দান করেন না, দান গ্রহণ করেন। আমার এক ঘণ্টা কথা বলার জন্য একজন পান্ডা কুড়ি টাকা দিয়েছিলেন। অবাক হয়েছিলাম তাঁকে মুক্তহস্ত দেখে। যে-পান্ডা দু-আনা পয়সার জন্য 'সফল' প্রার্থীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখে, সেই পান্ডা কুড়ি টাকা ফেলে দিল আমার খোলা হ্যাটের মধ্যে! কম কথা নয়!

বিপ্লবের গন্ধও মাতোয়ালা। আনন্দ ও আত্মাহুতি একই সঙ্গে এনে দেয়। বিপ্লবী প্রতিদানপ্রার্থী হয় না, বিপ্লবীর শেষ দান আত্মাহুতি। কত লোক প্রাণ দিয়েছিল ১৯৪২ সালে, তাদের সকলের নাম-ধাম কি কেউ জানেন অথবা শুনেছেন? তাদের কথা আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু ১৯৩৪ সালের জুন মাসের কথার প্রতিধ্বনি ১৯৪২ সালে হতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। শুনতে পেরেছিলাম, জনৈক ভারতীয় পল্টনি অফিসার রেলের কুলিকে যেভাবে হত্যা করেছিল, সেরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড সিপাই-বিদ্রোহের সময় বিদেশী ব্রিটিশরা পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়নি।

মানসিক দৈন্য না-থাকলে বোধহয় আমি আর কিছু হতাম। সেদিন বুদ্ধগয়া দেখে বেন্ডো হোটেলে ফেরবার পথে শুধু সে-কথাই আমার মনে হচ্ছিল।

প্রথম কথা হল, এসব দেখে কী লাভ? অতীতের ঐশ্বর্য দেখে বিদ্রোহের টেকনিক আয়ত্ত করা যায় না, তবে কেন চার মাইল বাইক করে আবার ফিরে আসা? সেখানে থেকে সেখানকার লোককে বিপ্লবে উদ্‌বুদ্ধ করা কি লাভ ছিল না? মনে হচ্ছিল, দেশ দেখার লোভ বুঝি সব রকম উচ্চ মনোবৃত্তি নষ্ট করে দেয়!

পাশেই একটা আখড়া। গুন্ডাদের আড্ডা বলেই মনে হয়েছিল; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম, আমার ধারণা ঠিক নয়। এটা সাধু-সন্ন্যাসীদের আড্ডা। বুদ্ধগয়া থেকে ফেরবার পথে বাঁদিকে পড়ে। একজন সাধু আমাকে বললেন, "তোমরা যাকে বুদ্ধগয়া বলছ সেটা কিন্তু তা নয়; দশজন অবতার ছিলেন, সেই দশজনের মধ্যে নবম অবতারের স্থান ছিল এটি। তোমরা যাকে বুদ্ধ বলে আত্মহারা হও, সেই লোকটা ছিল নাস্তিক, সেজন্যই ভারতে তার স্থান হয়নি। যত বেটা নাস্তিক, তারা সব পালিয়েছিল চীন দেশে। আমরাই হলাম আসল বুদ্ধের শিষ্য।"

এদের ভোগ-বিলাস দেখে বাস্তবিকই হিংসা হয়েছিল। কতকগুলি যুবক সন্ন্যাসী চিনি মিশিয়ে ছানা খাচ্ছিল। কতকগুলি বয়স্ক সন্ন্যাসী খাচ্ছিল দুধ। তাদের বিছানা, চালচলন, দৈনন্দিন কাজ কিছুটা দেখেই রাগ হয়েছিল। যে-সাধু আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের মতে যে-দশজন অবতার হয়েছেন, তাঁদের নাম কী সাধু বাবাজি!"

"তাও জানো না! শোনো বলছি।" বলেই আরম্ভ করলেন কাহিনি। কাহিনি বলা দশ মিনিটে শেষ হয় না দেখে বললাম, "এসব কাহিনি শোনবার সময় নেই— দশজন অবতারের নাম বললেই ভালো হয়।"

তখন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "মৎস্য", তারপরই

মৎস্য-অবতারের পুরাণ আরম্ভ হয়ে গেল। আমার আর ধৈর্য থাকল না। আমিই বললাম, "মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ এই হলেন নয়জন। কল্কি আসবেন আমিও স্বীকার করি, কিন্তু মনে রাখবেন সাধু মহাশয়, যিনি এতগুলি অবতার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আপনাদের মতো মোষের দুধ খেতেন না। আমার সময় নেই, তবু বলছি, শুনে রাখুন, এসব হল সৃষ্টিতত্ত্বের কথা। এর বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে।"

আমি যখন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিতে যাচ্ছিলাম তখন লক্ষ করলাম, সাধুর যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে তিনি সেখানেই আমাকে খতম করতেন। সুখের বিষয়, তা অন্তত সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এদিক দিয়ে ব্রিটিশের জয়গান গাইতেই হবে। তখন খুনি আর খুন হয়েছে শুনলে যে-কোনো মানুষ কেঁপে উঠত এবং খুনি আর খুন থেকে দশ হাত দূরে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করত।

মানুষমাত্রেরই মানসিক দুর্বলতা থাকে। সাধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একেবারে চলে এলাম বিষ্ণুপাদপদ্মে। দেখছিলাম সেই পাথরটা, যার উপর আমিও ১৯১৩ সালে যবের পিণ্ডী চড়িয়েছিলাম পিতার মুক্তির জন্য, তারপর ১৯২৯ সালে পিণ্ড দিয়েছিলাম আমার ভাইপোর মুক্তির জন্য— সেই পাথর আর সেই ঘণ্টা, যে-ঘণ্টায় মহারানি ভিক্টোরিয়ার নাম খোদাই করা রয়েছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বেশ আরাম পেয়েছিলাম, তারপর বেন্ডো হোটেলে এসে আর এক বিপদের সম্মুখীন হতে হল।

কোথা থেকে এক বখাটে যুবক গত কয়েকদিন ধরে বেন্ডো হোটেলে স্থান নিয়েছিল। প্রথম কয়েকদিন দৈনিক খরচ দিয়ে যাচ্ছিল, গত দুই দিন কিছুই দেয়নি। বেন্ডো হোটেলের ব্যানার্জি মহাশয় হোটেল-মেম্বারদের হাতেই এর বিচারের ভার ছেড়ে দেন।

আমিও একজন সভ্য। আমার ফিরে আসার জন্য সকলেই অপেক্ষা করছিল। আসামাত্রই আর্জি পেশ হয়ে গেল। আমি বললাম, "যতদিন এখানে থাকব, ততদিন এই বখাটে যুবকেরও খরচ জুগিয়ে যাব।"

আগুনে বর্ষণ হওয়ায় আগুন নিভে গেল। দেখলাম যুবকের মানসিক পরিবর্তন। সে কিছুই বলল না, এমন-কি আমাকে ধন্যবাদও দিল না। যুবক খায় ডাল রুটি আর সবজি। দু-বেলায় বারো আনার বেশি লাগত না, তবে সে পান খেত। প্রত্যেকটা পানের দাম এক আনা। দৈনিক কুড়িটা পান খেত।

হিসাব না-করেই তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললাম, "বন্ধু, কিছু মনে কোরো না, এই টাকা আমার উপার্জিত নয়, ভিক্ষালব্ধ। দরিদ্রই দরিদ্রের দুঃখ অনুভব করে, তোমার কষ্ট আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।" এর পরে আর কথা হল না।

বেলা তখন তিনটে, 'লু' হাওয়া বইছিল। ফল্গু নদীর অপর তীরে একটি মসজিদ দেখব মনে করে পায়ে হেঁটে চললাম। ভয়ানক গরম, তার উপর নদীর বালি উত্তপ্ত। যখনই তৃষ্ণা পাচ্ছিল তখনই বালি সরিয়ে জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করছিলাম, আর মনে মনে ফল্গু নদীকে প্রণতি জানিয়ে বলেছিলাম, "বিহারের মহিমা তুমি! এদেশের মানুষ মুখে বড়ই রুক্ষ কিন্তু তাদের অন্তরে ফল্গু বয়ে যায়। অন্তর তাদের শুষ্ক নয়, একেবারে ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলা!"

মসজিদের কোনো বিশেষত্ব ছিল না, বিশেষত্ব ছিল স্থানীয় লোকের ভাষায়। বিহারি মুসলমান মাত্রেই পূর্বে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, এই তথ্য বের করতে সময়ের দরকার হয় না। এদের কথ্য ভাষা পুরোপুরি না-হোক মাগধি ভাষার খুব কাছাকাছি। হিন্দি অথবা উর্দু ভাষার প্রভাব অতি অল্পই স্পর্শ করতে পেরেছে। এদের কথা শোনবার জন্যই এত কষ্ট করেছি জেনে একজন ইমাম শ্রেণির লোক বলল, "বাবু, আমরা উর্দু বলি, উর্দুই আমাদের মাতৃভাষা।"

পর্যটক যদি মিথ্যা বলে, তাহলে সে পর্যটক হতে পারে না। স্পষ্ট করে বললাম, "এটা তোমাদের হিন্দু-বিদ্বেষ থেকে বলছ। তোমাদের উপর অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে, মাতৃভাষা এখনও পরিত্যাগ করতে পারোনি, এবং শত চেষ্টাতেও মাতৃভাষা পরিত্যাগ করতে পারবে না।"

এই অঞ্চলে তখন মুসলিম লিগের প্রভাব খুবই ছিল। সকলেই চেষ্টা করতে চাইছিল যাতে রাতারাতি ভিন্ন জাতে পরিণত হতে পারে। এটাও হিন্দু-বিদ্বেষের পরিণাম। আমার মনে আছে, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ স্টেশনে জলের জন্য কী বিপদে পড়েছিলাম! হাতে মগ দেখে "হিন্দু পানি" জল দেয়নি; তারপর গিয়েছিলাম "মুসলমান পানি"র কাছে। "মুসলমান পানি" জিজ্ঞাসা করেছিল আমি হিন্দু কি মুসলমান। যখন শুনল আমি হিন্দু তখন সেও জল না-দেওয়ায় অবশেষে যেতে হয়েছিল জলের কলে। জলের কল জল ছেড়ে দিয়েছিল, সে জিজ্ঞাসা করেনি আমি হিন্দু কি মুসলমান। তাই জল খেয়ে প্রাণ বাঁচে!

তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের দেশের অবতারবাদ মানুষের সঙ্গে কতটুকু শত্রুতা করছে!

পূর্বোক্ত যুবক নিরাপদে দিন কাটাচ্ছিল। তার অর্থের অভাব ছিল না! দুইদিন চলে যাওয়ার পর তৃতীয় দিন দুপুরে একজন লোক এল এবং যুবককে বাড়িতে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করল।

যুবক কী বলেছিল জানি না। যে-লোকটি যুবককে নিতে এসেছিল, সে মাটিতে মাথা রেখে আমাকে প্রণাম করল এবং আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বলল, "আপনার কাছ থেকে আমাদের বাবু এই টাকা কর্জ করেছিলেন, তাই ফেরত দিচ্ছি।"

লোকটাকে কিছু না-বলে পাঁচ টাকার নোটখানা হাতে নিয়ে বাকি টাকা ফেরত দিয়ে একটুও বিলম্ব না-করে হোটেলের পাওনা পরিশোধ করে ভারত-সেবাশ্রমে চলে গেলাম। ধনীর ধন দেখে ভয় হয়েছিল। পর্যটকের পক্ষে লোভ এড়ানো সবচেয়ে বড় উপাসনা। বিদায়ের সময় যুবকের সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছা হয়নি, সে পান কিনতে গিয়েছিল।

বৈষ্ণব মঠের বাবাজিরাও এক গোছের বিপ্লবী। গয়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে যারা পিণ্ড দান করতে এসে 'সফলে'র জন্য গয়ালি পান্ডার পায়ে ধরে বসে থাকে অথচ পান্ডা আরো টাকা আদায় করার জন্য মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে, সেই পান্ডাদের শায়েস্তা করার জন্য বৈষ্ণব মঠের সাধুরা রোজ রোজ 'প্রিচ' করেন এবং বলেন, 'শুধু পিণ্ডদানেই পূর্বপুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।'

রাত্রি দশটা পর্যন্ত গয়ালি পান্ডাদের পিণ্ডী চটকানোর পর বৈষ্ণব মঠের সাধুরা আমাকে ঘুমোতে দিলেন। ঘুমোবার পূর্বে বলে রাখলাম, "রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই চলে যাব; অতএব ঘটিবাটি চুরি করে পালিয়েছি অপবাদ দেবেন না। যদি অপবাদ দেন তবে আপনাদেরই বদনাম হবে। আমি বাঙালি, আপনারাও বাঙালি, এ-কথাটা মনে রাখবেন।"

তখনকার দিনে পশ্চিমের বাঙালিরা বাঙালিকে ঘরে স্থান দিত না। বলত, "সুবে বাংলার লোক চোর হয়, দিনে খায়দায় থাকে, রাত্রে যা পায় তা-ই নিয়ে পালায়।"

আসল কথা হচ্ছে অন্য কিছু, যাকে বলা হয় পুলিশের ঠেলা। বাঙালির বাড়িতে নতুন বাঙালি গেলেই পুলিশ আসত। একবার-দু'বার পুলিশ এলে কষ্টও হয় না, দুঃখও হয় না, এ যেন দশ ধারার আসামি! মাসের পর মাস আসবেই। এতেও কিছু আসে যায় না। খইনি দেওয়া চাই, তারপর যদি বাবু-সাহেব অথবা খান-সাহেবের মুখ থেকে 'হে শালা বাঙালি' উচ্চারিত হবার পর সেই কথাকে মধুর বচনরূপে গ্রহণ না-করা হয় তাহলে তো একেবারে 'দপ্তরে খাস' পাটনা থেকে হুকুম যায় গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে!

বৈষ্ণব মঠের সাধুরা আমার ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত না-হয়ে, মুখ না-খুলে শুধু ঠোঁটের সাহায্যে হেসে বলেছিলেন, "আমাদের কিছু চুরি যায় না, আমরা ঘুম থেকে উঠি সকলের আগে।"

বাস্তবিকই তা-ই, রাতের অন্ধকার তখনও ছিল। সবেমাত্র সাইকেলটা বাইরে এনেছি, এমন সময় এক যুবক সাধু আমার হাতে কয়েকখানা রুটি এবং একটি গয়ালি পেড়া দিয়ে বললেন, "আশীর্বাদ করি।"

আশীর্বাদের খাদ্য গ্রহণ করলাম এবং সাইকেল-বাক্সে রেখে দিয়ে বললাম, "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।"

বাস্তবিক এঁরা অত্যধিক পরিশ্রম করেন। চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়া কি কম কষ্ট?

পাটনার পথে বেরিয়েই এক নতুন দৃশ্য দেখতে পেলাম। একদল লোক চলেছে লোটা নিয়ে। বড় রাস্তার কাছে নদী নেই, এরা স্নান করবে কোথায়?

এরা কী করে না-করে, দেখবার মতো সময় ছিল না। প্রবল ইচ্ছা, সেদিনই যেন পাটনায় পৌঁছই! ইচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব হয়, ফাঁড়ি-পথে পাটনায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়েছিল। পথে গ্রামের লোকের আর্থিক ও নৈতিক দুরবস্থা দেখে খুবই দুঃখ হয়েছিল।

**পাটনা**

পাটনায় পৌঁছে পিন্টো হোটেলের সামনে সাইকেল রেখে সাহেবি হোটেলে চা খেতে ঢুকলাম। এ একটা কম কথা নয়, মস্ত বড় কথা। এখানে আসতেন যত বড় বড় লোক অর্থাৎ রায়বাহাদুর ও তাঁদেরও upwards লোক। দারোগাবাবুর মতো আমাকে দেখাত। বোধহয় সেই কারণেই একটি লোক এসেই বলল, "হুকুম হুজুর!"

ইজ্জত রাখতে হবে, বললাম, "চা আউর কেইরাস্ লাগাও।"

এটা হল সাহেবি হিন্দুস্থানি। সাহেবরা প্যান্ট 'লাগায়'। আউর 'লাগায়' খাকি শার্ট। আমারও তা-ই ছিল, আরো একটা জিনিস ছিল যাকে বলা হয় 'রুপেয়া'। চা খেয়ে একটা মহারানি মার্কা টাকা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আসবার সময় মোগল অথবা পাঠান সম্রাটদের পোশাকে আবৃত একটা লোক ইয়া লম্বা 'সেলাম হুজুর' বলায় বুকের ছাতি যেন ছয় হাত চওড়া হয়ে গেল! বেঁচে

থাক আমার হাফপ্যান্ট আর খাকি শার্ট!

বাইরে এসেই দেখতে পেলাম, একদল লোক আমার সাইকেলটা হাঁ করে দেখছে। কে সাইকেলটা চালাচ্ছে তার খবর নেবার কারো উৎসাহ নেই। সাইকেলটা যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন একজন জিজ্ঞাসা করল, "What make cycle?"

বাংলায় বললাম, "আমার বাবার।"

একটু এগিয়ে যাবার পর পেছন থেকে একজন যুবক আমাকে ডাকল। সাইকেল থেকে নামলাম। যুবক জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"আরে ভাই, কোথায় আর যাব? দেখি যদি কোনো ধরমশালায় যেতে পারি।"

যুবক বলল, তার নাম মণীন্দ্র সমাদ্দার, এখানকার বাসিন্দা, যদি ইচ্ছা করি তাহলে একটি বাঙালি হোটেলে নিয়ে যেতে পারে।

"ধন্যবাদ দাদা, নিয়ে চলুন, ভয়ের কারণ নেই; অন্তত সপ্তাহ খানেক খরচ চালাতে পারব।" হোটেলে গিয়ে শুনলাম, হোটেলের নাম 'হোটেলে বাঙ্গালী।'

নামটা একেবারে পার্শি, ব্যাকরণে ভুল নেই। দৈনিক বারো আনা চার্জ। হোটেল যেমন-তেমন কিন্তু মণীন্দ্র সমাদ্দারের ব্যবহার দেখে আনন্দ হয়েছিল। তিনি আমাকে টাকা দেননি, কথার মধ্যেও তেমন কিছু ছিল না; কিন্তু এই-যে হোটেল দেখিয়ে দেওয়া, তাতে কত আন্তরিকতা, কত মমতা, সকলে বুঝবে না; যাঁরা পূর্বদেশ ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা বুঝবেন। মণি সমাদ্দার যদি বলতেন, "চলুন আমার বাড়ি" তাহলে আজ আমার ডায়েরিতে তাঁর নাম উঠত না।

সারাদিন অত্যধিক পরিশ্রম করায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠেই গেলাম গঙ্গা দর্শনে। অগণিত লোক পাপক্ষয়ার্থ মা ভাগীরথীর জলে "সিয়ারাম, জয় সিয়ারাম, রাধেশ্যাম" ইত্যাদি নামোচ্চারণ করে কানে আঙুল ঢুকিয়ে ডুব দিচ্ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। তিনি বোধহয় সাঁতার জানতেন না, কিন্তু এঁরা সবাই সাঁতারে সক্ষম ও চতুর। শুধু কয়েকজন নারী ইয়া মোটা রুপার তাগা, বালা হাতে এবং পায়ে খারু দিয়ে যখন নামতেন তখন মনে হত, মা গঙ্গা বোধহয় এদের সবাইকে নিজের কোলে টেনে নেবেন! সুখের বিষয়, সেদিন কেউ ডুবে মরেননি।

কতকগুলি কথা স্মরণ করে নারী-জাতের প্রতি শ্রদ্ধা যা ছিল তার শতগুণ বৃদ্ধি হয়েছিল যদি বলি তবে কম হবে, কোটি গুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং সেইসঙ্গে মনে হয়েছিল তাঁদের স্বাধীনতার কথা।

দ্বিপ্রহরে আবার এলেন সেই মণি সমাদ্দার। হাসিমুখে বললেন, "আসুন বি. এম. কলেজে যাবেন, সেখানে কিছু বলবেন, সকলে শুনবে।"

আমি তো অবাক! একেই বলে ভদ্রলোকের অতিথি হওয়া।

গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ সেন মহাশয়, ষোড়শী হালদার মহাশয় এবং আরো অন্যান্য ভদ্রলোক আমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন। এতটা সম্মান সহ্য করার ক্ষমতা আমার তখনও হয়নি। মনটাকে সবল করে একদিকে বসে পড়লাম। আরো প্রশংসা হল। ভাষার ফোয়ারা! আমি অবাক হলাম। তারপর আমার পালা। বলতে আরম্ভ করলাম তো শেষ হয় না, অবশেষে মুখটা যখন শুকিয়ে গেল তখন বসে পড়লাম।

বিপ্লবীদের কথা মোটেই বললাম না। বিপ্লবী ভারতীয় হোক, রুশ হোক বা চিনা হোক, সকলের মনোবৃত্তি একই রকমের। Disrupter (ভন্ডুলকারী) শ্রেণির লোক তখন এশিয়া মহাদেশে (Excluding Russia) জন্মগ্রহণ করেনি, তখন ছিল স্পাই। স্পাই রাখত ব্রিটিশ এবং ফরাসি। আমেরিকা ও ব্রিটেন তখন ল্যাটিন আমেরিকাতে Disrupter সৃষ্টি করছিল এবং প্রেমসে কার্যসিদ্ধি করে যাচ্ছিল। ব্রিটিশও ল্যাটিন আমেরিকায় আমেরিকানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছিল, তাতে আমাদের বেশ লাভ হচ্ছিল। আমেরিকান মাত্রেই ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল। এই ধরনের উচ্চ রাজনীতি (তখনকার দিনের পক্ষে) একটুও না-বলে মামুলি কথায় সকলকে সন্তুষ্ট করতে হচ্ছিল। ভয়ও ছিল, কী জানি যদি পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যায়!

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বাঙালি চাকরি করেন। কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। একজন ভদ্রলোক একেবারে একটানা কথা বললেন, "আমরা হলাম জার্মানির প্রাশিয়ান, অর্থাৎ শাসকের সমাজ।"

কয়েকদিন পূর্বেও পথের পাশে এক বাঙালি পরিবার দেখে এসেছিলাম। উপাধিতে ঘোষ। আত্মরক্ষার্থ নিজের হাতে কাপড় বেচে দিনান্তের চাল সংগ্রহ করেন। তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম, কিন্তু বাঙালি কেরানিবাবুদের বেয়াদবি সহ্য করতে না-পেরে উত্তরে যা বলেছিলাম, মণিবাবু স্বকর্ণে তা শুনেছিলেন। ক্ষুদিরাম আর মিরজাফর উভয়েই বাঙালি, কিন্তু পার্থক্য অনেক।

দুঃখের সঙ্গে বলছি, কলকাতায় ব্রিটিশরা রাজধানী স্থাপন করায় আমাদের জাতের একদিকে যেমন উন্নতি হয়েছিল তেমনই অবনতিও ঘটেছিল অনেক। চাকুরে মহলে আত্মম্ভরিতা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল। যে যা নয়, সে তারই মিথ্যা কল্পনা করে আত্মপ্রশংসা করত। এর পরিণাম বর্তমানে আমরা কিছুটা অনুভব করছি, ভবিষ্যতে তারই খেসারত আরো দিতে হবে।

প্রাশিয়ানদের এলাকা পরিত্যাগ করার জন্য প্রাণটা আইঢাই করছিল, শুধু মণিবাবু আমাকে পাটনায় থাকতে বাধ্য করেছিলেন। কারণ তাঁরই অনুকম্পায় অনেক ঐতিহাসিক স্থান ও তথ্য অবগত হয়ে আমি মনকে তৃপ্ত করেছিলাম। কয়েক মাস পূর্বে উত্তর বিহারে ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে পণ্ডিত জওহরলাল কোদাল কাঁধে নিয়ে যখন পথ চলছিলেন তখন একজন ব্রিটিশ স্পাই তাঁর হাতে একটি পিস্তল দিয়ে বলেছিল, "এর দ্বারা অনেক কাজ করতে পারবেন।" সেখানেও তিনি লেকচারই দিয়েছিলেন, মঞ্চ থেকে নেমে পিস্তলদাতার সন্ধান পাননি, অবশ্য তিনি পিস্তল গ্রহণও করেননি।

কে এই দুষ্কর্ম করেছিল, কেন করেছিল, এই নিয়ে মণিবাবু আমাকে অনেক তথ্য জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ইউরোপে গিয়ে যেন ভারতীয়দের মধ্যে নকল ও আসল বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করি। ব্রিটিশ পলিসি অনুযায়ী একজন আসল বিপ্লবীর পেছনে দশজন নকল বিপ্লবী (যারা স্পাই-এর কাজ করত) লাগিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি; কারণ নকল বিপ্লবীদেরও ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই কথা বলতে হত। তাতে বিদেশের লোক আমাদের দুরবস্থার কথাই বেশি করে অনুভব করত। বার্লিনে গিয়ে শুনেছি, অনেক নকল বিপ্লবী পিএইচ.ডি. নামক সাধারণ ডিগ্রি আয়ত্ত করেছিল অথচ তারা জার্মান ভাষাও ভালো করে আয়ত্ত করতে পারেনি।

মণিবাবু পাটনার লোক। তাঁর সংবাদ সংগ্রহ করবার আগ্রহ দেখে বলেছিলাম, কলেজ ছেড়ে দিয়ে তাঁর পক্ষে সাংবাদিক হওয়াই ভালো। মণিবাবু পরে সাংবাদিক হয়েছিলেন।

পাটনা থেকে পুনরায় গয়াতে ফিরে আসবার পথে দেখলাম, একটি লোক আমার পেছনে চলেছে। লোকটি জার্মান দেশের 'প্রাশিয়ান।' সাবাস ভাই! প্রাশিয়ানরা কখনো পেছনে চলে না, আগে চলা তাদের অভ্যাস। কী আর করি, একটু অপেক্ষা করে লোকটাকে ডাকলাম।

সে এল এবং নমস্কার করল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার সঙ্গ নেবার কারণ কী?"

সে দম্ভের সঙ্গে বলল, "Order is order and that must be carried out."

শাবাশ রাজভক্তি! প্রাশিয়ানরা রাজভক্ত হয় না। অবশ্য কথাটা একে বলিনি। মনের কথা মনেই ছিল, আমি শুধু রামপ্রসাদের একটা গানের শেষ পদ গাইছিলাম, "দিবি পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা, তবু মা বলে আর কোলে যাব না।" রামপ্রসাদী সুর বিদেশ থেকে আসেনি, এসেছিল রামপ্রসাদের গলা থেকে বাঙালিকে বাঙালি করে রাখতে।

কেন গাইছিলাম এখন আর সে-কথা মনে নেই।

গয়া ও পাটনা দেখা হয়েছে, এবার দেখতে হবে কাশীধাম। লোকে বলে কাশীধাম, তাই আমিও বলছি।

**কাশীধামের পথে**

কাশীধামে অনেকবার গিয়েছিলাম, এবার বোধহয় পঞ্চমবার। অন্যান্য সময় রেলগাড়িতে চেপে গিয়েছি, এবার বাইসাইকেলে। অন্যান্য সময় কাশীতে পুণ্য অর্জনের জন্য গিয়েছি, এবার জ্ঞান অর্জনের জন্য; অতএব লক্ষ্যবস্তুর পার্থক্য আকাশ ও পাতাল।

গয়া থেকে রওনা হয়ে কয়েকদিন গ্রামে এবং ছোট ছোট শহরে অবস্থান করে এমন কিছু দেখতে পাইনি যার উল্লেখ করা যেতে পারে; কিন্তু ছুঁতমার্গের প্রখরতা এবং তারই ফলে সাধারণ মানুষের মানসিক অবনতি দেখতে হয়েছিল। বিদেশীর পক্ষে অথবা যাঁরা বিদেশে কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছেন তাঁদের পক্ষেও এই বর্বরতা অসহনীয়। জল চাইলে জল দেবে বটে কিন্তু তখন আর জল-পিপাসা থাকে না।

চলার পথে একদিন জল ফুরিয়ে গেল। পথের পাশে একটি কুয়ো থেকে কয়েকজন স্ত্রীলোক জল তুলছিল, একটু দূরে একজন হিন্দুস্থানি মুসলমান খাটিয়ার উপরে বসে হুঁকো টানছিলেন আর মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। আশেপাশে অন্য পুরুষ লোক না-দেখে তাঁরই কাছে জল চাইলাম।

লোকটি বড়ই ভদ্র। তিনি বললেন, "আমার কাছ থেকে জল পেতে হলে ঘরে যেতে হবে। এদের কাছে জল চেয়ে দেখুন; কিছু মনে করবেন না, আমি এদেরই গ্রামবাসী।"

একজন স্ত্রীলোকের কাছে জল চাইতেই স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুম্ কোন্ হো?"

আমি বললাম, "বাঙ্গালি হ্যায়।"

স্ত্রীলোকটি একটু চিন্তা করে বললেন, "নজদিক নেহি, হটকে

খাড়া রও।"

তা-ই করলাম। কতক্ষণ পর এক কলস জল এনে মহিলা বললেন, "পানি লাও।" আমি আমার কেতলি এগিয়ে দিলাম।

কেতলি জলে ভরতি হবার পর কেতলিটা মাটিতে পড়ে গিয়ে কিছুটা জল ছিটকে মহিলার পায়ে পড়ে। অমনি মহিলা চিৎকার করে উঠে নিকটস্থ মুসলিম হিন্দুস্থানিকে ডেকে বললেন, "ভাইয়া ও ভাইয়া, বাঙ্গালিকা পানি গোড়্ লাগ গিয়া, জাত চলা গিয়া।"

মুসলিম ভদ্রলোকটি তাঁদের ভাষায় স্ত্রীলোককে বললেন, "কিছু হয়নি, লোকটা হিন্দু, তুমি পা ধুয়ে ফেলো আর কলসির জল কুয়োর কাছে ফেলো না।"

কতটুকু ঘৃণা হলে যে মানুষের মনে এরূপ প্রবৃত্তি জাগতে পারে, সে-ধারণা করাও কঠিন ব্যাপার। এইরকম ব্যবহার দক্ষিণ আফ্রিকায় অথবা আমেরিকার দক্ষিণের স্টেটগুলিতে আমেরিকানরা নিগ্রোদের সঙ্গেও করে না।

তারপর বেলা দুটোর সময় যখন মোগলসরাই-এ পৌঁছলাম, তখন ইচ্ছা হল একটু বিশ্রাম করি। কাছেই একটি জৈন ধরমশালায় যাওয়ামাত্র একজন দারোয়ান বলল, "আসুন বাবুজি, বিশ্রাম করুন।" তারপর একখানা চারপাই দেখিয়ে দিয়ে বলল, "এটাতে বসে বিশ্রাম করুন।"

চারপাই-এর উপর বসলাম। আমার পরনে হাফপ্যান্ট এবং নীচে আন্ডারওয়ারও ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কতকগুলি ছারপোকা আমার শরীর বেয়ে উঠে ঘাড়ে কামড়াতে আরম্ভ করে। আমি তৎক্ষণাৎ ছারপোকাগুলি মেরে ফেললাম। তাই দেখে দারোয়ান চিৎকার করে উঠল। চিৎকারের রকম দেখে আমি ভীত হলাম। নিশ্চয়ই দারোয়ানের ছেলে মরেছে, নয়তো তার স্ত্রী অথবা মা গঙ্গায় ডুবেছে! কিন্তু তা নয়। ছারপোকা মেরে ফেলেছি দেখে তার এই ভয়ানক চিৎকার!

কী জানি কেন, আমার মন খুবই শান্ত ছিল। ধীরে-সুস্থিরে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই-যে চারপাইগুলি রয়েছে, তার প্রত্যেকটাই কি ছারপোকায় ভরতি?"

সে বললে, "তুম খুব ধীরে বাত করতা হায়, বাকি তুম্ শালা বড় বদমাস্। তুম্ জীবহত্যা কিয়া।"

আর সহ্য করতে না-পেরে লোকটাকে একটা চড় লাগিয়ে দিয়ে যে-চারপাইটাতে বসে ছিলাম তাতে আগুন লাগিয়ে দিলাম। চারপাইটার রশিগুলি বেশ করে জ্বলতে আরম্ভ করল। সুখের বিষয় পাশের লোক কেউ দারোয়ানকে সাহায্য করতে আসেনি। সকলেরই ধারণা, আমি দারোগা সাহেব; কারণ আমার পরনে খাকি প্যান্ট আর খাকি শার্ট।

ধরমশালা থেকে বেরোবার সময় মনে মনে বলেছিলাম, "খাকি শার্ট ও প্যান্ট জিন্দাবাদ!"

ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের কুসংস্কারীদের আগাগোড়া প্রশ্রয় দিয়ে আসছিল। এখন ব্রিটিশ সরকারকে সেজন্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য আমরা যেমন নানারকমের উপায় উদ্‌ভাবন করি, ব্রিটিশ সরকারও নিজের রাজ্য বজায় রাখার জন্য সেরূপ উপায় অবলম্বন করেছিল। কিন্তু সকল দোষের গোড়ায় আমরা। আমরা কেন অবতারদের কথায় আত্মবিক্রয় করেছি? অনেকে বলবেন, অবতারগণ সেরূপ কিছু বলে যাননি। আমি বলব, অবতারদের ভালো কথা যদি সমাজদ্রোহী কাজে পরিণত হয় তাহলে অবতারবাদ পরিত্যাগ করাই ভালো।

ধরমশালা পরিত্যাগ করে নয় মাইল কি একটু কম পথ চলে নৌকাযোগে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে রওনা হলাম। নদীর বাঁয়ে প্রকাণ্ড শস্যক্ষেত্র এবং দূরে রামনগর। ডাইনে মহানগরী বারাণসী।

**কাশীধাম বা বারাণসী**

বারাণসীকে মহানগরী বলার কারণ আছে। পরে সে-কথা বলা যাবে। নৌকায় একটি লোক বসেছিল, সে হল চৌধুরী, ধর্মে মুসলমান। এ ছাড়া আর সব মাঝি হিন্দু। চৌধুরী আর অন্যান্য মাঝির আকৃতি ও গঠন প্রায় একই রকমের। এখানে ইসলাম অথবা হিন্দুধর্ম প্রকৃতির উপর আঘাত করতে সক্ষম হয়নি।

নদী থেকে মহানগরী বারাণসীর দৃশ্য অতীব সুন্দর। হাড্‌সন নদী থেকে নিউইয়র্ক নগর দেখতে যেমন দেখায়, তার চেয়েও বেশি সুন্দর। ভারতের যেখানে যত শহর আছে, তাদের মধ্যে বারাণসীর দৃশ্য নদীতীর থেকে সর্বোৎকৃষ্ট।

নৌকা ধীরে চলছিল। কতক্ষণ আসার পরই মৃতদেহ দাহ হতে দেখে মুখ ফেরাতে হল। এমন সুন্দর দৃশ্যের পাশেই শব পোড়ানো কোনো মতেই সমীচীন নয়। যদিও এতে সামাজিক নিয়ম-কানুনে আঘাত করে তবুও পুরাতনে আকৃষ্ট থেকে মণিকর্ণিকার পূর্বস্মৃতি রক্ষা করা যায় না, বরং পুরাতন স্মৃতির প্রতি অশোভন আচরণ করা হয়।

দেখতে দেখতে দশাশ্বমেধ ঘাটে নামলাম, আরো অনেক যাত্রী নামল। পান্ডারা যাত্রীদের ঘিরে দাঁড়াল না। কেউ আমাদের নিতে এল না, আমরা স্ব-স্ব পথ ধরলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরেই একটি বাঙালি হোটেল দেখতে পেয়ে সেখানেই উঠলাম। দৈনিক পাঁচসিকা থাকা-খাওয়ার চার্জ। দুই ঘণ্টার মধ্যেই বুঝতে পারলাম, এখানে গোয়েন্দারা কিলবিল করছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই দেখলাম একটি ডাক্তারখানা থেকে কতকগুলি যুবক ওষুধ নিয়ে পালাচ্ছে; অবশেষে ডাক্তারকে পাকড়াও করে কতকগুলি পুলিশকে কোতোয়ালিতে চলে যেতেও দেখলাম। মা কালী এবং গীতার উপাসকদের এলোমেলো করে পালাতে দেখে হাসি পেয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারও হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলছিল।

ব্রিটিশ যদি বুঝতে পারত এই হাসি ও তামাশার কুফল একদিন ফলবে তাহলে বোধহয় এমন কিছু করত না। এটা হল আমার ধারণা; কিন্তু ব্রিটিশ যা করবে তা ঠিক হয়েছিল ১৯১৯ সালেই। লন্ডনে যাবার পর মিঃ সকলতওয়ালা আমাকে ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বলেছিলেন।

রাত কাটিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ির উদ্দেশে চলেছি ভূতনাথের দিকে। পথে দেখা হল এক পাদ্রির সঙ্গে। পাদ্রি গির্জার কাছে আমাকে নিয়ে আমার নিজের ভাষায় বললেন, "টুমি দেখো আমার গির্জায় ইট লাগাতে পানি দিয়েছি, তোমার মন্দিরে লৌ দিয়েছি।"

পাদ্রি মহাশয়কে ইংরেজিতেই কথা বলতে অনুরোধ করলাম এবং যা বলেছেন তা ব্যাখ্যা করে বলতে বললাম। পাদ্রি বললেন, "মন্দিরগুলি যারা তৈরি করেছিল তারা মজুরি পায়নি, গির্জা তৈরি হবার সময় প্রত্যেকটি মজুর মজুরি পেয়েছিল।"

আমি একটু হেসে বললাম, "এটা জড়বাদীর দেশ নয় পাদ্রিসাহেব, এটা মরবাদীর দেশ। পূর্বে বেগার খাটানোর প্রচলন ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। তোমরা রাজাকে সম্মান দাও আর আমরা রাজাকে ঈশ্বর মনে করি। আজই নরেশনাথের দর্শনার্থ ব্যাসকাশী যাব মনে করেছি। তোমার আর কিছু বলবার আছে?"

পাদ্রি বললেন, "কংগ্রেসি সংবাদপত্র অফিসে যাবে টুমি আর বলবে এটা মরবাদীর দেশ!"

"বহুত আচ্ছা সাহেব, এখন নমস্কার—বিদায়!"

নিকটস্থ আত্মীয়দের বাড়ি হয়ে গুটিকয়েক সংবাদপত্র-অফিসে যাওয়া ঠিক করে কয়েকখানা হিন্দি দৈনিকের অফিসে গিয়ে দেখলাম, সবাই গত রাত্রের ডাক্তার গ্রেপ্তারের কথাই বলা-কওয়া করছেন। তারপরই গেলাম একমাত্র বাংলা পত্রিকা, অবশ্য মাসিক, 'উত্তরা' অফিসে।

সেখানেও একই কথা। তবুও সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে লেখা দিতে বললেন। প্রতিজ্ঞা করলাম, লেখা দেব; কিন্তু লেখা দেবার কথা ভুলে যেতে হয়েছিল যদি বলি, তাহলে তা হবে মিথ্যা কথা। এরূপ করে কত লোকের সঙ্গে প্রতারণা করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

তবুও সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় বাঙালি, তাঁর কথা চিন্তা না-করলেও চলবে; কিন্তু বিদেশীদেরও আমি প্রতারণা করেছি। সেজন্য অনেকটা দায়ী আমি নই, দায়ী একটি সংবাদপত্র অফিস। সেই অফিসে আমার পত্র আসত এবং আমার প্রিয় বন্ধুগণ তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আনন্দ করতেন। একটা জাতির কতখানি অবনতি হলে এরকম করা সম্ভব তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার নিগ্রো অনেক অপকর্ম করে কিন্তু এ-ধরনের নিম্নস্তরের অপকর্ম কেউ করে না।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় আমেরিকা থেকে একখানা পত্র পেয়ে জানতে পেরেছিলাম, আমার নামে আমেরিকান ভদ্রলোক অন্তত দশখানা পত্র দিয়েছিলেন। অবশেষে যুদ্ধের সময় আমেরিকার ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের Lalo (লালো) আমার ঘরে এসে সব কথা শুনে যখন বন্ধুকে আমার সংবাদ দিল তখন তিনি এই নিয়ে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং আমাকে সে-কথা জানিয়ে দেন। হায় রে আমার দেশ আর জাত!

লন্ডনে দেখেছি অনেকে অন্যের ঠিকানায় পত্র পেয়ে থাকে, তাদের পত্র একখানাও হারায় না অথবা যাঁর ঠিকানায় পত্র আসে তিনি সেই পত্রগুলি খুলে দেখেন না। আমাদের দেশে কিন্তু উলটো গতি! অপরের পত্র পড়তে পারলে যেন কত আনন্দ, যেন থট-রিডিঙের এক পর্যায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল!

সংবাদপত্র-অফিস পরিক্রমা করার পর সেদিনই বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণার বাড়ি দেখে একটি নর্দমার শেষ সীমা দেখার জন্য হরিশ্চন্দ্র ঘাটের দিকে রওনা হই।

অনেকেই বলবেন, মন্দির দেখার পর নর্দমা দেখার তাগিদ হল কেন? শুনেছিলাম আর্যদের আসার বহু পূর্বে দ্রাবিড়রা যখন শহর গড়ত তখন মেথর-সিস্টেম ছিল না, আদিদেব মহাদেবের

রাজধানীতেই সর্বপ্রথম দ্রাবিড় জাত ড্রেন-সিস্টেম প্রচলন করেছিল। সেই সিস্টেম কাশীধামে আজও বর্তমান। শ্বেতকায়রা অর্থাৎ আর্যরা যখন বনে-জঙ্গলে শব্দসৃষ্টির কাজে ব্যস্ত ছিল এবং চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতিকে মাথা নত করে প্রণাম করত তখন দ্রাবিড় জাত শহর গঠন করেছিল, সমাজে বাস করত এবং শহরে নর্দমাও গড়েছিল।

পূর্বে ভারত-ভ্রমণেই লিখেছি, মানুষের মধ্যে দুটি অনুভূতি প্রথম জাগে। একটি হল লিঙ্গ-উপাসনা অন্যটি হল যোনি-উপাসনা। কাশীধামেই সর্বপ্রথম উভয় শক্তিকে একত্র করে হরপার্বতীর উপাসনা আরম্ভ হয়। ইতিহাসবিদগণ আমার কথা মানবেন কি না জানি না, কিন্তু বারাণসী যে পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম শহর, তা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

বর্তমানের ব্যাবিলন দেখে অর্থাৎ ব্যাবিলনের গঠন-প্রণালি দেখে অনেকেই তাজ্জব হয়ে যান; কিন্তু কাশীর মতো ড্রেনেজ পুরাতন শহরের একটিতেও দেখা যায় না, অন্তত আমি দেখতে পাইনি। তবে কেন বেনারসকে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে গণ্য করা হল না?

সম্ভবত তার প্রথম কারণ, লোকের মন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার দিকে ঢলে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, বারাণসীতে অত্যধিক পরিমাণে মিশ্র সংস্কৃতি মাটির উপর দেখতে পেয়ে অনেকে শহরের প্রাচীনত্বের প্রতি গুরুত্ব দেননি। বরুণা ও অসি নদীর মধ্যভাগে যদি এখনও খোদাই কাজ চলে তবে অনেক ব্যাবিলন, অনেক মহেঞ্জোদারো বেরিয়ে আসবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। উপরন্তু বর্তমান কাশীর অস্তিত্ব যে অতি আধুনিক, তা গঙ্গার গভীরত্ব দেখেই অনুমান হয়। অন্তত দুশো ফুট না-গেলে গ্র্যাভেল পাথরের দেখা পাওয়া যায় না।

দ্রাবিড় সভ্যতা বর্তমান আরব, পূর্ব ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত থেকেই সেই সভ্যতা সমুদ্র-পথে পৃথিবীর অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল অথচ প্রচারকেন্দ্র ছিল কাশী বা বেনারস। সেই প্রচার কেন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে অনেক ইউরোপিয়ান পর্যটক বেনারসে আধুনিকতম দৃশ্য দেখে বিশেষ তত্ত্বের কথা চিন্তা করতেও পারেননি।

নর্দমার শেষ দেখা হয়নি বটে কিন্তু নর্দমা সম্বন্ধে যখন বলাকওয়া করছিলাম তখন অনেকেই আমার কথা শুনছিলেন, যেন হারাধন পেয়েছিলেন! আমি কিন্তু আমাদের সভ্যতাকে একেবারে উপরে ওঠাইনি এবং ঝেড়েও ফেলে দিইনি।

আজকাল উত্তর ভারতের এক শ্রেণির লোক 'ভারতে সব ছিল' এই কথা বলে আনন্দ পায়, এটা কিন্তু খুবই দুর্বলতার লক্ষণ। রামায়ণ-মহাভারতে যেরূপ কল্পিত রূপকথা অনেক রয়েছে তেমনই অন্যান্য দেশের এবং অন্যান্য ভাষায়ও কল্পিত রূপকথার অন্ত নেই। আমাদের দেশের রথ আকাশে চড়ে বেড়াত আর আরব দেশের কার্পেট আকাশে গমনাগমন করত। চিন দেশের একটা নগর আকাশে উঠে যথা ইচ্ছা তথা গিয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন করত। জাপানের সম্রাটগণ সূর্যের বরে চোখের নিমেষে যে-কোনো গ্রহে গিয়ে আরাম করে ফিরে আসতেন। এর মানে, বর্তমানে যারা বলে 'আমাদের দেশে পূর্বেও এরোপ্লেন ছিল', তাদেরই কথা এখানে বলা হচ্ছে, অন্য কিছু নয়।

বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গিয়ে মালব্যজির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "বাড়িঘর দেখে কী মনে হচ্ছে?"

বললাম, "এটা একেবারে পুরনো ধরনের কাজ, যেমন নালন্দা; চিন দেশে এরকম বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আছে। তবে চিনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সে-দেশের ছাত্ররা মজুরের কাজ করতে ভালোবাসে, এখানে ছাত্ররা মজুরের কাজ করতে ঘৃণা বোধ করে।"

মালব্যজি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। আমিও বিদায় নিই মালব্যজির শারীরিক অবস্থা দেখে। রক্তের অভাব খুবই মনে হচ্ছিল।

এখানে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির আড্ডা। অ্যানি বেসান্ত এই সোসাইটির প্রবর্তক। তিনি নিজেরই অজান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলেন— সেই তথ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লাহোরে লালা লাজপতরায় হলে একদিন ব্যক্ত করেছিলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির মানেই বুদ্ধিজীবীদের মন রাজনীতি থেকে সরিয়ে এমন এক বিষয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া, যার মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। সেই 'ভন্ডুল' অফিসে গিয়েও নমস্কার জানিয়ে এসেছিলাম।

মানুষ যখন প্রথম উপলব্ধি করে কীভাবে পৃথিবীতে জীব-জগতের সৃষ্টি হয়েছিল তখন তার রূপ দিয়েছিল লিঙ্গের সাহায্যে, তারপর যখন বুঝতে পেরেছিল যোনি ছাড়া লিঙ্গ একা সৃষ্টি করতে পারে না, তখন ভগবানের যোনিলিঙ্গের রূপ দিয়েছিল সেই যুগের চিত্রে। যে-শহর দশ-বিশ হাজারের স্মৃতি বহন করে

যাচ্ছে সেই শহরের প্রতি ইতিহাসবিদগণ অবহেলা করেছেন। বৌদ্ধযুগেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সেই আদি এবং 'ক্রুড' চিন্তাধারার রূপকে নষ্ট করেনি বরং রক্ষা করেছিল।

এর পরে শংকরাচার্য নতুন করে যখন পুরনো চিন্তাধারাকে পুনরায় কায়েম করার জন্য সারনাথে মন্দির ভেঙে দিয়েছিলেন তখন বৌদ্ধরা যেমন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে আত্মগোপন করেছিল, ঠিক তেমনই ঔরঙ্গজেবও তারই আদি যুগের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন, আদি বিশ্বেশ্বরের বাড়ি ধ্বংস করে, হিন্দুদের হত্যা করে। অবতারবাদ যদি উৎকৃষ্ট হত তবে এরূপ ধ্বংসকাণ্ড ঘটত না।

কাশীতে পূর্বে অনেকবার গিয়েছিলাম, প্রত্যেকবারই ঔরঙ্গজেব ও মুসলমানদের প্রতিহিংসা আর ঘৃণার ভাণ্ড নিয়ে এসেছিলাম প্রসাদ রূপে; কিন্তু এবার আর সেই মনোবৃত্তি বজায় রাখতে সমর্থ হইনি, অবতারবাদই মানুষের শত্রু এটাই হৃদয়ংগম করেছিলাম কাশীধামে গিয়ে।

মানুষ সপ্তমাশ্চর্য দেখে কৃতার্থ হয়, আমি কৃতার্থ হয়েছি পৃথিবীর দুটো পুরনো প্রগতিশীল শহর দেখে। আসামে দেখে এসেছিলাম কামাখ্যা দেবীর বাড়ি, যেখানে যোনিই সৃষ্টির কারণ যারা বলে তাদের আদি তীর্থস্থান; আর কাশী, যেখানে লিঙ্গই সৃষ্টির কারণ যারা বলে তাদের তীর্থস্থান। এই দুই স্থান এবং দুই চিন্তার পেছনে অবতারবাদ নেই এবং ছিল না। শংকরাচার্য হালে জুটেছিলেন এবং আদি চিন্তাধারার সঙ্গে নাহংবাদ যোগ করে আদি চিন্তাধারায় বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন মাত্র।

বেনারসের গলিপথ অতীব সংকীর্ণ এবং এ-বিষয় সকলেই বলে থাকেন। অধিক অনভিজ্ঞতা থাকলে যা হয়, ঘটেছে তা-ই। আরব দেশে এবং হল্যান্ডে বারাণসীর মতো গলিপথ রয়েছে। অত্যধিক গরম এবং অতি শীত থেকে রক্ষা পেতে হলে অবৈজ্ঞানিক দেশে গলিপথই প্রশস্ত। বারাণসীর গলিপথের জন্য শহরের একটুও বদনাম দেওয়া যায় না, তবে ফুটপাথ থাকলে বেশ ভালো হত।

কাশীধাম-সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, সেখানে কেউই অভুক্ত থাকে না। প্রবাদ-বাক্য সত্য। গোনাগুনতি চারটি চাল খাওয়াও খাওয়া বলতে হবে। সে-হিসেবে পৃথিবীর কেউই অভুক্ত থাকে না।

শিকরুল ও রাজঘাট রেলস্টেশনের সর্বত্র ভিখিরির দল দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেক শিশুচোর আত্মগোপন করে থাকে। কাশীধামে শিশুচোরের সংখ্যা বর্তমানে বেড়েছে কি না জানি না, কিন্তু পূর্বে কাশীর মধ্যে এমন অনেক দলবদ্ধ লোক ছিল যাদের কাজই ছিল যাত্রী-শিশুদের চুরি করে ভিক্ষা করানো।

সবই পূর্বজন্মের কর্মের ফল। ফল পেতে হবেই, অতএব চিন্তা করে লাভ নেই। এই হল আমাদের দর্শন এবং সেই অনুযায়ী আমাদের মনও গঠিত হয়েছে। আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক একমাত্র শিশুপুত্র ও স্ত্রী নিয়ে কাশীধামে বাস করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সেই শিশুপুত্রটি চুরি যায়। তাঁকেও সেরূপই সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে পুত্র-শোকে কাতর হয়ে মারা যান।

এই প্রকার সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়ে পর্যটক হয়ে কাশী যাবার পর মন সব সময়ই শিশু-ভিখিরির দিকে আকৃষ্ট হত এবং আমার সাধ্যমতো শিশু-ভিখিরিদের সাহায্য করেছি।

তুর্কি ভ্রমণ-সময়ে শুনেছিলাম ইস্তাম্বুলের আয়া সোফিয়ার সামনেও সেরূপ শিশু-ভিখিরির খুব ভিড় হত, কিন্তু মুস্তাফা কামালপাশা তিন দিনে সেই শিশু-ভিখিরিদের ভিক্ষাবৃত্তি লোপ করেন। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে দরবেশ-শ্রেণির লোক শিশুদের চুরি করে এনে ভিক্ষা করাত।

মুস্তাফা কামালপাশা যদিও মার্ক্সিস্ট ছিলেন না তবুও আমাদের মতো তিনি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করতেন না। যারাই 'নসিব' বলত, তাদেরই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেবার সময় বলতেন, "অন্যত্র গিয়ে নসিব দেখতে হবে, বিদায় হও পৃথিবী থেকে।"

এইভাবে দরবেশ-শ্রেণির লোক তুর্কি থেকে লোপ পেয়েছিল। সমস্ত ভিখিরি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ভার সরকার গ্রহণ করেছিলেন।

যা হোক, তখনো তুর্কি ভ্রমণ করিনি, অতএব মনের গতি অন্যরকমই ছিল। শিশুদের প্রতি দয়া হত কিন্তু সে দয়ার্দ্র চিত্ত বেশিক্ষণ থাকত না, লোপ হয়ে যেত। তার মানেই 'দয়া' নামে যে সদ্‌গুণ আছে, তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।

এর কারণ কী? এর কারণ হল খাঁটি দয়ার্দ্র চিত্ত যদি আমার থাকত তবে তখনই পর্যটন পরিত্যাগ করে বিপ্লবাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হত। তখন ছিলাম আমরা পরাধীন, অন্তত পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য সক্রিয় বিপ্লবে যোগ দিতে হত। তা আমি করিনি, শুধু দেশ দেখার লোভ আমাকে এক

স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল। অথবা দয়া নামক সদ্‌গুণ আমার মধ্যে পূর্বেও ছিল না এবং এখনও নেই।

সেদিন বিকেলে যখন পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম তখন দেখা হয় এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। সেই বন্ধুর নাম মহম্মদ আলি, জাতে বাঙালি। তাঁকে চিনতেই পারছিলাম না। তাঁর সঙ্গে যখন ভ্যাংকুভারে (কানাডা) দেখা হয় তখন তাঁর গোঁফ-দাড়ি ছিল না। এবার তাঁর মুখে মুসলমানি কায়দা-মাফিক গোঁফ-দাড়ি ছাঁটা ও কাটা। পরনে পাজামা কামিজ, মাথায় তুর্কি টুপি, পায়ে নাগরা জুতো।

আমি তাঁকে কী করে চিনব? তিনিই আমাকে চিনলেন এবং টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কেমন আছি। অবশ্য হিন্দুস্থানিতে কথা হচ্ছিল। আমি তো অবাক, এ লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলছে কেন? কখনো দেখিনি।

আমার মনের অবস্থা ভদ্রলোক অনেকটা বুঝতে পেরে বললেন, "এটা ভ্যাংকুভার নয়, কাশীধাম; তারপর আমি একজন মুসলমান, ছুঁলে জাত যায়। মনে আছে সেই লোকটাকে যে তোমার জন্য এক হাজার ডলার জামিন হতে চেয়েছিল?"

"তিনি হলেন মিস্টার মহম্মদ আলি। তোমাকে কি সেখানে দেখেছিলাম? আমার তো মনে হয় না।" আমি বললাম।

মিঃ মহম্মদ আলি বললেন, "আমি রূপ বদলেছি, তুমি রূপ বদলাওনি।"

আরো একটু ভালো করে দেখে বুঝলাম, এই সেই মহম্মদ আলি যিনি কানাডা সরকারের কাছে এক হাজার ডলার জামিন হয়েও আমাকে ছাড়াতে পারেননি। তাকে আঁকড়ে ধরে বললাম, "তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। তারপর তুমি আমাকে যেরকম আক্রমণ করেছ, বাস্তবিক আমি সেজন্য দুঃখিত; কিন্তু অবতারবাদ অনেক পেছনে রেখে এসেছি। এখানে দেখছি সেই পুরনো ঐতিহাসিক তথ্য, যা নিয়ে একদিন তোমারই ঘরে কথা হয়েছিল। এখন চলো আমার হোটেলে।"

"তা হয় না, আমার মতো দাড়িওয়ালা মুসলমানকে তোমার হোটেলে ঢুকতে দেবে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয় কথা হল, আমি এখনও নির্বাসিত রূপেই গণ্য। আমার পেছনে লোক লেগেই আছে। তুমিও কানাডা থেকে ডিপোর্ট হয়েছিলে কিন্তু আমি ডিপোর্ট হয়েছি রাজনৈতিক কারণে। নিজেকে সবসময় মুসলমান ছাড়া আর কিছু বলিনি। অবশেষে প্রমাণ হয়ে যায় আমি জাতে বাঙালি, ধর্মে মুসলমান। ধর্ম যখন-তখন বদলানো যায় কিন্তু মরবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙালিত্ব দূর করা যায় না। সেজন্যই ডিপোর্ট করা হয়েছিল।

"স্ত্রী এবং কন্যাকে কানাডাতেই রেখে এসেছি। বলে এসেছি, যে-পর্যন্ত আমাদের দেশ স্বাধীন না-হয় সে-পর্যন্ত কানাডাতে ফিরে যাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু স্ত্রীর ভালোবাসা, কন্যার ক্রন্দন এখনও চোখে ভাসে। কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না। উপরন্তু দেশে আসার পর হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্য দেখতে পেয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে কি না, তাও বুঝতে পারছি না। ইচ্ছা করলেই কানাডাতে ফিরে যেতে পারি কিন্তু থাকতে হবে চোরের মতো। তার চেয়ে না-যাওয়াই ভালো, তুমি কী বলো?"

"চোরের মতো থাকাও কষ্টকর; তবে একটি কাজ করতে পারেন, আমেরিকাতে গিয়ে সেখানে আপনার কন্যা ও স্ত্রীকে ডেকে আনতে পারেন।"

মহম্মদের চোখ বিস্ফারিত হল, তিনি চুপ করলেন। কতক্ষণ পর আমার হাত ধরে বললেন, "তোমার উপদেশ কাজে লাগাবার চেষ্টা করব, এখন বিদায়।"

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমেরিকায় পুনরায় দেখা হয়েছিল। তাঁকে তাঁর স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গেই দেখেছিলাম। ইনি বুঝতে পেরেছিলেন যারা ইমিগ্রেশন আইন প্রথম প্রণয়ন করেছিল, তারা কত নির্দয়! মানুষ হয়েও তারা পশুই ছিল। তারা ছিল ইউরোপিয়ানদের পূর্বপুরুষ। আমেরিকানরাই এই আইন সর্বপ্রথম প্রবর্তন করে। আজ আমেরিকানরা আরব দেশগুলিতে টাকার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। মুসলিম আরব যাতে আমেরিকায় যেতে না-পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই আইনের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার বাঙালিদের বিদেশে গমনাগমনের বাধা সৃষ্টি করার জন্য এই আইনের কঠোরতা পূর্বদেশেও আরোপ করে।

**এলাহাবাদ**

পরদিন কাশীধাম থেকে বিদায় নিয়ে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করে এলাহাবাদে পৌঁছই। সেখানে মুখুজ্যে মহাশয়দের পরিচালিত হোটেলে থাকি এবং কয়েকটি বিশেষ স্থান— যথা অক্ষয়বট ও ত্রিবেণী দেখে এবং ত্রিবেণীতে স্নান করে কানপুরের দিকে রওনা হই। এখানে ১৯৩৬ সালে এম.এন. রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁকে তাঁর অতীত ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল। চিন দেশে হয়তো ভুল করেছিলেন, তা

বলে সারা জীবন ভুল করা চলে না।

এম.এন. রায় শ্রেণির লোক ভুল না-করে পারেন না। পূর্বেই বলেছি, শিশুকে সবাই ভালোবাসে; কিন্তু পৃথিবীর সব শিশু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে-বিপ্লবের দরকার, সেই বিপ্লবকে আঁকড়ে রেখে কাজ করে যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আজ মানবেন্দ্র রায় মহাশয় আর নেই। তিনি আমাদের জন্য যেটুকু করে গেছেন সেজন্য মাথা নত করে তাঁর নামে শ্রদ্ধা জানাই।

এলাহাবাদে মতিলাল নেহরুর বাড়ি। জওহরলালের জন্মভূমিও এই এলাহাবাদ। এখানেই ত্রিবেণী, এখানেই অক্ষয়বট; কিন্তু আমাকে কিছুই আকৃষ্ট করতে পারেনি। এখানে আসার পরই গুরুদ্বারের এক শিখের সঙ্গে দেখা হয়। সেই শিখ স্মরণ করিয়ে দেয় ভগৎ সিংহের কথা আর সেই ছবিটার কথা— যে-ছবি একবার চিন দেশে দেখেছিলাম।

সেই ছবিতে একদিকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের নেতারা, অন্যদিকে ভগৎ সিংহের ছিন্নমুণ্ড। ছিন্নমুণ্ডের পাশেই ব্রিটিশ পতাকা পতপত করছে আর হুমকি দিয়ে বলছে— "খবরদার, Long live Revolution উচ্চারণ কোরো না!"

এই ভগৎ সিংহই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন (মুজফ্‌ফর আহমদের মতে) 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' খাঁটি উর্দু, সংস্কৃত এবং আরবি শব্দের সংমিশ্রণ।

ত্রিবেণীতে স্নান করে অক্ষয়বট দেখতে গিয়েছিলাম। কেল্লায় ব্রিটিশ সেপাই পাহারা দিচ্ছিল। যাত্রীদের নেড়া মাথা এবং এক বস্ত্রে অক্ষয়বটের দিকে যাওয়া সেপাইরা দেখছিল। আমি দেখছিলাম তাদের ঘৃণ্য মুখ।

অক্ষয়বট সজীব নয়; মৃত, শুষ্ক, বল্কলহীন; এবং দেখলে মনে হয় না এটা একটা বটগাছের অংশ হতে পারে। তাতেই সকলে ফুল আর চন্দন লাগিয়ে হাতজোড় করে প্রণতি জানাল, আমিও তা-ই করলাম আর ভাবলাম; হয়তো বটগাছই সৃষ্টির শুরুতে সবচেয়ে বড় গাছ ছিল যার উপর উঠে আদি মানব জীবনরক্ষা করত এবং সেজন্যই বটগাছের এত প্রাধান্য।

নদীতে স্নান করায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং গঙ্গাস্নান করলে পাপক্ষয় হয়, স্বর্গবাস হয়, এসব প্রচলিত কথাও রয়েছে। কেন গঙ্গাস্নানকে এত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার কারণ কোরিয়া-ভ্রমণের সময় জেনেছিলাম।

কোরিয়ার পৌরাণিক তথ্য অনুযায়ী কোরিয়ানরাই সর্বপ্রথম নদীতে নেমে অথবা সাগর-জলে স্নান করতে সক্ষম হয়। এখনও পৃথিবীতে এমন অনেক জাতের লোক আছে যারা স্নান করতে ভয় পায়। বিন্ধ্যাচলের পার্বত্য জাতি তার মধ্যে অন্যতম। যারা স্নান করতে ভয় পায়, তারা নদী দেখলে আরো ভয় পাবে এটা স্বাভাবিক।

প্রয়াগে মাথা মুণ্ডনের প্রথা রয়েছে। আদিযুগে চুল রাখার প্রথা ছিল; তাতে উকুন হত, জটা বাঁধত। মনে হয়, এদিকের লোকই সর্বপ্রথম ক্ষুরের আবিষ্কার করে এবং যারা ক্ষৌরকর্ম করত তাদের পোষণার্থ প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। আমার মাথা মুণ্ডন যে-লোকটি করেছিল, তাকে এক টাকা চার আনা দক্ষিণা দিয়েছিলাম।

যতগুলি ক্ষৌরকার দেখেছিলাম, তাদের মধ্যে একজনের আকৃতিও ইন্দো-এরিয়ানের মতো ছিল না। অথচ বিহারে, বিশেষ করে গয়াতে ক্ষৌরকারদের অনেকেরই আকৃতি ইন্দো-এরিয়ানের মতোই ছিল। গুজরাত ও কাথিয়াওয়াড় ভ্রমণের সময়ে নাগড় ব্রাহ্মণ, মুচি, জেলে, নাপিত, ছুতার, ইন্‌নেসেরি মুসলমান এবং শিয়াদের চেহারার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাইনি; অথচ প্যাটেল, রাজপুত, আগাখানি বোড়া-মুসলমান ইত্যাদির মধ্যে বর্ণের একত্ব অথবা চেহারার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

এলাহাবাদ ছাড়বার পর আমার গন্তব্যস্থল ছিল কানপুর। এলাহাবাদ শহর থেকে বের হয়ে প্রায় বারো মাইল যাবার পর আর পা চলছিল না। সাইকেল প্যাডেল করার ক্ষমতা মোটেই ছিল না। ভাবছিলাম, হয়তো সাইকেলে কোনো দোষ হয়েছে; কিন্তু সাইকেল পরীক্ষা করে দেখলাম, সাইকেলে কোনো দোষই নেই। অনেক চিন্তা করে নিকটস্থ ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিলাম।

কিন্তু বিকেলের দিকে রক্ত-আমাশয়ের লক্ষণ একটু প্রকট হয়ে ওঠে; তখন শুয়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু শুয়ে থাকা সম্ভব হয়নি, বার বার মলত্যাগের জন্য উঠে যেতে হচ্ছিল।

ধন্যবাদ জানাই ডাকবাংলোর মেথরকে, সে দয়া করে গ্রাম থেকে ঘোল এনে দিল, হাত-পায়ে সেঁক দিল আর পরের দিন নিজের তত্ত্বাবধানে কানপুরের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছিল। এর পরিবর্তে আমি দিয়েছিলাম একটি মাত্র টাকা। এই শ্রেণির লোককে ঘৃণা ও হিংসা করতেই ছোটবেলা থেকে শিখেছিলাম। বিপৎকালে আজ তারাই আমার বন্ধু হয়েছিল।

গাড়িতে উঠেও শান্তিতে বসতে পারিনি, ক্রমাগত পেটে ব্যথা হচ্ছিল, মাথা কন্‌কন্ করছিল। তিনটের সময় গাড়ি থেকে

নেমে কোথায় যাই ভাবছিলাম। তারপর হঠাৎ মনে হল রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। সেখানে উঠেই আরাম পেয়েছিলাম, আরোগ্য হয়েছিলাম এবং ভ্রমণ করার মতো শক্তি অর্জন করেছিলাম।

**কানপুর**

শরীরে শক্তি থাকলে রোগ সহজে কাবু করতে পারে না। কানপুর রেল স্টেশনে পৌঁছনোর পূর্বেই কিছুটা আরাম অনুভব করি এবং গাড়ি থেকে নেমে সোজা রামকৃষ্ণ মিশনে যাই। সেখানে গিয়ে বেশ শান্তি পেয়েছিলাম। শান্তি অনেক রকমের, যথা— মানসিক শান্তি।

মিশনে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই একদা বিপ্লবী-ভাবাপন্ন ছিলেন। বিপ্লব থেকে একেবারে বিপরীত ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। যখনই কোনো বিপ্লবী ধর্মের ভিত্তি অবলম্বন করে বিপ্লবে অগ্রসর হয় তখনই তার পতন হয়; এবং সেই পতনের গ্লানি থেকে নিজেকে একটু আনন্দ দেবার জন্য কোনো কিছুর অবলম্বন চায়। আমি হয়েছিলাম তাঁদের সেই অবলম্বন!

সকাল-সন্ধ্যায় এঁরা প্রার্থনা করতেন, আমি তাতে যোগ দিতাম না। তাঁরাও আমাকে যোগ দিতে আদেশ করতেন না; জানতেন ভাঙব, তবুও মচকাব না। প্রায়ই তাঁরা ভ্রমণ-কথা শুনতে চাইতেন। আমিও মাও সে-তুং এবং তাঁর সাথিদের কথাই বলতাম। লক্ষ করতাম, এঁদের মনে বিদেশী বিপ্লবীদের উন্নতির কথা শুনে কত কষ্ট হচ্ছে! ভারতীয় সাধু লাল কাপড় পরিত্যাগ করতে ভয় পায়। আমাদের মধ্যে যেমন তালাক দেওয়ার নিয়ম নেই, ঠিক তেমনই গৈরিক বস্ত্র পরিত্যাগ করারও নিয়ম নেই। এঁদের এই দুঃখের জীবন দেখে প্রাণে বেশ আঘাত লেগেছিল। তাঁদের কিছু বলিনি, বলবার সাহসও হয়নি।

কানপুরে সিপাহি-বিদ্রোহের চিহ্ন ব্রিটিশরা লোককে দেখাবার জন্য রেখে দিয়েছিল; কিন্তু আমাদের দেশের লোক যারা নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের কোনো চিহ্ন দেখতে না-পেয়ে দুঃখ হয়নি, ক্রোধ হয়েছিল। নিজের জাতকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়েছিল, নিজেকে অপমানিত মনে করেছিলাম। নিজ জাতের স্মৃতিরক্ষা করা আমাদেরই কর্তব্য।

এখানেও লোকে নদীতে স্নান করে, তর্পণ করে, পিণ্ড চড়ায় এবং চটকায়। সেই সঙ্গে যদি সিপাহি-বিদ্রোহের বিপ্লবী বীরদের নামে সকলেই পিণ্ডদান করত, তর্পণ করত, তবে কত সুখের ও কত আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াত! সিপাহি-বিদ্রোহের কয়েকটা পাতকুয়া দেখে এবং ব্রিটিশের জয়-গরিমা-দীপ্ত দাম্ভিকতা দেখে কানপুর থেকে বিদায় নিয়ে লখনউ যাই।

**লখনউ**

কানপুর থেকে লখনউ মাত্র চুয়াল্লিশ মাইল। পথ অতীব সুন্দর। পথের দু-দিকে মাঠ ধু-ধু করছিল। লু-হাওয়া শরীরে লাগছিল তবুও সাইকেলখানা পবনের মতো উড়ে চলছিল।

কয়েকদিন পূর্বে এই পথে এক ডাকাতি হওয়ায় টইলদার পুলিশ তখন প্রায়ই দেখতে পাচ্ছিলাম। পুলিশ দ্রষ্টব্য জিনিসও নয়, চিন্তনীয় বিষয়ও নয়, আসল বিষয় ছিল ডাকাত দেখা। ডাকাত যদিও দেখতে পাইনি কিন্তু ডাকাতের চেয়ে শক্তিশালী এক অতিকায় সামাজিক শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেই শত্রু যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে খাচ্ছে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব মনে করে দাঁড়ালাম। সেই শত্রুর নাম ছুঁতমার্গ।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করবেন, ছুঁতমার্গরূপী দৈত্যের জয় হয়েছিল কি আমার জয় হয়েছিল? উত্তরে বলব, আমার শুধু পরাজয়ই হয়নি, পলায়ন হয়েছিল; অথচ এই দৈত্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শহরের সন্নিকটে, যে-শহরে একদা মুসলিম নবাবেরা রাজত্ব করতেন।

শহরে পৌঁছে একটি ধরমশালায় উঠলাম। আমাকে একখানা রুম দেখিয়ে দিয়ে চার পয়সার বিনিময়ে একখানা চারপাই দেওয়া হল। স্নানাহার শেষ করে পুরনো শাসকদের বাসভবন ও দুর্গাদি দেখতে গেলাম। যে-সব অট্টালিকা দেখলাম, তার মধ্যে নবাবের বাড়িই দেখতে সবচেয়ে সুন্দর, মসজিদগুলি সর্বত্র যেমন দেখায় এখানেও তদ্রূপ।

শহরে ভ্রমণের সময় পরিষ্কার করে বুঝলাম, এখানে দুই জাতের লোক বাস করে। এক জাত কালো, অন্য জাত আমেরিকান মতে বর্ডারলাইনার। ট্যান্ডন, কিদোয়াই শ্রেণির লোক বর্ডার-লাইনের আর রামা-শ্যামা হল কালো অর্থাৎ অনেকটা গোলাম বললেও দোষ হয় না।

এখানে দেখা হয় এক মির্জার সঙ্গে। অবশ্য তিনি মিরজাফরের বংশধর নন, লখনউ-এর লোক। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, যত চাকর ও চাকরানি সবাই কালো রঙের। তারা আদেশের অপেক্ষায় সবসময় হাজির।

মিস্টার ট্যান্ডন সে-সময়ে কংগ্রেসের হোমরা-চোমরা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে বাজারে দেখা হয়। তাঁর বাড়িতেও অনেকগুলি কালো লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বুঝতে পারলাম, এদিকে

ইন্দো-এরিয়ানদের কত প্রতাপ!

এক অপূর্ব রীতি সেখানে! মেথর, চামার আর সেই শ্রেণির লোকের কাছে ঘি-মাখন বিক্রি করা হয় না। অনেক স্থানে দেখেছি, অনেকগুলি অচ্ছুত জলের পাইপের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে জল খাবার জন্য, অথচ তাদের মধ্যে এমন সাহস কারো হয়নি যে কলটা খুলে জল খেয়ে তৃপ্ত হয়! তারপর লখনউ শহরের অন্যান্য যে-বদনাম রয়েছে তা কতটুকু সত্য, জানবার ইচ্ছাও হয়নি।

এখানে কতকগুলি বিদ্যালয়ে লেকচার দিয়েছিলাম। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারই মুসলিম। তাঁরা আমাকে লেকচার দেবার জন্য বেশ উৎসাহ দেন এবং তাঁদের উৎসাহ পেয়ে প্রায় ছয়দিন লখনউ-এ থেকে লেকচার দিই। সর্বত্র একই চিনের কথা। মাঝে মাঝে নিজের দেশের কথা বলতেও ভুলতাম না।

এখানে পরিষ্কার করে একটি বিষয় বলা দরকার। আমি যখন ভ্রমণ করছিলাম তখন আমরা পরাধীন ছিলাম। পরাধীনতা অপসারণ করাই ছিল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। পূর্বদেশগুলি ভ্রমণ করার পর বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের দেশের ধর্মগুলিকে আশ্রয় করেই ব্রিটিশ ভারত শাসন করছে।

ধর্মের প্রচারক ও সহায়ক পুরোহিত-শ্রেণি। আমাদের দেশের পুরোহিত-শ্রেণি সংবাদ রাখে না পৃথিবীর লোক নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক— সব রকমেই উন্নতির দিকে ধাবমান হচ্ছে। এক ভারত ছাড়া ছুঁতমার্গের কুসংস্কার কোথাও নেই। ছুঁতমার্গের সংস্কার আধুনিক, পুরাতন নয়।

বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের আর্থিক ও সামাজিক কথা যখনই বলতাম তখনই এক শ্রেণির লোক খাপ্পা হয়ে যেত। যারা সত্যিকারের ব্রিটিশ এজেন্ট তারাই আমাকে বিদেশী শব্দে ভূষিত করত। এখনও সেইরকম লোক আমাদের দেশের সর্বত্র দেখা যায়, তবে তারা তাদের রূপ বদলেছে। তারা অনেক উন্নত ধরনের বাক্‌চাতুরিতে সিদ্ধ হয়েছে।

এই শ্রেণির লোক পূর্বে পুরোহিত-শ্রেণিতে দেখা যেত এখন পুরোহিত-শ্রেণির কাজ ফুরিয়েছে— আমাদের দেশ খণ্ডিত হয়েছে— তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। এখন বাকি রয়েছে স্বাধীন ভারতকে পরাধীন করার তর্কশাস্ত্রের বেড়াজাল। যা হোক, বর্তমান নিয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নেই; অতএব পূর্বের বিষয়ে ফিরে যাওয়াই ভালো।

উত্তর-ভারতের মজুরের স্থান কানপুর। সেখানে ফিরে এসে আর রামকৃষ্ণ-মিশনে যাওয়া ভালো মনে হয়নি; মজুরদের বস্তিতে এক রাত্রি থেকে পরের দিন আগ্রার দিকে রওনা হই।

**কাল্‌পি**

একদিনেই কাল্‌পি নামক স্থানের নদীতটে এলাম। এক ডাকবাংলোতে এক টাকা দক্ষিণা দিয়ে রাত কাটাবার সুবিধা করা গেল। স্থানটাও গরম নয়। লু-হাওয়ার অত্যাচার কম থাকায় রাত্রে সুনিদ্রা হল।

পরদিন সকালে একদল কালো লোক মাছ নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে চার আনা দিয়ে একটা বড় রুই মাছ কিনে নিলাম। তারপর ডাকবাংলোয় গিয়ে সেখানকার চাকরের সাহায্যে মাছ রান্না করে খেয়ে নিলাম।

ডাকবাংলোর চাকর আমাকে বলল, "বাবু, এদিকের ভদ্রলোকেরা ভুলেও মাছ খায় না— সে হিন্দু বা মুসলমান যা-ই হোক; কিন্তু কলকাতা থেকে সাহেব এলে এখানে মাছ না-খেয়ে যায় না। আর তুমি হলে বাঙালি, তোমার খাদ্যই হল মাছ। আমরা হলাম আদিবাসী, আমরাও মাছ খাই।"

তারপর সে এমন আরো কিছু বলল যা ভ্রমণ-কাহিনিতে লেখা যায় না এবং রুচিমান পর্যটক তা ভাবতেও পারেন না।

এই লোকটির নির্দেশ অনুযায়ী নদীতীরের পথ অবলম্বন করে, যেসব গ্রামের সে নাম দিয়েছিল, সেই গ্রামগুলির ডাকবাংলোয় থেকে অতি অল্প পরিশ্রমে আগ্রায় পৌঁছই।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ আরম্ভ করলাম। গ্রামের নীরবতা, পবিত্রতা, বিশুদ্ধ আবহাওয়া আমার মনকে চাঙ্গা করে তুলল। গ্রামের মধ্যে এক ঘর মিশির ব্রাহ্মণ আর সবাই অচ্ছুত অথবা আদিবাসী। মিশির ঠাকুর সকালে উঠেই গ্রামের প্রত্যেকের বাড়িতে যান এবং সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর এক মুঠো আটা দক্ষিণা স্বরূপ আদায় করেন। কারো বাড়িতে যদি কেউ অসুস্থ হয় তবে গ্রাম্য পুরোহিত মিশির ঠাকুরকে ওষুধের ব্যবস্থা করতে হয়। সেজন্য যদি গ্রামান্তরে তাঁকে যেতে হয়, তাতেও তিনি বাধ্য। ঝগড়া-বিবাদ হলে তিনিই মীমাংসা করেন। পুরোহিত অর্থাৎ মিশির ঠাকুর কোথাও ইন্দো-এরিয়ান, কোথাও মেশানো, কোথাও শ্যামবর্ণ। গ্রামের প্রাণ— মিশির ঠাকুর।

গ্রামের মুসলমানেরাও মিশির ঠাকুরের আদেশ মান্য করে এবং সকালে এক মুষ্টি চাল অথবা আটা দিয়ে আশীর্বাদ নেয়। গ্রামাঞ্চলে মৌলবি দেখা যায় না। মৌলবি বাস করেন শহরে।

এদিকে মুসলমানদের মধ্যে একটিও ইন্দো-এরিয়ান দেখতে পাওয়া যায় না। সকলেই আদিবাসী। আদিবাসীদের মধ্যে দুটি ধর্ম বর্তমান; কিন্তু তৃতীয় ধর্ম প্রবেশ করতে আরম্ভ করায় গ্রামবাসীর পুরনো রীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। সাহস করে যারা নতুন ধর্মের মধ্যে এসে পড়েছিল তারা শিক্ষার দিকে বেশ এগিয়ে চলেছিল এবং ক্রমাগতই দেশাত্মবোধ হারিয়ে ফেলছিল।

আদিবাসীদের শরীরের রং কিন্তু নিগ্রোদের মতো কৃষ্ণবর্ণ নয়। মাঝে মাঝে মাত্র দু-একজন লোক দেখেছি যাদের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু তাতে বেশ লাবণ্যমাখা। চুল, দাঁত, মুখের গঠন একেবারে তীক্ষ্ণ, নাক পাতলা এবং খাঁটি নর্ডিকদের মতো। এই ধরনের লোক খুবই কম এবং তারা নিজেদের চিন্তায় নিজেরাই বিভোর।

অন্যদিকে এরা উদ্ভিদতত্ত্ব বেশ ভালো জানে এবং সাপ দেখলেই হত্যা করে। সাপ-উপাসনা কিংবা কোনোরকম উপাসনায় তাদের মন বসে না। মদ ও মাংস খেতে যেমন ভালোবাসে, দুধ তেমন পছন্দ করে না, অথবা সন্তানাদি বেশি করে হোক তা-ও পছন্দ করে না। এদের কোনো বিশেষ গোষ্ঠী নেই, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। এই ধরনের লোককে চা খাওয়াবার প্রলোভন দেখালে কিংবা সিগারেট দিলেও নেয় না দেখে তাজ্জব হয়েছিলাম। আদিবাসী প্রবৃত্তি এদের মধ্যে খুব কমই দেখতে পেয়েছিলাম।

আগ্রা

এর পর আগ্রা যেন আমাকে আবার নতুন করে আকর্ষণ করতে লাগল! আগ্রাতে আরো একবার গিয়েছিলাম এবং আগ্রার তাজমহল আর অন্যান্য নিকটস্থ স্থান দেখেই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। এবার যমুনা নদীর ওপারে থেকে গেলাম।

শহরে আসতে ইচ্ছা না-হবার প্রথম কারণ হল শহর গরম। দ্বিতীয় কারণ, সন্ধ্যার পরও কিছু দেখার ইচ্ছা। আমাকে যারা স্থান দিয়েছিল তারা হল আহির। আহির যমুনায় মাছ ধরে এবং শহরে বিক্রি করে। যে-আহিরের বাড়িতে ছিলাম, তাকে দৈনিক বারো আনা পয়সা দিতাম, পরিবর্তে সে দু-বেলা পেট ভরে মাছ-ভাত খাওয়াত। এর চেয়ে সুখময় জীবন পর্যটকের পক্ষে আর কী হতে পারে? আমি হলাম বাঙালি, উত্তম মাছ-ভাতেই তৃপ্ত।

যদি থাকবার এবং খাবারের ভাবনা না-থাকে তাহলে সুচিন্তা আপনা থেকেই আসে। একদিন তাজমহল দেখতে গেলাম। কী সুন্দর দৃশ্য! তাজমহলের তুলনা শুধু তাজমহলের সঙ্গেই করা যায়। দৃশ্য মনোরম এবং তাজমহলের কিছুটা দেখামাত্র নির্মাণকর্তা এবং নির্মাণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা আপনি এসে গেল।

বেলা ঠিক এগারোটা। একদল বাঙালি তাজমহল দেখতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম। সকলেই শাহ্‌জাহান ও মমতাজের কবরের ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে নমস্কার করলেন। আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলাম মাত্র। কয়েকজন আরম্ভ করলেন ডি. এল. রায়ের কবিতার আবৃত্তি। শুনতে ভালোই লাগল। ডি. এল. রায়ের সবগুলি নাটক প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল, অতএব এঁদের বেশ ভালোই লেগেছিল।

কতকগুলি বাঙালি মুসলমানও সেইসঙ্গে ছিলেন। দেখলাম, এঁদের কেউ কোনোরূপ মন্তব্য না-করে অথবা মোমবাতি না-জ্বালিয়ে একেবারে চলে গেলেন আঙিনাতে। তাঁরা যেখানে গেলেন সে-দৃশ্যটা কিন্তু আমার চোখেও পড়েনি। তাজমহলের উপরে যে-তিনটি কলসি রয়েছে, সেই কলসিগুলোর আয়তন অনুযায়ী পাথর দিয়ে চিত্র আঁকা রয়েছে। একজন পায়ে হেঁটে দেখলেন, তাঁর আঠারো ধাপ হল নীচেকার কলসির দৈর্ঘ্য।

বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলছি, তাজমহলের সর্বনিম্ন কলসি কত বড় বুঝতে তা পেরে খুবই বিস্ময় বোধ হল। তাজমহল দেখার মতো কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্যে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম।

প্রথমত জেনে নিলাম, তাজমহলের শ্বেত পাথর কোথা থেকে এসেছিল। জানতে পারলাম, জয়পুর, দাক্ষিণাত্য, আফগানিস্তান, চিন, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে আসে। সেগুলি ছিল একশো হাত লম্বা ও সেই অনুযায়ী চওড়া। প্রত্যেকটি পাথর পুরুও ছিল অনেকটা। কোনো কোনো পাথর এর চেয়ে দশগুণ বড়ও ছিল। গম্বুজগুলির প্রত্যেকটা পাথর একেবারে নিটোল এবং প্রতিটিই বহুদূর থেকে আনা হয়েছিল।

তিনদিন শুধু পাথর আনার ইতিহাসই শুনতে হল। তারপর খরচের তালিকা অবশ্য তেমন কিছু মনে হল না; কিন্তু যখন মজুরের মৃত্যু আর পাথর চাপা পড়ে কত লোক ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে শুনতে লাগলাম, তখন ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' আমার কাছে ভাবপ্রবণতার ফোয়ারা বলেই মনে হল। আমি তাজমহলের নাম দিলাম 'রক্তমহল' এবং সে-কথা প্রথম বললাম যে-আহিরের বাড়িতে ছিলাম তার কাছে। ভ্রমণ শেষ করার পর সে-কথা বলেছি কয়েকজন বাঙালি মুসলমানের কাছে, আর

আজ বলছি আমার এই ভ্রমণ-কাহিনিতে।

তাজমহল দেখা শেষ করে যখন দিল্লির দিকে রওনা হলাম তখন শুধু মনে হল, এই সেই তাজমহল যার নাম শুনেও লোকে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে। এটা হবার কথাই। আমাদের দেশে এখনও শ্রমের মূল্য নেই, পূর্বেও ছিল না।

**দিল্লির দিকে**

আগ্রা থেকে মথুরা পর্যন্ত যে-রাজপথ গিয়েছে, সে-পথ বাস্তবিকই পরিব্রাজকদের উপভোগ্য। হেঁটে ও বাইসাইকেলে যে-কেউ এই পথে চলতে পারে। একদিকে নদী, অন্যদিকে অগণিত গ্রাম।

এদিকের গ্রামগুলি কিছুটা উন্নত; প্রিমিটিভ স্টেজ পার হয়ে একপা এগিয়ে গেছে দেখলেই বোঝা যায়। এখন বোধহয় আরো উন্নত হয়েছে।

এমন সুন্দর পথে চলার সময় এটাই লক্ষ করেছি, পথের দু-পাশের গ্রামাঞ্চলের লোকের মধ্যে বাংলাদেশের মতো পর্দাপ্রথা অথবা ঘোমটা-দেওয়া স্ত্রীলোক বড়ই কম। তা ছাড়া স্ত্রী-পুরুষের দূরত্বও কমই দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের উচ্চ চাহনি; স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষদের সম্মান বেশ অনুভব করা যায়।

কয়েকশো বছর মুসলিম রাজত্বে বাস করেও এরকম স্বাধীনতা কোন্ শক্তিতে এরা বজায় রেখেছিল, তা ভেবে একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম।

**মথুরা-বৃন্দাবন**

বিকেলে মথুরায় পৌঁছে একটি হোটেলে স্থান নিলাম। দক্ষিণা মাত্র এক টাকা। হোটেলটি নদীর কাছে অবস্থিত। সন্ধ্যার সময় নদীর জলের সামনে দাঁড়িয়ে আরতি করা দেখছিলাম। আমায় তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল আর্য অথবা নবাগত শ্বেতকায়দের নদী-ভক্তির কথা। আরতি অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর।

ঘাটের কাছেই কতকগুলি কচ্ছপ বিচরণ করছিল। দেখে বড়ই ঘৃণা হল। এদের কেন প্রতিপালন করা হচ্ছে এবং কেন এদের শ্রদ্ধা করা হয়, জিজ্ঞাস্য বিষয় বটে। এটা যেন স্মার্না বন্দরের কচ্ছপ-মিছিল! স্মার্না বন্দরে বর্তমানে আর মিছিল চলে না; তুরুকরা কচ্ছপ-মাংস খায় না কিন্তু কচ্ছপ হত্যা করে এবং কুৎসিত-দর্শন জীবের মৃতদেহ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বাড়িতে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দেয়। এখানেও সেরকম ব্যবস্থা করলেই ভালো হয়।

বৃন্দাবনে আরো ভয়াবহ কচ্ছপ দেখা যায়। সেই কচ্ছপ মানুষকে আক্রমণ করে অনেক সময় কামড়ায়। বৃন্দাবনের ইন্দো-এরিয়ানরা বলে, যারা পাপী তাদেরই শুধু কচ্ছপে কামড়ায়। পাপ-পুণ্যের অভিজ্ঞতা এদের পৃথক ধরনের; অতএব বলবার কিছুই নেই।

পরের দিন দেখলাম, একটি লোক একটা কাককে বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখানে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা কাকের মাংস খায়। যে-লোকটি কাক বিক্রি করতে এসেছিল তার শরীরের বর্ণ ঘন শ্যাম, চোখ বড়, আজানুলম্বিত বাহু, পদযুগল স্কটদের মতো লম্বা ও নিটোল, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। চুলগুলি একেবারে অস্ট্রিক ধরনের। দেখেই মনে হল, এই লোকটি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। আজ আমরা খাদ্য-বিচার করি, শ্রীকৃষ্ণের সময়ে খাদ্য-বিচার ছিল না। হতে পারে তাঁর বংশধরেরা পূর্ব নিয়ম বজায় রেখেছে।

এখানেই আমার কৃষ্ণদর্শন শেষ হল না, পরের দিন সকালে বৃন্দাবনে চলে গেলাম এবং কোনো হোটেলে না-থেকে এক ব্রজবাসীর বাড়িতে থাকলাম। বিকেলে, গোবিন্দজির বিধ্বস্ত মন্দির দেখে বড়ই দুঃখ হল। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শ্রীকৃষ্ণ যিনি কুরুপাণ্ডবের বংশ সেই সঙ্গে যাদবকুল ধ্বংস করেছিন, তাঁর নামের যে-মন্দির, ঔরঙ্গজেব সেটি ভেঙে ফেলেছেন। বড়ই পরিতাপের কথা।

তারপরই মনে হল ঔরঙ্গজেব খাঁটি মোঙ্গল। কালো লোকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা না-থাকারই কথা, অতএব তাঁর পক্ষে গোবিন্দজির মন্দির ভেঙে ফেলা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

মানব-জাতির সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাদা ও কালোতে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল। সেই সংঘর্ষ চলবে যে-পর্যন্ত উভয় জাত মিলে গিয়ে একত্ব প্রাপ্ত না-হয়। অর্জুনের মতো লোকও যে বর্ণ সংকরের ভয়ে ভীত ছিলেন, সে-সংবাদ আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের কথামালার মধ্যে পেয়েছি। বর্তমানেও তার ঢেউ চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মার্কিন মুলুকে। এখনও শ্রীকৃষ্ণের কর্ম শেষ হয়নি। এখনও আমরা দশ হাজার বছর পেছনেই পড়ে আছি।

বৃন্দাবনের প্রধান প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল ভক্তি-চিন্তাধারার প্রভাব এবং সেইসঙ্গে সাদা ও কালোর সংমিশ্রণ। শ্রীরাধা সাদা, শ্রীকৃষ্ণ কালো, এই নিয়েই গানের ও কবিতার সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের দেশের কীর্তন সকল ভাবপ্রবণতাকে ছাড়িয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ

হয়েছে বলতেই হবে। আমরা গানে 'ওস্তাদ' ও লেকচারে 'ওরেটার' কিন্তু কাজে পশ্চাৎপদ, এই-যা গুণ!

উত্তর ভারতের সর্বত্র স্ত্রীলোক ও পুরুষদের মধ্যে দূরত্ব বেশ অনভূত হয়। যদিও উভয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ, তবুও হিমালয়ের মতো পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত যেন উভয় শ্রেণির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু বৃন্দাবনে সেরূপ কিছুই মনে হয় না। গ্রাম্য লোকের মধ্যে পর্দা-প্রথা যেমন নেই, তেমনি ব্যভিচার আছে বলেও মনে হয় না।

সন্ধ্যার পর কয়েকটি কুঞ্জে গিয়েছিলাম। যাবার পূর্বে মনে করেছিলাম সেখানে গিয়ে বন-উপবন-শোভিত কুঞ্জ দেখতে পাব। আসলে সেরকম কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। কুঞ্জ মানে একটি মন্দির। বসবার স্থান প্রশস্ত, সামনেই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। শ্বেতপাথরের রাধার মূর্তিতে সজীবতা মোটেই অনুভব হয় না। কালো পাথরের কৃষ্ণ-মূর্তিতে বেশ লাবণ্য দেখতে পাওয়া যায়। শ্বেতপাথর দিয়ে শ্রীরাধার মূর্তি যতগুলি দেখেছি, সর্বত্র একই নির্জীবতা চোখে পড়ে। যদি একটু হরিদ্রাযুক্ত পাথর দিয়ে শ্রীরাধার মূর্তি গড়া হত তাহলে সম্ভবত ভালোই হত।

প্রত্যেকটি কুঞ্জে ভক্তি-রসের চর্চা করা হয়— কোথাও গানে, কোথাও কথকতায়, আবার কোথাও পদ্যে। গুণগ্রাহীরা শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বিষয়বস্তুকে এতই ফাঁপিয়ে তুলেছেন যে আসল কৃষ্ণের কথা পরিত্যাগ করে নতুন আর এক কল্পিত কৃষ্ণের কথাই বলা হয় বেশি করে। এটা ভাষার দোষ নয়, কথকতার দোষ নয়, এই দোষ ভক্তিমার্গের। ভক্তি দুর্বলতার চিহ্ন, অবাস্তবই হল তার মূল ভিত্তি। এক্ষেত্রে সমালোচনা বৃথা।

কুঞ্জ বেড়িয়ে আসার পথে পথচারীর কথা শুনে মনে হয়েছিল, যতক্ষণ এঁরা মন্দিরে থাকেন ততক্ষণই ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেন।

বৃন্দাবনের অলিগলি পথেও বেশ আনন্দই হয়েছিল। এটা বোধহয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে মেলামেশা করারই সুফল। বৃন্দাবনে রাত দশটার পরও দলে দলে স্ত্রীলোককে বেড়াতে দেখা যায় কিন্তু কোথাও কোনো যুবতীর পেছনে যুবকদের ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল না। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন পিকিং-এ থাকতে স্বাধীনতার কথা বলতেন, তখন তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার নিদর্শনস্বরূপ বৃন্দাবনকে দেখিয়ে দিতেন। বৃন্দাবনে এসে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখতে পেয়ে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। বৃন্দাবনের তথাকথিত ছোটলোকেরা সেজন্য ধন্যবাদের পাত্র।

বেনে শ্রেণির লোকের মধ্যে কয়েকজন উন্মত্ত যুবক দেখেছি। তাদের উন্মত্ততা তথাকথিত ছোট জাতের লোক দেখলেই লোপ পায়; কারণ তারা নিজের হাতে আইনের মানদণ্ড গ্রহণ করে এবং আধ-পাগলা ব্যবসায়ী পুত্রদের 'গাঁট্টা' মেরে ঠান্ডা রাখে। বৃন্দাবন পানিপথ নয়। পানিপথের কথা পরে বলা হবে।

বৃন্দাবনের আর-একটি বৈচিত্র্য রয়েছে। দু-টুকরো কাঠের মধ্যে তাল উঠিয়ে সেই তালে তালে নৃত্য করা শুধু বৃন্দাবনেই দেখা যায়। গান তাতে নেই, কিন্তু এমন প্রাণমাতানো নৃত্য অনেক সময় বিদিশা করে দেয়! অবশ্য বিদিশা হবার মতো অনুভূতি থাকা চাই। শরীরের উত্তপ্ত রক্ত বড়ই তাল পছন্দ করে। রক্ত সজীব ও চলন্ত; সেই সজীব ও চলন্ত রক্তস্রোতে খঞ্জনি যখন তরঙ্গের সৃষ্টি করে তখন মনে হয়, হাজার বোতল মদের নেশা ওই খঞ্জনিতে জমাট বেঁধে আছে!

বৃন্দাবনে আসার পর একদল লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাঁরা আমাকে মোরাদাবাদ যেতে অনুরোধ করেন এবং সেখানে যাবার রেলভাড়া দিয়ে দেন। আমার রেলভাড়া দ্বিগুণ; কারণ বাইসাইকেলের ভাড়া একজন মানুষের ভাড়ার সমান ছিল।

বৃন্দাবনের 'প্রেম মহাবিদ্যালয়' একটি বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্র। এই শিক্ষাক্ষেত্রের স্থাপয়িতা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বিপ্লবীর খাতায় নাম লিখিয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর স্টেট সরকারি তরফ থেকে পরিচালিত হত এবং তাঁরই এক ছেলেকে ব্রিটিশ সরকার গদিতে বসিয়েছিলেন।

বৃন্দাবন আরামের স্থান ছিল বটে, কিন্তু কী এক কারণে এখানে বাঙালি, পাঞ্জাবি ও মারাঠি গুপ্তচরের বিশেষ উৎপাত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে সংযুক্ত প্রদেশের অন্য কোনো শহরে তত স্পাই দেখতে পাইনি যত স্পাই এই ধর্মস্থান বৃন্দাবনে দেখতে পেয়েছিলাম। অপরিচিত লোক আমার কাছে সকলেই, কিন্তু বিশেষ পরিচিত লোককে যেন ভুলে গিয়েছিলাম! সেরকম লোক আমার চারদিকে ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের কল্যাণে এখানে চা-বিস্কুট খেয়ে বড়ই তৃপ্ত হয়েছিলাম।

**মোরাদাবাদ**

তিনদিন বৃন্দাবনে কাটিয়ে আবার মথুরাতে গিয়ে গাড়িতে বসলাম, উদ্দেশ্য মোরাদাবাদ যাওয়া। দেখলাম ও বুঝলাম, কেউ আমার পেছন নেয়নি। নিশ্চিন্ত মনে মোরাদাবাদ পৌঁছে একটি

ধরমশালায় আশ্রয় নেবার পরই একজন যুবক কোথা থেকে এল এবং আমার পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করল। বুঝলাম, এদেরই কেউ আমাকে এখানে আসার খরচ দিয়েছিল।

সন্ধ্যার পর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সেদিনের ডায়েরি লিখছিলাম, এমন সময় তিনজন লোক এলেন এবং নিজেদের বিছানা পেতে বসে পড়লেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল, চিন দেশের কমিউনিস্টরা কী করে মানুষের সহানুভূতি অর্জন করেছে?

আমি বললাম, "এর উত্তর অতি সহজ বন্ধুগণ! চিনা সৈন্যদের মধ্যে সহানুভূতি বলে যে-সদ্‌গুণ, তা মোটেই ছিল না। তারা লুণ্ঠন করত, লোককে হত্যা করত, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিত। কিন্তু চু-তের সৈন্য গ্রামে প্রবেশ করেই দেখত মানুষের অভাব কোথায়? অভাব মিটিয়ে দেবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করত। যেমন, এক গ্রামে গিয়ে তারা দেখল অনেকের ঘরের চাল ভেঙে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ তারা ঘর-মেরামতে লেগে গেল, কেউ কেউ চলে গেল জমির মাটি ওলটপালট করতে। যারা তাঁতের কাজ জানত, তারা লেগে যেত তাঁতের কাজে।

"গ্রামের লোক দেখত এরা চমৎকার লোক, দুই ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের চেহারা বদলে দিল! এই করেই চিনের চু-তে সাধারণের সহানুভূতি অর্জন করেছেন।"

এইমাত্র বলেই আমি চুপ করলাম। যাঁরা আমার কথা শুনতে এসেছিলেন, তাঁরাও চুপ করতে বাধ্য হলেন। "সিপাই থা" এই কথাই তাঁরা একটু পরে বলতে আরম্ভ করলেন। দুঃখের বিষয়, তখনকার দিনে মাঝে মাঝে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় চিন সম্বন্ধে দু-একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হত; কিন্তু সেসব পড়ে চিনের আভ্যন্তরিক অবস্থা কেউ বুঝতে পারত না।

তার পরের প্রশ্ন, "সাধারণ লোক কী করে সময় কাটায়?"

"এরও উত্তর অতি সাধারণ। যেমন করে আমরা দিন হবার পর রাত কাটাই তেমনি করে তারাও সময় কাটায়, তবে দৃষ্টির পার্থক্য রয়েছে। আমরা যেমন করে ভাগ্যদেবীর আরাধনা করি, হাত দেখাই, সৌভাগ্য কবে আসবে জানতে চাই, চিনের লোক তা করে না।"

আমার কথা এঁদের মোটেই ভালো লাগল না, উঠে চলে গেলেন। আমিও স্নান করতে বেরুলাম। স্নানান্তে ডাল-রুটি খেয়ে অন্যান্য দিনের মতো ঘুমিয়ে রইলাম। রাত তখন দশটা হবে, এমন সময়ে হঠাৎ একজন কেরানি এলেন। তিনি ধরমশালায় কে কে এসেছে, কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে, জানতে চাইলেন। তাঁকে উত্তর দিয়ে, ফর্মে নাম দস্তখত করে আবার শুয়ে পড়লাম।

পরের দিনও থাকতে হল। যাঁরা গাড়িভাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের আদেশ। বারোটার পর ধরমশালা থেকে বের হলাম এবং কংগ্রেস-অফিসে গিয়ে বসলাম। কংগ্রেস-অফিসে যাওয়া মহাবিপজ্জনক কাজ। কংগ্রেস-অফিস তখন সকলের অর্থাৎ সকল রকম মতাবলম্বীর। পুলিশও কংগ্রেসকর্মী হয়ে কংগ্রেস-অফিসে ঘোরাফেরা করত। সেখানে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হল। অনেকে ভ্রমণ-কথা শুনতে চাইলেন। কিছু না-বললে চলে না, তাই বললাম কিছুটা। এদিককার মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকই কংগ্রেসের কাজ করছিলেন। ধনীরা একেবারে পাঁচ হাত দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন।

মোরাদাবাদ কংগ্রেস-অফিস বড়ই উত্তেজনাপূর্ণ; সেখানে বিপ্লবী, ভাবুক, সমাজসেবী, ধার্মিক ও কমিউনিস্ট— সকলেরই একত্র সমাবেশ দেখে রাজনীতির গুরুত্ব অতি অল্পই অনুভব হয়েছিল।

রাজনীতিতে ধর্মপ্রচারক অথবা সমাজসেবীর স্থান থাকতে পারে না। কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদের একত্র সমাবেশও অর্থহীন। উভয়ের গতিপথ ভিন্ন রকমের। বিপ্লবীদের সম্পর্ক সাধারণ মানুষের সঙ্গে কম থাকে, কমিউনিস্টরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকে। বিপ্লবী সাময়িক, কমিউনিস্ট চিরন্তন। এদের একত্রে ওঠাবসা দেখে হাসি পেয়েছিল, কিন্তু কারো কাছে কিছুই বলতে সাহস হয়নি। এটা যেন একটা আড্ডা অথবা জগাখিচুড়ি!

কমিউনিস্ট মতাবলম্বীদের প্রতিই রাগ হয়েছিল বেশি, এরা যেন শখের বাক্যবাগীশ! তাদের মিলনস্থান হবে সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে। অতি বিপ্লবী, অতি দেশভক্ত, অতি ধার্মিক— এদের পাশ দিয়ে চলাফেরা করতেও কমিউনিস্টদের দেখা যায় না, তবে কেন এরা এখানে আড্ডা গেড়েছে? এইরকম নানা চিন্তায় মনটা দমে গিয়েছিল। সেই সভাতেই বলে এলাম, আগামীকাল সকালে এখানে থেকে বিদায় নেব। কেউ আপত্তি করল না অথবা আর একদিন থাকতেও বলল না।

মোরাদাবাদ থেকে গাজিয়াবাদ পৌঁছতে মাঝে একদিন থাকতে হয়েছিল। গাজিয়াবাদ থেকে কয়েক মাইল পথ বালির ওপর দিয়ে চলতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, পথের দু-দিকে নলের আবাদ ছিল। পথের ওপর নল ভেঙে পথ চলতে যে

কত কষ্ট, সকলে তা বুঝতে পারবে না। সেজন্য দিল্লিতে পৌঁছে দুটো দিন শুধু শুয়ে থেকেই শরীরের অবসাদ দূর করতে হয়েছিল।

**দিল্লি**

বিকেলে যখন দিল্লির দিকে যাচ্ছিলাম তখন একদল গোয়ালা সাইকেলে করে দুধ নিয়ে দিল্লির দিকেই আসছিল। আমিও তাদের সঙ্গেই চলছিলাম।

আমাদের দেশে জাত-বিচার থাকায় গোয়ালাদের বাইসাইকেল ব্যবহার করা দেখে অনেকের চোখ টাটাচ্ছিল। পথের পাশে এক 'চানা ভাজার' দোকানি আমাকে সে-কথাই বলছিল।

দোকানি জাতে ক্ষেত্রী। সে বলছিল, "কী আর বলি বাবু, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে! আহির দুধ বিক্রি করছে, গোয়ালা সাইকেলে শহরে যাচ্ছে, আরো কয়েক বছর পরে দেখব চামার পালকিতে করে রাজপথে ভ্রমণ করছে!" ক্ষেত্রী মানে যে চাষা হয়, ক্ষেত্রী নিজে তা জানত না, সে মনে করত ক্ষেত্রী মানে ক্ষত্রিয়।

ক্ষেত্রীর উক্তি শুনে তাকে কিছুই বলিনি, শুধু মনে হচ্ছিল এটাই আমার দেশ, এই দেশে থেকে শুধু বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের মনোবৃত্তি অপসারণ করে সেই মনোবৃত্তিকে পরিবর্তন করতে হবে। বিপ্লবই বুঝতাম ভালো, সেইজন্য বিপ্লবের কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, "Long Live Revolution" মানে কী!

স্বাধীন হয়ে যাওয়া, আর্থিক উন্নতি করা, সবই হয় বিপ্লবের সাহায্যে; কিন্তু মানসিক পরিবর্তনের বিপ্লব ভয়াবহ ও কঠিন। ১৯০৮ সালে "চাকরের কৃপায় চীনের মুক্তি" নামক প্রবন্ধে ঁমহেন্দ্রনাথ দে, এম-এ, বি-এসসি, লিখেছিলেন, "Depressed Class-এর উন্নতি করতে ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশেও দুই শত বৎসর লাগবে।"

ইংল্যান্ডে গিয়ে ডিপ্রেস্‌ড ক্লাস কোথায় রয়েছে এবং তারা কোন্ পর্যায়ের মনোভাবে বিরাজ করছে জানতে চেয়েছিলাম। জেনেছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম ঁমহেন্দ্র দে মহাশয় যা বলেছিলেন, তার সবটাই ঠিক। ইংল্যান্ডের ধনীরাই হল আভিজাত্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং দারিদ্র্য হল তার অন্যদিক। আমাদের দেশে সেরকম নয়, আমাদের দেশের অবস্থা পৃথক।

আমেরিকাতে যাবার পর একজন সিলেটি মুসলমান বলেছিলেন, "দেশে যাব কেন বাবু? এখানে তবুও আমি মানুষ বলে পরিচিত; কিন্তু স্বদেশে যদি আমি এক কোটি টাকা নিয়েও ফিরে যাই তবু আমার পরিচয় 'গোলামের ছেলে' ছাড়া আর কিছুই হবে না। 'গোলামের ছেলে' শোনার মতো মনোবৃত্তি আর নেই। দেশে ফিরে যাব না, মরতে হয় বিদেশে মরব, উপবাস করে মরব তবুও দেশে ফিরব না।"

চানা ভাজা খেয়ে ক্ষেত্রীর দোকান থেকে সোজা কাশ্মীরি গেট দিয়ে চাঁদনি চক হয়ে কয়েকজন বাঙালি যুবকের সহায়তায় একটি বাঙালি মেসে পৌঁছলাম। মেস পুরনো এবং দিল্লির অন্তঃস্থলে অবস্থিত থাকায় সুবিধা হয়েছিল। দিল্লির পুরনো মসজিদ, সম্রাটের প্রাসাদ, ঐতিহাসিক তথ্য নতুন করে জানবার মতো ইচ্ছা না-থাকায় কয়েকদিন মেসে বিশ্রাম করাই ভালো হবে মনে করেছিলাম।

এর পরেই ইচ্ছা হল দিল্লি শাখার গদর পার্টির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে। এঁদের কথা শোনবার জন্যই এসেছিলাম। এঁরা ধর্মীয় পার্থক্য কতটুকু পরিত্যাগ করতে পেরেছেন, বৃহত্তর স্বার্থ কতটুকু বোঝেন ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম। আমি ভারতবাসী, যদি নিজের দেশের সংবাদ না-জানি তাহলে বিদেশে গিয়ে কী বলব?

মহাত্মা গান্ধীকে লর্ড উইলিংডন জেলে পুরেছিলেন এবং কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতাই তখন জেলে ছিলেন। বাংলার 'টেররিস্টদের' প্রতি কড়া পাহারা ছিল। কমিউনিস্টদের নাম-নিশানাও তখন ছিল না। উইলিংডন এক নতুন রামরাজত্ব স্থাপন করেছিলেন!

তখন বাংলার টেররিস্ট নেই কিন্তু বাঙালি স্পাই-এ শহর ছেয়ে গিয়েছিল। যেখানে যেতাম, এক কি ততোধিক যুবক সব সময়ই আমার সঙ্গে চলত। তাদের অর্থে চা-বিস্কুট থেকে আরম্ভ করে সিনেমা পর্যন্ত উপভোগ করতাম। মেসের খরচও বিনা পয়সায় চলছিল। চারদিকেই তখন সুখের রাজত্ব। বাঙালি মাত্রেই আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত। বাঙালি-ক্লাব ছিল নাম্বার ওয়ান আড্ডাখানা। তাস, পাশা, দাবা অনবরত চলছিল। কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত বাইসাইকেলে করে অনেক বাঙালি যুবক পৌঁছেছিলেন। তাঁদের নিয়েও বেশ আমোদ-প্রমোদ চলছিল।

যদি বুঝতাম এটা ভাঁওতা, লর্ড উইলিংডনকে হত্যার ফাঁদ মাত্র, তাহলে সুখীই হতাম; কিন্তু এটা সত্যিকারের আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গান আর হল্লা। পশ্চিমা শিখ, হিন্দু আর মুসলমানরা বেশ আনন্দে মগ্ন ছিল এই ভেবে যে, বাঙালিবাবুরা দেশ স্বাধীন করবে। এদিকে গুরুদ্বারে শিখ-সম্প্রদায় চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

তাদের ধর্মীয় উস্কানি দিচ্ছিল স্টেট্‌স্‌ম্যান; লাহোরে মুসলমানদের উস্কানি দিচ্ছিল সিভিল ও মিলিটারি গেজেট। নন-কোঅপারেশন মুভমেন্ট অনেকটা শিথিল হয়েছিল, লোকের মনে আর উদ্দীপনা ছিল না। মিঃ জিন্না কংগ্রেস থেকে বের হয়ে মুসলিম লিগ গড়েছিলেন। লর্ড উইলিংডন তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাজিমাত করছেন ভেবে সকলেই উৎফুল্ল ও আনন্দিত ছিলেন।

আঘাত এবং প্রতিঘাত দুটি শব্দ আছে। পৃথিবীর যে-কোনো জাতের ইতিহাস পড়লেই এই সত্য বুঝতে পারা যায়। সামান্য আঘাতের পরেই প্রচণ্ড আঘাত আসবে, তার ফল ভবিষ্যতে আরও প্রচণ্ড হবে। ব্রিটিশ সরকার তা বুঝতে পেরে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

বেঙ্গলি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। চাঁদনি চকে একটি বাঙালির সন্দেশের দোকানে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতাম। সেখানে অনেকগুলি পাঞ্জাবি আসত। তাদের মধ্যে উৎপীড়িত রাজনীতিকের সংখ্যাই বেশি। একদিন বাঙালিবাবুটি, যিনি দোকানের মালিক, আমাকে সন্দেশ খেতে নিমন্ত্রণ করলেন এবং আমার পরিচয় দেবার সময় যে-দেশ ভ্রমণ করে এসেছিলাম তার ফিরিস্তি উচ্চকণ্ঠে সকলকে পড়ে শোনাতে কসুর করেননি।

এই ঘটনার পরই আমার সঙ্গে পাঞ্জাবিরা কথা বলতে আরম্ভ করেছিল। এদের অতি উৎসাহ, অল্প জেনে সবজান্তা এবং ব্রিটিশ সরকারকে কাবু করতে কতক্ষণ— এসব ফাঁকা কথা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। এদের দৃষ্টি ছিল জাপানের দিকে। জাপান এদের স্বাধীনতা এনে দেবে, জার্মানি সাহায্য করবে ইত্যাদি মনোবৃত্তি মনে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল।

যারা জাপান দেখেনি বা জাপানিদের ইতিহাস জানে না, তারাই এরকম মনোভাব পোষণ করে। একদিন এদেরই একজনকে গোপনে বলে দিলাম, ব্রিটিশ সরকার যেমন সাম্রাজ্যবাদী, জাপানিরা তেমনি উগ্র সাম্রাজ্যবাদী (National Socialist)। জাপানিরা ইংরেজদের চেয়ে একচুল কম সাম্রাজ্যবাদী নয়।

যাঁর কাছে কথা বলছিলাম, তিনি ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট কাকে বলে অথবা উগ্র সাম্রাজ্যবাদী কী, কিছুই জানতেন না। তখন বাধ্য হয়ে বোঝাতে হয়েছিল উগ্র সাম্রাজ্যবাদী আর ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট একই কথা। তবুও লোকটার মনোভাব একটুও পরিবর্তিত না-হতে দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম। ক্রমে ক্রমে এদের আড্ডায় যাওয়াও বন্ধ হয়েছিল। আমার যা জ্ঞাতব্য বিষয় তা-ই জেনে তৃপ্ত হয়েছিলাম।

শরীর তখনও দুর্বল ছিল; কয়েকদিন পূর্ণ বিশ্রামের পর নতুন দিল্লিতে এক ভদ্রলোকের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখানে বিশ্রাম উত্তম রূপেই হয়েছিল।

পূর্বেই বলেছি, পুরনো ইমারত, দিল্লির বাদশাহের প্রাসাদ আমার কাছে তামাশার বিষয় ছিল। পিকিং যাঁরাই দেখেছেন তাঁদের কাছে লালকেল্লা আর সম্রাটের প্রাসাদ হাস্যকর বলেই মনে হবে। দিল্লির জুম্মা মসজিদ দেখিয়ে অনেকে বলেন, এত বড় বিল্ডিং পৃথিবীতে ক'টা আছে? পিকিং-এর 'ফরবিডেন্ সিটির' 'হেভেন টাওয়ার' এর চেয়ে বড় বলেই মনে হয়। পৃথিবীর পুরনো বিল্ডিঙের কিছু দেখেছিলাম বলেই তুলনা করতে সক্ষম হলাম।

দিল্লি ছেড়ে যাবার সময় হল। একদিন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পানিপথের দিকে রওনা হলাম। দিল্লির আভিজাত্য আমাকে আটকে রাখতে পারল না। মাঝে মাঝে মনে পড়ত একটা ফারসি কবিতা। একজন গাইড বলেছিল, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে এখানে আছে। কবিতাটা ফারসি ভাষায় দিল্লির কোনো দেওয়ালে লেখা আছে, তারই অনুবাদ করে সে আমাকে শুনিয়েছিল। তখনকার দিনের পক্ষে বোধহয় এটাই ছিল স্বর্গ। এই ধরনের কথা মনে হলেই আপনা থেকে হাসি পেত আর ভাবতাম, কবি ঠিকই বলেছেন, Ignorance is bliss.

দিল্লি থেকে রওনা হয়ে সোনেপথ নামক স্থানে এসেই বসলাম একটি মস্ত বড় দিঘির ধারে। লোকজন নেই। আশেপাশে একটি গ্রামও দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, এই দিঘির বাঁধানো ঘাটেই আজ বিশ্রাম করা যাবে, স্নানেরও বেশ সুবিধা রয়েছে। প্রথমে স্নান করে সিঁড়িতে বসে প্রায় ধ্যানমগ্ন হতে যাচ্ছিলাম। এখানে 'ধ্যান' কাকে বলে বলছি। যাকে আমরা বলি গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাকেই বলা হয় ধ্যানমগ্ন।

ঠিক সেই সময় এক সাধু আমাকে ডাকলেন। সাধু মানেই পরনির্ভরশীল, এর আবার ডাকাডাকি কিসের? তবুও জিজ্ঞাসা করলাম, "কী চাই? তোমার পর্ণকুটিরে চা পাওয়া যাবে কি?"

সাধু সহস্য বদনে বললেন, "সব ঠিক, শুধু তুমি এলেই হয়।"

গেলাম সাধুর ঘরে, দেখলাম চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। একটি পেয়ালা দেখিয়ে সাধু বললেন, "এটা তোমার, অন্যটা আমার।" উভয়ে চা খাবার পর সাধুকে একটি সিগারেট দিয়ে বললাম, "নিন, এটা আপনার।" সাধু সিগারেট নিয়ে,

সিগারেটের কাগজটা ফেলে দিলেন, তামাকটুকু মুখে দিলেন। বুঝলাম এটাই হিন্দুস্থানিদের প্রথা।

সিগারেট ফুঁকবার সময় চিন্তা করছিলাম এখানেই মোঙ্গল, পাঠান, রাজপুত, মারাঠারা যুদ্ধ করেছিল, বোধহয় এখানেই কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। সবই 'বোধহয়'-এর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সঠিকতা একটুও অনুভব করতে পারছিলাম না। সাধুও আনমনে কী চিন্তা করছিলেন! হঠাৎ সাধু বললেন, "তুমি বড়ই কামুক।"

আমি হেসে ফেললাম ও বললাম, "কৃষ্টিতে আবদ্ধ কামকে কামনা বলে, কাম নয়। আমার তা-ই আছে, এসব বাজে কথা বলে লাভ হবে না সাধু মহারাজ!"

আমার হাতের মধ্যে এমন কতকগুলি চিহ্ন আছে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না, যেমন ভ্রমণ-চিহ্ন কামনা-চিহ্নকে একেবারে কেটে রেখেছে।। বোধহয় সাধু মহাশয় সেই চিহ্ন দেখেই বাহবা অর্জন করতে চাইছিলেন। চা খেতে ডেকে আনাও ফন্দিবিশেষ। ভাবছিলেন, একেবারে শিষ্য করে ফেলবেন; কিন্তু আমার মানসিক অবস্থা অন্য স্তরে চলে গিয়েছিল, সাধু মহাশয় তা অবগত ছিলেন না।

একটি টাকা দিয়ে বললাম, "ডাল-রুটির ব্যবস্থা করুন মহারাজ, ভোজন-পর্ব এখানেই সমাপ্ত করা যাবে।" একটি টাকা পেয়ে সাধু খুশি হলেন এবং ভোজনের ব্যবস্থা আরম্ভ করলেন।

বিকেলে সাধুদের জমায়েত আরম্ভ হল। সাধুদের বাক্যালাপ কী হয় শোনবার জন্য উৎসাহী হলাম। আগন্তুক সাধুরা রোতক জেলার অনেক স্থান পরিভ্রমণ করে এসেছেন। কেউ বললেন, হনুমানজির সাক্ষাৎ পেয়েছেন; কেউ বললেন, অশ্বত্থামার দর্শন মিলেছিল এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনকারী সাধুর সংখ্যাই বেশি। গঞ্জিকার কলকি হাতে হাতে ঘুরতে থাকল। অনেকক্ষণ পরে রুটি আর ডাল রান্না করে ভোজনপর্ব সমাপ্ত করা গেল।

এরকম জীবনকেই ভবঘুরে জীবন বলা যেতে পারে। চিন্তাভাবনা মোটেই নেই; শুধু খাওয়া, ঘুমোনো আর ভিক্ষা করা। সাধুদের সঙ্গে রাত আরামেই কেটে গেল। পরের দিন সকালে পানিপথের দিকে রওনা হবার পূর্বে সাধু আমাকে আশীর্বাদ করতে এলেন। তাঁর আশীর্বাদ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "এসব বুজরুকি অন্যের সঙ্গে করবেন, এই নিন দু-আনা পয়সা।"

সাধু দু-আনা পয়সা নিয়ে সন্তুষ্ট হলেন। কবি মুকুন্দদাস বলেছিলেন, "আশীর্বাদ মানেই 'আশীর্বাদং শিরশ্ছেদং বংশনাশং দিনে দিনে'!"

**পানিপথ**

সেদিনই বিকেলে পানিপথে পৌঁছে একটি ধরমশালাতে আশ্রয় নিলাম। ধরমশালা জৈনদের এবং সেখানে তিনরাত থাকতে দেওয়া হয়। দারোয়ান চারপাইয়ের উপর জাজিম বিছিয়ে দিল। তার ধারণা, আমি দারোগা সাহেব। আমিও নিজের পরিচয় দেওয়া ভালো মনে করলাম না। আমার সঙ্গে চাদর থাকত। জাজিমের উপর চাদর বিছিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছি, এমন সময় স্থানীয় টেকনিক্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধরমশালায় এলেন।

তিনি জাতে বাঙালি। আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, "চলুন আমার বাসায়।" তাঁর বাসায় যেতে সম্মত হলাম কিন্তু রাত কাটাব না জানালাম। রাত্রে তাঁর ওখানেই খেলাম এবং পরের দিনও যেন থাকি অনুরোধ করলেন, সেইসঙ্গে বললেন, এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে।

ধরমশালাতে ফিরে আসামাত্র কয়েকটা দৃশ্য দেখে মনে হল স্থান ভালো নয়, তবুও থাকতেই হবে। রুমে গিয়ে এত গরমের মধ্যেও দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে রইলাম। পানিপথ কামনার স্থান। কত রাজা, সম্রাট, বাদশা নিজের কামনা পূর্ণ করবার জন্য এইখানেই নিজেদের রক্ত দিয়েছেন! কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধও এখানেই হয়েছিল। সেই যুদ্ধভূমিতে কামান্ধ মানুষের সমাবেশ যদি হয় তবে দুঃখের কোনো কারণ নেই।

পরের দিন দশটার সময় একটি ছাত্র এল। সে বলল, তার মাষ্টার মহাশয় আমাকে নেবার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন। সাইকেল নিয়ে বের হতে যাব এমন সময় ছাত্রটি বললে, "হেঁটে যাবেন, আমি সাইকেল নিয়ে আসিনি।"

রুমের মধ্যে সাইকেল রেখে তালা বন্ধ করে ছাত্রের সঙ্গে রওনা হলাম। ছাত্র আমাকে নিয়ে চলল পেছনের গলি দিয়ে। প্রতিবাদ করায় সে বলল, "এটা শর্টকাট রোড দিয়ে চললাম।"

প্রায় প্রতিটি বাড়ির পেছন দরজাতেই পাঠান দারোয়ান। দুর্গন্ধময় পথে চলতে মোটেই ইচ্ছা হল না। অবশেষে ছাত্রটিকে বললাম, "বড় পথ দিয়ে চলো। একটু বেশি হাঁটব তাতে ক্ষতি কী?" ছাত্র সম্মত হল, আমরা বড় পথ ধরে বিদ্যালয়ে গেলাম।

মুখার্জি মহাশয়কে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী হয়েছে?" তিনি বললেন, "তেমন কিছু হয়নি, বিকেলের চা খাওয়া আমার ঘরে হবে না, আপনাকে এই ছাত্রটিই

চা খেতে নিয়ে যাবে।"

আমার ধারণা হল, তিনি বোধহয় পানিপথ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শুনে খুশি হননি। কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় আর কী হতে পারে?

দ্বিপ্রহরে তাঁর বাড়িতে খেয়ে বেলা তিনটের সময় একটি চায়ের দোকানে গেলাম। দোকানের সামনেই লেখা রয়েছে, "গোমাংসের কাবাব এখানে বিক্রি হয়।" উর্দু আমি জানি না, ছাত্রটি জানত। দোকানের সামনে এসেই বলল, "এই দোকানে গোমাংসের কাবাব বিক্রি হয়, ওই দেখুন লেখা রয়েছে।"

"তুমি জানো আমি গোমাংস খাই না; তাহলে কেন এখানে নিয়ে এলে?" ছাত্রকে বললাম।

"মাষ্টার সাহেবের আদেশ, চলুন ভেতরে যাই।" ছাত্রটি আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

দেখলাম, যারা খাচ্ছে সবাই লালা শ্রেণির লোকের ছেলে এবং বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে যাচ্ছে। তখন বুঝতে পারলাম ব্যাপার কী এবং কেন মুখার্জি মহাশয় আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

ছাত্রকে বললাম, "তুমি এখন যেতে পারো, আমি এখানে চা খেয়ে সোজা ধরমশালায় যাব। হেডমাষ্টার মহাশয়কে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।"

ছাত্রটি চলে গেল। অনেকক্ষণ বসে চা খেলাম এবং হিন্দু ছেলেদের তৃপ্তির সঙ্গে গোমাংসের চপ-কাটলেট আর কাবাব খেতে দেখে তার কারণ নির্ণয় করে নিলাম। মুখার্জিকে বলেছিলাম, নৃতত্ত্ব অবগত আছি। সেই নৃতত্ত্বে কতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তারই পরীক্ষা নেবার জন্য সন্ধ্যার পূর্বেই মুখার্জি এলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেমন আছি, মনের অবস্থা কীরকম এবং আগামীকাল এখান থেকে রওনা হব কি না।

উত্তরে বললাম, "আগামীকাল সকালে নিশ্চয়ই রওনা হব এবং যা দেখলাম তাতে মনে হয়, এটা নৃতত্ত্ব নয়, অন্য কিছু। নৃতত্ত্বের সঙ্গে রক্তের বিশ্লেষণের সম্বন্ধ রয়েছে, এটা যে খাদ্য নিয়ে কথা!"

মুখার্জি বললেন, "এটা আরো কঠিন সমস্যা, সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত নয়। আজ আপনি ভাত খাচ্ছেন না, এক বছর কিংবা দশ বছর না-ও খেতে পারেন; কিন্তু ভাতের প্রতি আপনার আগ্রহ থাকবেই। মাংসও তদ্রূপ সংস্কারের বহির্ভূত, রক্তের প্রভাবের সঙ্গে সংযুক্ত।"

আমি বললাম, "না মহাশয়, এটা নিতান্ত বাজে কথা, রক্তের প্রভাব শুধু শরীরেই দেখা যায়। সংস্কারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, এর একটি চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দেখেছি। একটি তামিল শিশুকে একজন চিনা মহিলা ছোটবেলা থেকে প্রতিপালন করেন। সে চিনা ভাষা বলত; চিনা খাদ্য যদি কেউ তাকে দিত তবে বেশি খেতে পারত না।

"এই ক্ষেত্রে রক্তের প্রভাব নেই, রয়েছে সংস্কার মাত্র। ছেলেবেলা থেকে যে-ভাষায় এবং যে-খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়া যায়, সেই অভ্যাস পরেও থেকে যায়। কিন্তু তামিল ছেলে কোনো মতেই তার শরীরের রং চিনাদের শরীরের রঙের মতো করতে পারবে না। এতগুলি কুদৃশ্য দেখিয়ে আপনার মতবাদ কোনো মতেই সফল হল না; তবু যা দেখিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

"এটা পানিপথ এলাকা, এখানে ব্যভিচার, বীভৎসতা হবেই। এই জায়গা যুগ-যুগান্তরের লালসা-তৃপ্তির স্থান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধ পর্যন্ত ছোট-বড় সকলেই এই মহান ক্ষেত্রে আত্মবলিদান করে নিজের ভোগ-বাসনার উপকরণ সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। বর্তমানে এখানে যারা বসবাস করছে, তারা কেন আত্মচরিতার্থ করবে না?"

অধ্যাপক মুখার্জি বাঙালি, আমিও বাঙালি। মুখার্জি বই পড়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, আর আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি চোখে দেখে। পার্থক্য এখানেই। তিব্বতি দেবতাগুলির ছবি যখন চিনের অভ্যন্তরে দেখতে পেয়েছিলাম, তিব্বতি আর ককনরের লামাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখন থেকে তন্ত্র ও তান্ত্রিকদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হ্যাঁ, স্বীকার করি, মন্ত্রের প্রভাব আছে কিন্তু অপরের উপর সেই প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। নিজেকে বোবা করে রাখা চলে, তাতে নিজের ক্ষতি হয়, অপরের ক্ষতি হয় না। উপরন্তু সব কিছুর মধ্যেই যে অধ্যাত্মবাদ আত্মগোপন করে আছে, আমার তা মনে হয় না। তা-ই যদি হত, তবে অতি সহজে মালয়, শ্যাম আর ইন্দোনেশিয়া থেকে শৈবইজ্‌ম লোপ পেত না। মানুষ বুজরুকি ভালোবাসে যতক্ষণ প্রাচুর্য থাকে। প্রাচুর্যের অভাবে বুজরুকি লোপ পায়, মনের দুঃখে মুখার্জিকে একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। কুশিক্ষার মধ্যে প্রাচুর্য কুপথে নিয়ে যাবেই।

আটক নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত পাঞ্জাবি ভাষা প্রচলিত।

পাঞ্জাবি ভাষা শুধু শিখরাই গুরুমুখী অক্ষরে লেখে; যারা দেবনাগরী ও ফারসি অক্ষর ব্যবহার করে, তাদের কথ্য ভাষাই শুধু পাঞ্জাবি, লেখবার সময় হিন্দি ও ফারসি অক্ষরে উর্দুই লেখা হয়। দুঃখের বিষয়, পাঞ্জাবিরা তাদের মাতৃভাষা নিজের অক্ষরে লেখে না। বর্তমানে শিখরা যে-অক্ষরে গুরুমুখী লেখে সেই অক্ষরের অন্য সংস্করণই হল দেবনাগরী।

মুসলমানেরা পাঞ্জাবি অক্ষর ব্যবহার করে না, শিখদের প্রতি তাদের আক্রোশ আছে, সেইজন্য। তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পাঞ্জাবি অক্ষর ব্যবহার করে না, শিখদের প্রতি তাদের সহানুভূতি না-থাকার জন্য। শেষ কথা হল, ব্রিটিশ সরকারও পাঞ্জাবি অক্ষর স্বীকার না-করে পাঞ্জাবে ফারসি অক্ষরই স্বীকার করেছিল। প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান এবং সিন্ধের পুরনো পুস্তিকাগুলি দেখলেই পাঞ্জাবি অক্ষরের হদিশ পাওয়া যায়।

পানিপথ ছাড়বার পরই পাঞ্জাবিভাষীদের দেশে পৌঁছে গেলাম এবং নতুন আচার-ব্যবহারের দেখা পেলাম, এ-কথা আমাকে প্রথমেই স্বীকার করতে হবে।

**জলন্ধর**

জলন্ধরে পৌঁছে যে-ধরমশালায় স্থান নিয়েছিলাম সেটা রেল স্টেশনের সন্নিকটে এবং জি.টি. রোডের উপরে অবস্থিত থাকায় নানারকম লোকের দর্শন পাওয়া যায়।

তখনও বেলা একটা হয়নি, ধরমশালাতে প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম, একজন লোক অবিকল বাঙালি প্রথায় চালকলার নৈবেদ্য সাজিয়ে কোনো দেবতার নামে উৎসর্গ করে চলে গেল। চালকলার উপর লক্ষ লক্ষ মাছি বসে মুহূর্তের মধ্যে থালাটাকে কালো করে ফেলল। কতকক্ষণ পর লোকটা পুনরায় এল এবং বেশ করে চালকলা মেখে তা-ই খেয়ে নিল। কত রোগের বীজ-যে তাতে ছিল, নির্ণয় করা কঠিন।

এই চালকলা-মাখা খেয়ে লোকটার কী অবস্থা হয়েছিল তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ পরের দিন সকালে এমন এক গ্রামে বাস করতে গিয়েছিলাম যেখানে কোনো ধরমশালা ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাড়িতেই থাকতে হয়েছিল, তিনি আসলে আর্যসমাজী। গ্রামে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান বাস করে। এদের নিয়ম হল, প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমিতে মলমূত্র ত্যাগ করে। স্ত্রীলোকেরাও এই নিয়ম পালন করেন।

নিজের সাক্ষাৎ কাকাকে নাম ধরে ডাকা এবং পিতা-পুত্রে একই হুঁকোয় পালাক্রমে তামাক খাওয়া হিন্দুদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। যারা নিজের বাবার সাক্ষাৎ ভাইকে নাম ধরে ডাকতে পারে, তারা নিজের বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকবে তাতে বিস্ময়ের কী কারণ থাকতে পারে?

মুসলমানরা কিন্তু কাকাকে অথবা বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকে না, তারা আমাদের নিয়মই মেনে চলে। বর্তমানে আমরা এবং ভারতীয় মুসলমানেরা যেভাবে কাকা, বড় ভাই অথবা গ্রাম-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ডাকি, সেই নিয়ম প্রথমে ইরানে ফারসিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় পার্শিদের পূর্বপুরুষেরা ফারসি নামে দক্ষিণ পারস্যে পরিচিত ছিলেন। উত্তর পারস্যের লোক ফারসিদের পরাজিত করেন এবং তাঁদের দেশ জয় করেন। এটাই ইতিহাস, সেই ইতিহাসের ক্ষয়িষ্ণু প্রতিভা এখনও সুদূর উত্তর ভারতবাসীরা মেনে চলেছে। মহাভারতে কিন্তু কাকা এবং বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকতেই দেখা যায়, অবশ্য কাশীরাম দাসের মহাভারত এক্ষেত্রে অব্যবহার্য!

ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বড় ভাইয়ের সামনে চলাফেরা করতে, কথা বলতে, ঝগড়া করতে এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেও দেখেছি, এই নিয়ম শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। ছোট ভাইকে বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে মা সম্বোধন করতে দেখা যায় না, তবে সম্মান-সূচক বিশেষণ যথা 'তুমি' ব্যবহার করতে শোনা যায়।

মহারাষ্ট্র, গুজরাত, সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতে একই নিয়ম। আমরা ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে 'মা' সম্বোধন করি, এই-যে নিয়ম, সে-নিয়ম আমাদের নিজস্ব কি বিদেশাগত, নৃতত্ত্ববিদ তা নির্ধারণ করবেন।

**অমৃতসর**

জলন্ধর থেকে সোজা চলে যাই অমৃতসর। এই শহরের ঐতিহ্য যদিও আধুনিক তবুও দেখবার এবং শোনবার মতো অনেক কিছু রয়েছে। সর্বপ্রথমই হল জালিওয়ানওয়ালা বাগ। বাগ বলতে বাগিচা বোঝায়, কিন্তু যথাস্থানে গিয়ে দেখলাম, একটিও বৃক্ষ নেই; পূর্বে হয়তো ছিল এবং জায়গাটাও বিশেষ বড় নয়।

এই বাগে এক হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। সরকারি হিসেবে অবশ্য নিহত ও আহতের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৯ ও ১,২০০। জেনারেল ও'ডায়ার এখানেই নরহত্যা করে ভারতবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতা পাওয়া অতি সোজা নয়। আবার উধম সিংহও এই এলাকারই লোক। তিনিও দেখিয়ে

দিয়েছিলেন যে নরহত্যা করে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা যায় না। অবশ্য সেজন্য ব্রিটিশ ডেমোক্র্যাসিকে ধন্যবাদ দিতে হবে। ও'ডায়ার যদি আমাদের দেশে থাকতেন তাহলে তাঁকে উধম সিংহের পক্ষে হত্যা করা সম্ভব হত কি না, বলা বড়ই শক্ত। ইংল্যান্ডে ছিলেন বলেই উধম সিংহ তাঁকে হত্যা করতে পেরেছিলেন।

জালিওয়ানওয়ালা বাগ দেখতে যাচ্ছি শুনে কতকগুলি লোক আমার পেছন নিয়েছিল। কিন্তু যখন আমি স্বর্ণমন্দির দেখতে রওনা হলাম, কেউ আমার পেছন নেয়নি। একটা মস্ত বড় পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি একতলা বাড়ি, তার ছাদের ঠিক মাঝখানে মসজিদের ধরনে গম্বুজ রয়েছে। সেই গম্বুজ সোনার পাত দিয়ে মোড়া। মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ এই কাজ করে অমর হয়ে রয়েছেন।

এই বাড়িকে মন্দির বলা হয়। Sikh Temple থেকেই বোধহয় শিখ-মন্দির শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। শিখরা কিন্তু মন্দির বলে না। তারা যে কী বলে তা-ও জানবার চেষ্টা করিনি। সর্বসাধারণ লোককে গুরুদ্বার অথবা গুরুদোয়ারা বলতে শুনেছি।

শিখ-মন্দিরের অনুকরণে এখানে আর-একটি মন্দির তৈরি হয়েছে যার নাম দুর্গিয়ানা। সবই শিখ স্বর্ণমন্দিরের মতো, কিন্তু পুকুরে জল এবং ঘরটার উপর স্বর্ণপাতের আবরণ না-থাকায় শিখ 'গোল্ডেন টেম্পল'-এর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।

দুর্গাবাড়ির অন্য শব্দই বোধহয় দুর্গিয়ানা। এখানে সন্ধ্যার পরই লোক-সমাগম হয় এবং যারা গাঁজা ও ভাং খায়, তাদের সংখ্যাই বেশি। নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে বেসুরো গান গাইতে প্রায়ই দেখা যায়। দুর্গিয়ানা মন্দির স্থাপন করেছেন কয়েকজন সনাতনী ব্রাহ্মণ।

এদিকে ব্রাহ্মণের প্রভাব খুবই কম শোনা যায়; কারণ ফতে সিংহ আর জরওয়ার সিংহ নামক দুইজন শিখ গুরুপুত্রকে কোনো এক ব্রাহ্মণ সে-যুগে মোগল শাসকের হাতে তুলে দিয়েছিল। মোগল শাসক তাদের দুজনকেই দেওয়ালে প্রোথিত করেছিলেন। তার ফলে আজও যদি কেউ ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়, তাহলে লোকেরা অমনি মুখ ফিরিয়ে বলে 'বিশ্বাসঘাতকের জাত!'

দুর্গিয়ানার অন্য নাম বিশ্বাসঘাতকদের মন্দির। মন্দিরের ইত্যাকার বদনাম শোনার পরও আরো দু-বার সেখানে গিয়েছিলাম; কারণ শুনেছিলাম এখানে দোয়ারার লোক সমবেত হয় বিপ্লবী গান গাইবার জন্য।

অমৃতসরের পাশেই আর একটি ধর্মস্থান রয়েছে। কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের গুরু সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের লোক অধিকাংশই ইংরেজি-শিক্ষিত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের জাতক্রোধ রয়েছে। সেজন্য মুসলমান, হিন্দু ও শিখ সকলকেই এরা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। তাদের নিজেদের অবতার আছেন।

শোনা যায়, সেই অবতারকে কাবুলিরা কাবুলে অর্ধেক শরীর মাটিতে প্রোথিত করে অবিরত পাথরের ঢিল ছুড়ে হত্যা করেছিল। স্যার জাফরউল্লা কাদিয়ানি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোক নিজের সম্প্রদায়ের লোককে যথাসর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করে, এটাই এদের বিশেষত্ব। এই সম্প্রদায়ে অনেক হিন্দু যোগ দিয়েছে শোনা যায়।

অমৃতসর আর লাহোরের মধ্যস্থলে কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের উলটো পিঠ দেখতে পাওয়া যায়। সেই সম্প্রদায়কে বলা হয় 'রাধেশ্যাম সম্প্রদায়'। এই সম্প্রদায়কে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছি। এদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, যে-কোনো অবতারবাদী সেই সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারে। এরা কালো ও সাদার উপাসক। কালো হলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর সাদা হলেন শ্রীরাধা।

যদিও তারা রাধাকৃষ্ণের উপাসক তবুও তাদের আধ্যাত্মিক (অন্তরের কথা) তত্ত্ব হল কালো-ধলায় সমন্বয় করা। একজন হরিজন যদি সেই সম্প্রদায়ে যোগ দেয়, তাহলে আর সে হরিজন থাকে না, একেবারে রাধেশ্যামী হয়ে মালদার অর্থাৎ বিত্তশালীতে পরিণত হতে পারে। এরা নতুন কনভার্টের আর্থিক দুর্গতি যাতে অপসৃত হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বাধ্য।

অমৃতসরে আসার পর এই কয়টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রকমে মিশতে পেরেছিলাম। যেসব সম্প্রদায়ের কথা এখানে বলা হয়েছে, সেই সম্প্রদায়গুলি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় জন্মগ্রহণ করেনি। আপনা থেকেই এদের জন্ম হয়েছিল; কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগে হত্যাকাণ্ড হবার পর এদের বেশ উন্নতি হতে থাকে। যখন কোনো মহান বিষয় অধঃপাতে যেতে থাকে তখন ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রবাদীরা গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে এবং সমাজে বড় রকমের অনিষ্ট করে থাকে। এই ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ অনেকটা দূর হয়েছিল।

অমৃতসর থেকে লাহোর মাত্র বত্রিশ মাইল, কিন্তু তাপমান যন্ত্রে সেদিন একশো আট ডিগ্রি উত্তাপ থাকায় পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে 'লু' বাতাস নাকে-মুখে লাগছিল; তার

ফলে বুঝতে পারছিলাম পাঞ্জাবের লোক কেন পাগড়ি ব্যবহার করে; মাথায় হ্যাট ছিল, কিন্তু যখনই হ্যাটের ছিদ্রপথে 'লু' বাতাস প্রবেশ করে মাথায় লাগছিল তখনই মনে হচ্ছিল, মাথার চামড়া যেন জ্বলে যাচ্ছে! দেরি না-করে সঙ্গের খদ্দরের চাদরখানা বের করে আরবি-ধরনে মাথা এবং নাক-মুখে জড়িয়ে তার উপর হ্যাট চড়িয়ে পথ চলতে আরম্ভ করি।

এত প্রশস্ত ও প্রসিদ্ধ রাজপথে নয়টার পর আর মানুষের দেখা না-পেয়ে মনে করেছিলাম, এর পর থেকে রাত্রে ভ্রমণই ভালো হবে। তখনও এগারোটা বাজেনি, রাজপথের পাশেই একজন প্রৌঢ়কে বটগাছের নীচে বসে থাকতে দেখে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি লু বাতাসে কোনো ক্ষতি হয় না?" তিনি এক কথায় উত্তর দিলেন, "না।"

আমরা ভারতবাসী, এক কথায় উত্তর দেবার লোক আমরা নই। শিক্ষিত পাঞ্জাবিরাও উচ্চস্বরে কথা বলে, কিন্তু এই স্বল্পভাষী ভদ্রলোক যে-কণ্ঠে 'না' উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল এর বিশেষত্ব আছে।

এই পথে পূর্বেও ভ্রমণ করেছিলাম কিন্তু বাইসাইকেলে নয়, ট্রেনে করে। এবার বাইসাইকেলে উত্তাপের মধ্যে ভ্রমণ করায় জাকোকাবাদের উত্তাপ কীরকম তা কিছুটা হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলাম। শরীরে বেশ শক্তি ছিল, বারোটার পূর্বেই লাহোরের হিরামন্ডিতে আমাদের কালীবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি।

**লাহোর**

লাহোরে পৌঁছে হিরামন্ডির কালীবাড়িতে ওঠাই আমার সংগত মনে হয়েছিল। কারণ, কালীবাড়ির ঠাকুর মহাশয় আমার পরিচিত ছিলেন; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, বালুচিস্থান আর পারস্যে পল্টনি কাজ করার সময় তাঁর বাড়িতেই উঠতাম।

ঠাকুর মহাশয় আমাকে দেখেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, তাঁর বড় ছেলেটি সাধু হয়ে কোথায় চলে গেছে। কী করে সান্ত্বনা দিতে হয় জানতাম না, সেজন্য নির্বাক থেকে কতক্ষণ পর বলেছিলাম, "দুঃখ করে কী আর হবে? যা হবার হয়েছে।"

রাত্রে অনেক বাঙালি কালীবাড়ির আঙিনায় ঘুমোতেন। সেদিন রাত্রেও অনেক ভদ্রলোক এসেছিলেন। গরমের কথাই বলা-কওয়া হচ্ছিল। একজন ভদ্রলোক বলছিলেন, "সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট' বড়ই বাজে সংবাদ দেয়; আজকের টেমপারেচার কম করেও একশো পনেরো হবে। আগামীকাল কাগজ খুলে দেখবেন, সেই একশো আট ডিগ্রির বেশি একটি কথাও লেখেনি।"

আর-এক ভদ্রলোক পাঞ্জাবি ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন, "গরম আর ঠান্ডা এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই; আগামীকাল বোধহয় শিখ আর মুসলমানে একচোট হবে।"

সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, "বিষয়টা কী বলুন!"

ভদ্রলোক একটু রসিক, তিনি চুপ করে থাকলেন। তাঁকে চুপ করতে দেখে অনেকেই হতাশ হলেন। একজন ভদ্রলোক আর শুয়ে থাকতে পারলেন না, চারপাইয়ের উপর বসে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "ও মিত্তির, মরে গেলে না কি? শিখরা কী করেছে?"

মিত্তিরমশায় বললেন, "গুরু নানকের আমলের কী কী হাবিজাবি জিনিস এক মসজিদের পাশে মাটি খোঁড়ার সময় পাওয়া গেছে। শিখরা দাবি করেছে এই মসজিদ শিখদের। যা হবার তা-ই হয়েছে।"

"আরে ও মিত্তির, এতে তোমার হাত কতটুকু ছিল?"

"বাজে কথা বোলো না কাশীনাথ! যা বলেছি এর বেশি আর কিছু বলার নেই।"

আমার পাশেই ঘাটালের এক চট্টোপাধ্যায় শুয়েছিল। বয়স কুড়ি-পঁচিশ হবে, ক্যানভাসারের কাজ করে। চট্টোপাধ্যায় আমাকে একটা খোঁচা দিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, আমি বাঁহাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে কিছু না-বলতে ইঙ্গিত করে যেমন শুয়েছিলাম তেমনি শুয়ে রইলাম।

মিত্তির ও কাশীনাথ-সংবাদ এই পর্যন্ত শোনার পর আর কিছু শুনতে পেলাম না। ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠতেই চট্টোপাধ্যায় বলল, "গত রাতে মিত্তির-কাশীনাথ সমালোচনা শুনেছেন নিশ্চয়ই, এর কী প্রতিকার বলুন?"

আমি বললাম, "কোথায় বঙ্গদেশ আর কোথায় লাহোর! এখানে এসেও বাঙালি চাতুরির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, এর বেশি আমারও কিছু বলার নেই। তোমার বাড়ি ঘাটাল বলেছ অর্থাৎ মেদিনীপুর। দক্ষিণ মেদিনীপুরে চট্টোপাধ্যায় আছে কি না সন্দেহ! তুমি-যে আমার পেছন নাওনি, তার কি অনিশ্চয়তা আছে? অতএব বন্ধু, যার-যার পথ দেখা চাই। আমাদের জাতের মধ্যেই মিরজাফর, মিরমদন ইত্যাদি হয়েছিলেন, অতএব মিত্তির-কাশীনাথ-সংবাদ আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয় না।"

চ্যাটার্জি প্রতিবাদ করে বলল, "মিরজাফর, মিরমদন এরা বাঙালি ছিল না; কেউ ছিল পাঠান আর কেউ ছিল আপ্-কান্ট্রি

হিন্দু।"

উত্তরে আমি বললাম, "চ্যাটার্জি, মুখার্জিও আপ্-কান্ট্রির হিন্দু ছিলেন। যা হোক, এই ধরনের বিতর্কের মূল্য নেই। মিরজাফর না-হয় পাঠান ছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ কোথায় বাস করতেন তিনি জানতেন কি? বাংলা ভাষা যারা বলে, বাংলার খাদ্য যারা খায় এবং বঙ্গদেশে যারা স্থায়ীভাবে বাস করে, তারাই বাঙালি, আপ্-ডাউন বিচার করে লাভ হবে না।"

কালীবাড়িতে খেতে হলে প্রত্যেক দিনের জন্য এক টাকা করে দিতে হয়, এটাই ছিল নিয়ম। আমিও ঠাকুর মহাশয়ের হাতে সাত টাকা দিয়ে বাইরে চলে গেলাম। পরিচিত অনেকে ছিলেন; 'মিলাপ' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ট্রিবিউন' পত্রিকার মালিকের সঙ্গে সকালেই দেখা করে আমার আসার সংবাদ দিয়ে, আসবার পথে আর্যসমাজীদের এক পণ্ডিতের বাড়িতে গিয়ে শুনতে পেলাম, তিনি লাহোর থেকে অমৃতসরে গেছেন, শিগগিরই আসবেন। সেখান থেকে সোজা মুসলিম লিগ অফিসে হাজির হয়ে সকলকেই আমার পরিচয়পত্র দিয়ে জমিয়ে বসলাম। উদ্দেশ্য, কিছু অবগত হওয়া। দ্বিতীয় কথা হল, প্রত্যেকটা বিষয় সাহসের সঙ্গে হৃদয়ংগম করা।

বসে রয়েছি দেখে একজন ভদ্রলোক বললেন, "আমরা আপনার কাছ থেকে কিছুই শুনব না, কারণ আপনি হিন্দু।"

পরিষ্কার ভাষায় পরিষ্কার কথা!

আমি বললাম, "আপনারা আমার দেশবাসী, সে-কথা কি ভুলে গেলেন? প্রফেটইজ্‌ম বড় কথা নয়, দেশাত্মবোধ সবচেয়ে বড়।"

সেখানে একজন স্কুল-মাষ্টার ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁরই পরিচালিত বিদ্যালয়ে কিছু বলতে বললেন। এখানেই মুসলিম লিগের অফিসের কাজ শেষ হয়ে গেল। চলার পথে হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি প্রফেটইজ্‌ম মানেন না?"

"না স্যার, যুগে যুগে প্রফেটইজ্‌ম মানুষের মনে বিপ্লব এনে দিয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশে বিপ্লবের পরিবর্তে বিপত্তির সৃষ্টি করেছে মাত্র, সেজন্যই আমি প্রফেটইজ্‌ম থেকে দূরে থাকি।"

হেডমাষ্টার আমাকে ছাড়লেন না, তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একইসঙ্গে আমাকে আহার করালেন। এরপর তাঁর সঙ্গে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম, ছাত্রেরা প্রার্থনা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি প্রার্থনা করেন না?"

"না স্যার, প্রার্থনা ব্যক্তিগত বিষয়। প্রফেটইজ্‌মের দৌলতে আজ আমরা ঈশ্বর আর আল্লাতে এমন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসটাকে একটা মনে না-করে দুটো মনে করতে আরম্ভ করেছি। এর চেয়ে পতন আর কী হতে পারে?"

"এটা থেকে মুক্ত হবার উপায় কিছু বলতে পারেন?" শিক্ষক মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমার উত্তর সহজ ও সরল।

বললাম, "বিপ্লবই একমাত্র উপায়।"

এ-কথা শুনে শিক্ষক মহাশয় সন্তুষ্ট কি বিরূপ হয়েছিলেন বলতে পারি না। ইনস্পেকটর মহাশয় আসতেই সব যেন পণ্ড হতে চলেছিল বলেই মনে হচ্ছিল! কিন্তু ইনস্পেকটর নিজেই আদেশ করলেন, "ক্লাস এইট পর্যন্ত রেখে আর সবাইকে ছেড়ে দিয়ে লেকচারের বন্দোবস্ত করা হোক।"

তা-ই হয়েছিল। বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে বলতে আরম্ভ করি এবং শেষ করি তিনটের সময়। সবই বলেছিলাম, কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল তার আশেপাশেও যাইনি।

একটি লেকচার দেবার পর লাহোরে লেকচার দেবার জন্য অনেক আমন্ত্রণ হল, বিশেষ করে ওয়াই.এম.সি. হলে। আমারও লক্ষ্যবস্তু ছিল ওয়াই.এম.সি. হল। হিন্দু-মুসলমান ও শিখদের মিলনক্ষেত্রে গিয়ে যদি কিছু জানা যায়, তবে ক্ষতি কী?

ওয়াই.এম.সি. হলে এক জায়গায় লেখা ছিল, বক্তৃতাকারী সভাস্থল পরিত্যাগ না-করা পর্যন্ত কেউ যেন বেরিয়ে না-যান! এর মানে আর কিছুই নয়, এখানে যাঁরা লেকচার দিতে আসেন তাঁদের কথা শুনতে সকলে ইচ্ছুক নন।

বলতে আরম্ভ করার পর একজন লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছুঁয়ে দিলে জাত যায় এরকম দৃষ্টান্ত আপনি পৃথিবীর কোথাও দেখেছেন কি?"

বুঝতে বাকি থাকল না, আঘাত কোথায়? সোজা কথায় বলে দিলাম, "এক ভারতীয় হিন্দু ছাড়া আর কারো মধ্যে ছুঁৎ-ছুঁত রোগ নেই— পূর্বদেশের কোথাও নেই।"

"যারা ছুঁতমার্গ পালনকে দৈনন্দিন কাজের বিশেষ কর্তব্য রূপে গণ্য করে, তাদের মধ্যে থাকা কি সম্ভবপর?"

"এই শ্রেণির লোক থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

"ভারতের হিন্দুদের মধ্যে এই রোগ আছে, আপনার মধ্যেও আছে। অতএব আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করা কি ভালো হবে না?"

"এই রোগ থেকে আমি মুক্ত এবং আমার বিশ্বাস, এই রোগ

অতি সহজে লোপ করা যেতে পারে।"

"কী রকমে?"

"আইন করে। আমাদের দেশের নেতারা যদি একটু সাহায্য করেন তাহলেই এই আইনের উপযুক্ত ফল দেখা যেতে পারে।"

"আপনাদের দেশের নেতারাও যে সেইরকমই।"

একটু উগ্র হয়ে বললাম, "আপনি কি আমার দেশবাসী নন? 'আপনাদের দেশের নেতা' বলবেন না; বলবেন, 'আমাদের দেশের নেতা'।"

প্রশ্নকারী পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "আমরা আপনাদের সঙ্গে বসবাস করতে চাই না। আমরা চাই পৃথক রাজ্য। যাদের মধ্যে অনেক রকমের ব্যাধি, তাদের সঙ্গে কী করে একত্রে থাকা চলে?"

বললাম, "রোগগ্রস্ত লোকের রোগ সারাবার ব্যবস্থা আপনাদের হাতে। বর্তমানে ব্রিটিশ রোগ সারাতে দেবে না। আপনারা অগ্রণী হয়ে দেশের মুক্তি আনয়ন করুন, রোগীর রোগ সারান, তারপর প্রভুত্ব করুন। দেখবেন, সকলেই আপনাদের কাছে মাথা নত করবে। এত বড় কর্মস্থল পরিত্যাগ করে কাপুরুষের মতো পলায়ন করা শোভা পায় না।"

আবার বলতে আরম্ভ করি। কতক্ষণ বলার পরই একজন পাতলা, ছিপছিপে লোক উঠে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "কানাডাতে মিঃ যোশীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?"

"দেখা হয়েছিল নিশ্চয়ই" বলাতে সেই পাতলা লোকটি বলতে আরম্ভ করলেন, "এখানে এসে ভালোই করেছেন, এটা বাস্তবিকই মিলন-মন্দির। এখানেই ভুয়ো গদর তৈরি হয়, যারা যায় সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, ইয়াকোহামা আর ক্যালিফোর্নিয়া।"

এই লোকটির কথা মোটেই বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু পরে যখন ক্যালিফোর্নিয়াতে গিয়েছিলাম তখন বুঝতে পেরেছিলাম, লাহোরের পাতলা লোকটি যা বলেছিলেন সবই সত্য।

ওয়াই.এম.সি.-তে মুসলিম ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলাম তার প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম বার লাইব্রেরিতে; উপস্থিত প্রায় সবাই হিন্দু। একজন ভদ্রলোক ছিলেন উকিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি কেউ আপনার কাছে বসে মাংস খায়, তাহলে আপনি খেতে পারবেন কি?"

সেই ভদ্রলোক যখন শুনলেন আমি সর্বভুক তখন 'মার্ মার্' আর-কি!

বার লাইব্রেরিতে কিছুই বলা হয়নি, চলে আসতে হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, নিরামিষ ভক্ষণ এদের মজ্জাগত হয়েছে বটে কিন্তু খাদ্যবণ্টন যদি কন্ট্রোল করে সমান ভাগে সকলকে দেওয়া হয় তাহলে এদের যা অভক্ষ্য তাও এদের ভাগ্যে এক আউন্স পড়বে কি না সন্দেহ। "Gold Rush" সিনেমাতে যেমন করে নিজের বন্ধুকে মোরগ স্বপ্ন দেখেছিল, এদেরও সেই অবস্থা হবে।

কিন্তু এদের সেই অবস্থা হবে না; কারণ আমাদের দেশের লোক এখনও মনে করে যে দারিদ্র্য ভাগ্যের হেরফের। যে-মুহূর্তে এই কুসংস্কার মানুষের মন থেকে দূর হবে, সেই মুহূর্তে ঘি খাওয়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

লাহোরে অনেক দেখবার ছিল, অনেক জানবার ছিল; কিন্তু বার লাইব্রেরির অবস্থা দেখে সেখানকার বুদ্ধিজীবী মহাশয়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেশোয়ারের পথ ধরলাম।

**লাহোরের পরে**

লাহোর থেকে রওনা হবার পরই মনে হচ্ছিল যেন লোকশূন্য অঞ্চলের দিকে চলেছি। লাহোর থেকে কয়েক মাইল যাবার পরই পরিশ্রান্ত মনে হল। এর কারণ কী? এতদিন বিশ্রাম করলাম তবুও পরিশ্রান্ত, এটা হতে পারে না। বোধহয় এটা বেশি বিশ্রামেরই ফল।

একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করছিলাম, ঠিক সেই সময় একজন ইউরোপিয়ান এলেন। সাহেব যেন ঔরঙ্গজেবের প্রথম পুত্র! "কিয়া করতাহে, কিত্থে যায়গা" ইত্যাদি প্রশ্ন গাড়িতে বসেই জিজ্ঞাসা করছিলেন। লোকটার প্রশ্ন মোটেই ভালো লাগছিল না। নিজের ভাষাতেই বললাম, "এসব জেনে তোমার কী লাভ? নিজের পথ দেখতে পারো।"

আর কি রক্ষা আছে? গাড়ি থেকে লোকটা নেমে কাছে এল এবং তেড়ে কথা বলতে আরম্ভ করল। কখনো হিন্দুস্থানি, কখনো ইংলিশ আর কখনো পাঞ্জাবি। আমি হাসলাম, তারপর নিজের ভাষায় বললাম, "ভেউ ভেউ করে কোনো লাভ হবে না, তুমি কে?"

হঠাৎ লোকটা বলল, সে পুলিশ, ঘটনাবশত এইদিকে যাচ্ছে। আমাকে দেখে তার সন্দেহ হওয়ায় পথে দাঁড়িয়ে কিছু না-জিজ্ঞাসা করে এগিয়ে যেতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সে যাবে গুজরানওয়ালা। বেশ ভালোই হয়েছে, বললাম, "সন্দেহের অনেক কারণ আছে এবং থাকবেও, আমি বাঙালি আর তুমি বৃটন। তোমার জাত শাসক আর আমার জাত শাসিত। চলো, তোমার সঙ্গে গুজরানওয়ালা যাব।"

লোকটা রাজি হল এবং বলল, "সাইকেলটা কেরিয়ারে উঠিয়ে বেঁধে ফেলো।"

তা-ই করলাম। সে আর প্রশ্ন করল না, একেবারে হু-হু করে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল।

**গুজরানওয়ালা**

বেলা তখন আড়াইটা হবে, সাহেব আমাকে নিয়ে হাজির করল গুজরানওয়ালার কোতোয়ালিতে। সে বলল, "এটা কোতোয়ালি।"

আমি বললাম, "এটা কোতোয়ালি নয়, এটা পুলিশ স্টেশন।"

লোকটা পাগল হয়ে গেল, একেবারে চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করল, "এটা কোতোয়ালি নিশ্চয়ই, হাজারো বার কোতোয়ালি।"

আমি বললাম, "তোমার জন্যে হতে পারে কোতোয়ালি, আমার জন্য পুলিশ স্টেশন, যেখানে লোক থাকে মানুষেরই ভালোমন্দ দেখার জন্য।"

লোকটার চিৎকারে এবং আমার বেপরোয়া কথার জন্য কয়েকজন পাঞ্জাবি কনস্টেবল বেরিয়ে এল। এদের দেখতে পেয়ে ইউরোপিয়ান বলল, "চা নিয়ে আসতে বলো, আমার কামরায়।"

আবার প্রতিবাদ করে বললাম, "বলো, আমার অফিসে।"

আর জবাব দিল না লোকটা, ভদ্র ভাষায় বলল, "এবার দয়া করে আসুন, চা খেয়ে বিদায় নিন। আমি বাঙালিও নই, আর ব্রিটিশ সেপাইও নই, মামুলি এস.পি. মাত্র।"

উভয়ে অফিসে গেলাম, চা খাওয়া হল, তারপর বললাম, "ধন্যবাদ, এখন যাই।"

এস.পি. বললেন, "এখন যেদিকে ইচ্ছা যেতে পারেন।"

বাইরে এসে সাইকেলটা খুলে নিয়ে নিজের অন্যান্য জিনিস সাইকেলে বেঁধে রওনা হলাম শহরের দিকে। শহরে প্রবেশ করার পথেই পেলাম এক হিন্দু হোটেল। থাকবার জায়গা অপরিষ্কার, কিন্তু খাদ্যের ব্যবস্থা বেশ ভালো। গুজরানওয়ালা শহরে এসেই মনে হল শহরটা যেন লাহোরের চেয়ে অনেক উঁচু। অথচ চলার পথে একটুও উঁচু মনে হচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে স্নান করে নিলাম; তারপর ভোজন। হিন্দু হোটেলে আমিষ ভোজন এই প্রথম, মাংস ছিল। এদিকে মাংস সর্বত্র পাওয়া যায় না; কারণ, কোনো হিন্দু হোটেলে জবাই করা জীবের মাংস বিক্রি হয় না।

এখানে শিখদের পাঁঠা কাটবার দোকান আছে। হিন্দুদের সংখ্যা কম, মুসলমানের সংখ্যা বেশি, গুজরানওয়ালাতে এলেই তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। কিন্তু এদিককার হিন্দুরা বড়ই অপরিষ্কার; দেখলেই মনে হয়, উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরাও নিম্ন শ্রেণির মুসলমানদের চেয়ে নিকৃষ্ট। হিন্দুদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব পশ্চিম পাঞ্জাবের কোথাও অনুভূত হয় না।

বিকেলে শহরে বেড়াতে বের হলাম। পুলিশ স্টেশনে গেলাম না, আর সর্বত্রই বেড়ালাম। শহর বেশি বড় নয়, সাইকেলে করে সবটা শহর দেখতে দেড় ঘণ্টারও বেশি লাগেনি। শহরের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশি, কিন্তু এদিকের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু নেই বললেই চলে, আছে কয়েক ঘর শিখ। হিন্দুমাত্রেই ধনী, অর্থের অভাব নেই। শিখরা পরিশ্রমী, তবে হিন্দুদের অনুকরণে সুদ খাওয়া শিখে গেছে।

এখানে দেখবার এবং শোনবার কিছুই ছিল না। কাজেই পরদিন সকালে ওয়াজিরাবাদ রওনা হলাম।

**ওয়াজিরাবাদ**

ওয়াজিরাবাদ পৌঁছনোর আগেই শরীর বেশ দুর্বল অনুভব করেছিলাম। সেখানে পৌঁছে একটি ধরমশালাতে আশ্রম নিলাম। অপূর্ব সেই ধরমশালা! অর্থের বিনিময়ে এখানে সবই করা যায়। বিকেলে এক স্থানীয় হিন্দুর বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, এরা নিঃস্ব হয়েছে।

এখানে মাত্র একখানা হিন্দুর দোকান দেখতে পেয়ে মনে হয়েছিল এটা কি আফগানিস্তান, না অন্য কোনো দেশ? পথে একটি লোক ফল বিক্রি করছিল। তার কাছ থেকে ফল কেনার সময় সে বলেছিল, গুজরানওয়ালাতে হিন্দু আছে, কিন্তু ভয়ানক দাম্ভিক। তার নিজের পরিচয় সে নিজেই দিয়েছিল এবং বলেছিল, সে একজন খ্রিষ্টান।

ওয়াজিরাবাদে রাত কাটিয়ে সকালে রওনা হয়েছিলাম গুজরাতের দিকে। সকালেই শরীর দুর্বল মনে হচ্ছিল, কিন্তু সেই দুর্বলতার দিকে না-তাকিয়ে পথ চলছিলাম।

**গুজরাত, ঝিলম**

গুজরাত শহরে পৌঁছনোর পর হঠাৎ মনে হল সামনের পুলিশটা যেন ঘুরছে! তারপর সাইকেল থেকে পড়ে যাই। সেইসঙ্গে যেন তন্দ্রার ভাব!

তন্দ্রা যখন ভাঙল তখন দেখলাম, আমাকে নিকটস্থ একটা বালিকা-বিদ্যালয়ে বিছানাতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। লজ্জা হল। বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

বিকেলে হোটেলে গিয়ে দই দিয়ে ভাত খেয়ে আবার শুয়ে রইলাম। বুঝলাম, শরীরে দুর্বলতা ঢুকেছে; দুর্বলতা সারাতে হবে। দুর্বলতা সারাবার অনেক ওষুধ আছে। আমি ওষুধের পক্ষপাতী ছিলাম না, ঘোল আর ভাত অথবা দই আর ভাত, ওই দুটো খেলেই আমার দুর্বলতা সারত।

গুজরাতে তিনদিন কাটিয়ে লালামুসা হয়ে ঝিলম পৌঁছলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় নিই। ঝিলম নদীতে মাছ আছে প্রচুর কিন্তু সে মাছ মুসলমানরাই খায়, হিন্দুরা মাছ খায় না। আমার আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক বিহারি, দেখতে এবং কথা বলার ভঙ্গিতে বাঙালি বলেই মনে হত। মাছ কেনা, মাছ রান্না উভয়ে মিলেই করতাম। তবে বিহারের যুবক রান্নায় বেশ ওস্তাদ ছিলেন। মাছ রান্না হবার পর আরো কয়েকজন বিহারি এলেন, সকলেই নিমন্ত্রিত। খাওয়া হল বেশ আরামে। তারপরই রাজনীতি-চর্চা।

বিহারি পরিচয় দিয়ে কয়েকজন বাঙালিও খেলেন। রাজনীতি আলোচনা না-করলে বাঙালির যেন বাঙালিত্ব থাকে না! আরম্ভ হল রাজনীতি-চর্চা। চর্চা করার মতো কিছুই ছিল না। ক্রান্তি-যুগ আর কতকাল চলবে? নন-কোঅপারেশন কি আজীবন চালিয়ে যেতে হবে? আমাদের ভবিষ্যৎ কি পরাধীন জীবনেই শেষ হবে?— এইরকম কথার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না।

বিহারি এবং বাঙালি বাবুরা যেন হয়রান হয়েছিলেন! কী করতে হবে তাঁরা যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না! এখানে আমিও আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। এঁরা তো পুলিশের লোকও হতে পারেন! রাত বারোটার সময় সভা ভঙ্গ হবার পর মন দমে গেল। ভাবছিলাম, এই কি আমাদের ভবিষ্যৎ?

রাত কাটল। পরের দিন ঝিলম শহরের এক ধনীর বাড়িতে গেলাম। তিনি নাকি সেখানকার রাজার মতো লোক! ভদ্রলোক বাস্তবিকই রাজা ছাড়া আর কী হতে পারেন? বেশি কথা হল না, ফিরে গেলাম থাকবার জায়গায়। খাওয়া শেষ করে ঝিলম নদীর তীরে গিয়ে বসলাম।

বেশ ভালো লাগল সেখানে বসতে। সাধারণ লোকও সেখানে কম ছিল না। তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন-কথা বলে যাচ্ছিল। রাজনীতি, ধর্মনীতি কিছুরই বালাই ছিল না। এরা সবাই মুসলমান। নৌকো চালায়— এই একমাত্র পেশা। ভাষা কিন্তু পাঞ্জাবি বলছিল না। পাঞ্জাবি ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে আর কী-একটা ভাষা বলছিল!

আমি চেয়েছিলাম এদের শরীর-গঠনের দিকে। সবাই সুপুরুষ, একজনও কালো ছিল না। একজন উপরে আসার পর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে কোন্ জাতের লোক? সে বলেছিল, সে কাশ্মীরি। আমার ধারণা ভুল। কাশ্মীরিকে পাঞ্জাবি মনে করেছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে পাঞ্জাবি ও কাশ্মীরিতে অনেক প্রভেদ। ভাষা, খাদ্য, বস্ত্র, সব রকমেই পৃথক।

মাঝিরা সকলেই পুঞ্চ গ্রামের বাসিন্দা। সেখানে তাদের একজন রাজা আছেন। রাজা নাকি খুবই উদার! ধর্মের পার্থক্য তাঁর রাজ্যে নেই। যত গণ্ডগোলের কারণ পাঞ্জাবি। পাঞ্জাব দেশে পুঞ্চদের ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে হয়, নতুবা এখানে এরা আসতই না। এই রকমের মন্তব্য করে মাঝি নৌকোয় চলে গেল। আমিও নদীতীর থেকে শহরে চলে গেলাম।

এখানে দেখলাম, আমাদের দেশের মতো এখানেও সত্যিকারের জাতিভেদ রয়েছে। পুঞ্চ থেকে যারা ব্যাবসা করতে এসেছে তারাও মুসলিম, ঝিলমে যারা বাস করে এবং শহরের বাইরে যারা থাকে তারাও অধিকাংশই মুসলিম; কিন্তু এদের মধ্যে অন্যের অবতারবাদ ছাড়া সকল রকমের পার্থক্য ছিল।

শহরে এসেই আমার নতুন আবিষ্কৃত তথ্য তথাকথিত বিহারিদের বললাম। আমার নতুন কথা শুনে সকলেই অবাক হল। অবতারবাদের উপর ভিত্তি করে জিন্না পাকিস্তান করতে চাইছেন, অথচ জাত গড়ে ওঠে শ্রেণিগতভাবে। পাহাড়িরা সমতলে এলে যেমন অস্বস্তিবোধ করে তেমনই সমতলবাসীরাও পাহাড়ে থাকতে চায় না।

পরের দিন সকালেই ঝিন্দ্ ছেড়ে চললাম আরো পশ্চিমের দিকে। এটাও পাঞ্জাব, এখানকার লোকও পাঞ্জাবি বলে কিন্তু লোকের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার কিছুটা পৃথক অনুভব করেছিলাম। এদিকের লোক বেপরোয়া; তাদের ছুঁতমার্গ নেই, বেশ সরল প্রকৃতির, ব্রিটিশ শাসনই যেন এদের শেষ দিন পর্যন্ত চলবে! ইংলিশ বলা, লেখা আর স্যুট পরাই যেন এদের একমাত্র কাম্য! তবে মাথার পাগড়িটা ছাড়তে যেন ইচ্ছুক নয়! গলায় নেকটাই ঝুলিয়ে মাথায় পাগড়ি অথবা ফেজ টুপি লাগিয়ে পথ চলা যেন বড়ই আরামের! তবে এটা ঠিক, এদিকের লোক ধুতি ব্যবহার করে না।

রাত্রে থাকতে হল আর-একটা বেখাপ্পা জায়গায়। বাঁদিক দিয়ে রেল-লাইনটা চলে গেছে, আর ডানদিকে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড। মাঝখানে একটি গ্রাম।

গ্রামের বাসিন্দা সবাই পাঞ্জাবি। কেউ সাদা, কেউ কালো, তবে লোকগুলি অমায়িক। গ্রামে কয়েক ঘর মেথরও থাকে, কিন্তু মেথরের কাজ করে না। হরিজনের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামের রাজপুত দুই ভাগে বিভক্ত, ইসলামবাদী আর হিন্দুবাদী। অনেক হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের রক্তের সংযোগ রয়েছে।

গ্রামের ধরমশালাতে রইলাম। ব্রাহ্মণ ও রাজপুত ছাড়া এই ধরমশালাতে আর কেউ থাকতে পারে না। বড়ই আরামের স্থান। এটাকে ধরমশালা বলা চলে না, বলতে হবে ডাকবাংলো। বাঙালি আবার কী জাত, এদের জানা ছিল না। মেথরই জল এনে দিল। চা আর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এনে দিল মুসলমান বাড়ি থেকে। বিকেলে কয়েকজন মুসলমান ধরমশালাতে এসে কেমন আছি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেই বিদায় নিলেন। বিশেষ আদর-আপ্যায়ন করার কথা কারো যেন মনেই হল না!

রাত কাটানো নিয়ে কথা, রাত কাটিয়ে পরের দিন পথে বের হতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখা হল একটি লোকের সঙ্গে।

তিনি ডাক্তার, পূর্বে পল্টনে ছিলেন, বর্তমানে সিভিল প্র্যাকটিস করেন। দেখা হওয়া মাত্রই তিনি বললেন, "আপনি কি মিঃ বিশ্বাস নন?"

"হাঁ ডাক্তার ফতে মিয়া, আপনি কি এখানে থাকেন?"

এই পর্যন্ত বলার পর তিনি মোটর-বাইক থেকে নেমে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন।

তাঁকে বললাম, "এখানকার ধরমশালা বেশ ভালো, গত রাত্রে সেখানেই ছিলাম। সেখানে গেলেই ভালো হবে।"

ফতে মিয়া কী চিন্তা করে বললেন, "আচ্ছা থাকুন সেখানে। আমি একজন লোককে আপনার খাদ্যের আয়োজন করতে বলে যাব। সে সবই করবে, বারোটার পর উভয়ে খাব, কেমন?"

"আচ্ছা, তাই হবে," বলেই আমি আবার ধরমশালাতে গেলাম। ফতে মিয়া কোথায় গেলেন তা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

আজকাল পাঞ্জাবি মুসলমানরা সবাই মিয়া লিখতে আরম্ভ করেছে, পূর্বে তা পারত না। যারা রাজপুত থেকে মুসলমান হত, তারাই শুধু মিয়া লিখতে পারত। পূর্বে কোনো মিয়াই গোমাংস খেতেন না, বর্তমানে কী করেন আমি জানি না। খাঁ অথবা খান যাঁরা, তাঁরা মিয়াদের সমকক্ষ কখনো ছিলেন না; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে গিয়ে মিয়াদের সংখ্যা অল্পই দেখেছিলাম, খানের সংখ্যাই বেশি। খানরা নাকি অসুরদের বংশের লোক, মিয়ারা একেবারে আদি ও অকৃত্রিম দেবতাদের বংশধর— এটাই এদিকের লোক দাবি করে।

বেলা এগারোটার পূর্বেই মিয়া ফতে আহমদ এলেন এবং সেইসঙ্গে বেশ কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমানের আগমন হল। তারা সকলেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং যদিও এদের চোখের তারা নীল নয় তবুও অনেকটা কটা।

কোনো সময়ে যে এরা শ্বেতকায় ছিল, তার সমূহ প্রমাণ রয়েছে দেখতে পেয়ে ফতে মিয়াকে বললাম, "ডাক্তার সাহেব, আপনাদের শরীরের গঠন ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছে, আপনাদের পূর্বপুরুষ শ্বেতকায় ছিলেন।"

মিয়া ফতে আহমদ স্পষ্ট করেই বললেন, "আমাদের পূর্ব-পুরুষকে ডুবিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, আমরা এখন তা বুঝতে পেরেছি; সেজন্য আমাদের মধ্যে নতুন এক আচার-ব্যবহারের সৃষ্টি হয়েছে। জানি না সেই নতুন আচার-ব্যবহারে আমরা ফিরে যেতে পারব কি না। পর্দা আমাদের মধ্যে নাই, বিবাহ-প্রথাও ভিন্ন রকমের।"

মিয়া ফতে আহমদ এরপর যা বলেছিলেন তা ছিল ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি; কারণ আমি জানতাম, মিয়া ফতে আহমদ অথবা তাঁদের সম্প্রদায় ভবিষ্যতে টিকে থাকতে পারবেন না, হয় হিন্দু নয় মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের যোগ দিতে হবে।

**গুজরখান-রাওলপিণ্ডী**

পরের দিন পুনরায় রওনা হয়ে গুজরখানে পৌঁছই। এই গুজরখান নাম যিনি দিয়েছিলেন তিনি মুসলিম ছিলেন না, ছিলেন হিন্দু; তবে তিনি ছিলেন মুসলমান নবাবের অধীনে একজন কর্মচারী, এই কথাই সকলে বলেছিল। গুজরখানে হিন্দুর সংখ্যা খুবই কম; সেজন্য যে-কয়টি হিন্দু ও শিখ পরিবার এখানে বাস করছিল, তারা একে অন্যের উপর সব সময়ই নির্ভর করত।

গুজরখান থেকে একদিনেই রাওলপিণ্ডী পৌঁছই। আশ্রয় নিলাম একটি ধরমশালাতে। শহরের ঠিক মধ্যস্থলে ধরমশালা। রাওলাপিণ্ডীতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছিলাম, পরেও এসেছিলাম, অতএব এখানে নতুনত্ব বলে আমার চোখে যেন কিছুই ভাসছিল না। তবুও পর্যটকরূপে একস্থানে এলেই নতুন কিছু দেখতে হয়।

এখানকার মল রোড, ক্যান্টনমেন্ট, কালীবাড়ি, সবই আমার দেখা ও জানা। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টে আমি ছিলাম।

পাঞ্জাবি চরিত্র আমার বেশ জানা ছিল, কিন্তু এবার এখানে আসার পর কিছুটা নতুন করেই শহরটা দেখতে আরম্ভ করলাম।

ছিলাম আর্যসমাজীদের ধরমশালায়। হিন্দু ধর্মের প্রচার ও বিস্তার ছিল এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। জন্মান্তরবাদ এরা গ্রহণ করেছিল। আমি জন্মান্তরবাদ মানতাম না। ঈশ্বর সম্বন্ধেও একটা নতুন ধারণা হয়েছিল; কিন্তু ভয় সব সময় লেগে থাকত কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এসব কথা শুধু আমিই মানতাম, কারো কাছে কিছুই বলতাম না।

ধরমশালায় স্থান নেবার পর হঠাৎ মনে হল টাকার কথা। টাকা আমার প্রায় শেষ হয়েছিল, পেশোয়ার পৌঁছতে আরো পঞ্চাশ টাকা লাগতে পারে, কিন্তু সেই টাকা কোথায়? রাত্রে বিষয়টা চিন্তা করে পরের দিন মল রোডে গেলাম। আমার প্রতি কেউ একটুও আগ্রহ দেখাল না। ফেরবার পথে এক লালা যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। যুবক শুধু বললে, আগামীকাল সকালে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে, ধরমশালা ছেড়ে যেন কোথাও না-যাই!

হাঁ, যৌবন তার চোখে-নাকে-মুখে ফেটে পড়ছিল! আমার একটি কুধারণা ছিল, এদিকের হিন্দু যুবকদের চরিত্র বলতে কিছুই নেই। চরিত্রহীনের কথা রক্ষা করা চলবে কি না তা-ই ভাবতে ভাবতে ধরমশালায় চলে আসি।

ধরমশালায় কয়েকজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। কেউ ছাত্র আর কেউ শিক্ষক। সন্ধ্যার পর সকলেরই যেন কী খেয়াল হল আমার সঙ্গে কথা বলবেন! ঈশ্বর আর অবতারবাদ যাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়, মরলে স্বর্গ হবে যাদের বাসস্থান, তারা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কী সম্পর্ক রাখতে পারে? তবুও গেলাম ওদের সঙ্গে কথা বলতে।

এদের সংখ্যা ছয় কি সাত। গুরুকুল বিদ্যালয় থেকে কয়েকজন ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন বটে কিন্তু সন্ন্যাস ধর্মে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মুখের কথাই শুনতে হল প্রথম। ইংলিশ, সংস্কৃত, পালি যাঁদের কণ্ঠে বিরাজ করে, তাঁদের সামনে আমি নগণ্য। তাঁদের কথাই অনেকক্ষণ শুনতে হল। আমাকে উপলক্ষ্য করেই এই ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা হচ্ছিল। এদের কথা শেষ হলে আমাকে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁদের কথা ও পাণ্ডিত্য বুঝতে পেরেছি কি না?

উত্তরে বললাম, "এসব হল চায়ের দোকানে বসে যেসব কথা বলা হয়, তারই সমান। কার পূর্বপুরুষ কীরকম ছিলেন, এর বেশি কিছু বলেননি। আপনাদের কথার মধ্যে গঠনের কিছুই নেই, আছে বিভাগ ও বিচ্ছেদ। আপনাদের বিশ্বাস, একমাত্র আপনারাই স্বর্গের অধিকারী— কাজেই স্বর্গে গেলে দেখতে পাবেন মুসলমান খ্রিষ্টান সকলেই নরকে গেছে, আর আপনারাই শুধু স্বর্গে মজা লুটছেন!"

জানি না এই ত্রিকালজ্ঞগণ আজ পূর্ব-পাঞ্জাবের কোথায় আছেন! তাঁদের গুরুকুল আছে নিশ্চয়ই।

চলে আসার পর বয় বলছিল, "আপনাকে এখানে সাতদিনের বেশি থাকতে দেওয়া হবে না শুনে এসেছি।"

বয়কে বললাম, "সাতদিন তো থাকতে দাও, তারপর অন্য ব্যবস্থা করব।"

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কড়া-নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দিলাম। ঘরে ঢুকল সেই লালা যুবক। যুবক বসল এবং বলল, "তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ। পৃথিবী ভ্রমণ করো কখন?"

জবাব না-দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এলাম, তারপর যুবককে বললাম, "চা খাবে?"

যুবক বললে, "এখন চা খাওয়ার সময় নেই। ইচ্ছা রয়েছে তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা পাইয়ে দিই, কিন্তু সেই টাকা জোগাড় করতে হবে। তাড়াতাড়ি চলো।"

বের হলাম যুবকের সঙ্গে। দশটার পূর্বেই পঁচিশজন লোকের সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে গেলাম। যুবক যাবে কাজ করতে। সে কাজে চলে গেল। যাবার পূর্বে বলে গেল, সন্ধ্যার পূর্বে সে আসবে এবং আমাকে তার বাড়িতে ভোজনার্থ নিয়ে যাবে। ব্যস, এই পর্যন্ত!

আমারও অসুখ করেছিল। ঘরে এসেই একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম; তিনি প্রচুর পরিমাণে ঘোল খেতে বললেন, তাতেই রোগ সারবে। আমাশয় রোগের জন্য কয়েক পুরিয়া ওষুধ দিলেন, দাম নিলেন না।

ডাক্তার পাঞ্জাবি এবং একটু অন্য ধরনের লোক। পরমাত্মা অথবা খোদা শব্দ যা সাধারণত শোনা যায়, তাঁর মুখ থেকে সেরকম একটি কথাও বের হল না।

সন্ধ্যার পর লালার বাড়িতে গেলাম। অন্য একটি যুবক এসেছিল আমাকে নেবার জন্য। দেখতে হিন্দু কি মুসলমান বুঝতে পারিনি। কথা-প্রসঙ্গে সে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু বলল। তার শেষ কথার জবাবে বললাম, "এটা হল অবতারবাদ, ধর্ম নয়। ধর্ম গতিশীল। অবতারবাদ অগতিশীল।

আমরা চলেছি, চলব— যখন চলতে পারব না, বৃদ্ধ হব, আমরা তখন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব।"

যখন সাইকেল থেকে নামলাম তখন সে আমার করমর্দন করল। আমি কিছুই বললাম না।

লালার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, অনেকগুলি যুবক বসে আছে; তারাও খাবে। আমি লালাকে বলেছিলাম রুটি খাব না, ভাত খাব এবং সেইসঙ্গে থাকবে প্রচুর ঘোল। লালা তা করেনি, সে মোরগের মাংস, পোলাও ও আরো কিছু করেছিল। লালার বোন সবাইকে খাদ্য পরিবেশন করল। দেখলাম, কেউ কিছু বলছে না, সকলেই খেতে আরম্ভ করেছে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সকলের সঙ্গে পরিচিত হলাম। দেখলাম, বেশির ভাগই মুসলমান। যে-ছেলেটি আমাকে নিতে এসেছিল সেও একজন মুসলিম যুবক।

এরা কে? চিন্তার বিষয় নয় কি? কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। লালা জানতে চাইল, আমি কবে যাব? বললাম, "তোমার বাড়িতে যা খেয়েছি তা-ই আগে হজম করি, তারপর যাওয়ার কথা! আমার আমাশয় হয়েছে।"

"তা আমরা জানি, ওষুধ এনেছ; ডাক্তার ভালো ওষুধ দিয়েছে। দেখবে তোমার আমাশয় আর হবে না।"

লালাকে বললাম, "দুটো দিন অপেক্ষা করে দেখব আমাশয় আমাকে ছাড়ল, কি আমি আমাশয়কে ছাড়লাম! তারপর রওনা হব।"

লালা আর কিছুই বলল না, তার কাজ যেন শেষ হয়েছে! সে মহা আনন্দে আমাকে বিদায় দিল। কিন্তু মুসলমান ছেলেরা বিদায় দিল না, বলল, তাদের বাড়িতে খেতে হবে। রাজি হলাম বটে কিন্তু একটি শর্ত— দু-দিন পর খেতে যাব।

মুসলমান যুবকেরা তাতেই আনন্দিত হল। বুঝতে পারলাম না এদের আনন্দিত হবার কারণ কী? হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম-ঈশ্বর এই চারটি শব্দ আমাকে এত উত্ত্যক্ত করেছিল যে, নিজের দেশ ছাড়তে পারলেই যেন মহা আনন্দ! তখনও মনে চিনের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সেজন্যই বোধহয় এত উদ্‌বেগ!

ধরমশালায় ফিরে এসে শুয়ে রইলাম এবং ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ আর এক মাত্রা খেয়ে অনেকটা শান্তি পেলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারলাম শরীরে যেন কোনো রোগ নাই, দুর্বলতা লোপ পেয়েছে। শরীর ভালো থাকলে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় না, তাই সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম; দেখলাম, একদল ব্রিটিশ সেপাই মাতাল হয়ে পাঞ্জাবি পোশাক পরে মাতলামি করছে।

এখানে বলে রাখা ভালো, ভারতীয় মাতলামি আর অন্যান্য দেশের মাতলামি ভিন্ন রকমের। ব্রিটিশ হাজারো মাতাল হোক, তাদের নিজের প্রকৃতি পরিত্যাগ করতে পারে না। মাতাল হয়েও ব্রিটিশ সেপাই অথবা বৃটন স্বদেশে অথবা বিদেশে উন্মত্ত হয়ে বকে না। এদের মাতলামি অনেকক্ষণ দেখে ভাবলাম, যখন তোমাদের দেশে যাব তখন দেখব তোমরা কীরকম মাতাল!

বেশিক্ষণ বেড়াতে হল না, একজন পাঞ্জাবি শিখ আমাকে পাকড়াও করল। সে যাবে পৃথিবী ভ্রমণ করতে, কী করে পাসপোর্ট পেতে হয় বলে দিতে হবে। পাসপোর্টের কথা বলা হয়ে গেলে সে বলল, "সব সফা হোগিয়া, হাম যায়েগা।"

এরপর লোকটা চলে গেল।

তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমেরিকায়। সে তখন আর শিখ ছিল না। মাথার চুল, দাড়ি আর গোঁফ কামিয়ে সে ভদ্রলোক হয়েছিল, সে তার নামও পরিবর্তন করেছিল। তখন তার নতুন নাম হয়েছিল কিড।

পরবর্তীকালে কিড নরঘাতক হয়েছিল। ভারতবাসীকে হত্যা করতে পারলে সে আনন্দিত হত। কিড আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছিল, "অনেক ভারতবাসীকে খুন করেছি, আর খুন করব না, বিশ্রাম করছি। আমেরিকার বাসিন্দা হয়েছি। বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?"

উত্তর দিতে পারিনি, কী আর চাইব তার কাছে? চলে আসার সময় সে তার ডায়েরি আমাকে দিয়েছিল। টাইপ-করা সেই ডায়েরি সারারাত পড়েছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম, এখনও আমেরিকায় আছি, অতএব কিডের ডায়েরি আগামীকালের মধ্যে শেষ করে তাকে ফেরত দিতে হবে।

তার ডায়েরি শেষ করে ফেরত দিতে গিয়ে দেখি, সে ঘরে নেই। কতক্ষণ বসার পর ফিরে এল কিড। তারপর বলল, "পারবে তুমি বই লিখতে— এর উপর ভিত্তি করে?"

আমি বললাম, "পারব না কেন কিড? তবে ভ্রমণ লিখে শেষ করে তোমার ডায়েরির কথা লিখতে আরম্ভ করব। তখন তুমি কোথায় থাকবে কে জানে? দেখতে পাচ্ছ না যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, আমিও দেশে যাব। যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে তোমার অ্যাডভেঞ্চার-পূর্ণ ঘটনাবলিকে উপন্যাসে পরিণত করে প্রকাশ করব মনে করেছি।"

সেই রাওলপিণ্ডী, আর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া! শিখ!

এখানকার পাঠানদের চোখের তারা অনেকেরই নীল আর মুখাকৃতি নর্ডিক। স্ত্রীলোকের মধ্যে পর্দা-প্রথা থাকায় কেউই বাইরে আসেন না। যাঁদের ছেলেরা নর্ডিক, তাদের মায়েরা নিশ্চয়ই নর্ডিক হবেন তাতে আর কী সন্দেহ থাকতে পারে?

দিনটা কাটল ভালোই। পরের দিন সকালেই রওনা হবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জাতে বাঙালি হলে তখনকার দিনে কষ্টের অন্ত ছিল না। তিনজন নতুন লোক এলেন এবং বললেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন।

আপত্তি করলাম না। কিন্তু তাঁরা দেরি করলেন অনেকক্ষণ। রওনা হয়ে আর কোথাও দাঁড়ালাম না। টেনে চলতে আরম্ভ করলাম।

সাথিদের এতে কষ্ট হচ্ছিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছব মনস্থ করে এগিয়ে চলছিলাম এবং বিকেলেই পেশোয়ারে পৌঁছতে পেরেছিলাম। এর পরে যা ঘটেছিল, আফগানিস্তান ভ্রমণে বর্ণিত থাকায় তার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে না। ❑

# এ-যাবৎ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ

## পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

| বছর | বক্তা | বিষয় |
|---|---|---|
| ২০১১ | হরেকৃষ্ণ ডেকা | আধুনিক অসমিয়া কবিতার বিবর্তন |
| ২০১২ | বীরেন্দ্রনাথ দত্ত | অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের পটভূমিতে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব : এক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপাত |
| ২০১৩ | অমলেন্দু চক্রবর্তী | সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান |
| ২০১৪ | প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য | বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ |
| ২০১৫ | শিবনাথ বর্মন | বেজবরুয়ার জাতীয়তাবোধ : ইয়ার বঙ্গীয় পৃষ্ঠভূমি |
| ২০১৬ | প্রসেনজিৎ চৌধুরী | অন্য এক জ্যোতিপ্রসাদ |

## ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

| বছর | বক্তা | বিষয় |
|---|---|---|
| ২০১১ | তরুণ মুখোপাধ্যায় | আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন |
| ২০১২ | বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য | উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা |
| ২০১৩ | সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় | বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল |
| ২০১৪ | বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য | আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প |
| ২০১৫ | সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় | স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও তাঁর সংগীত সাধনা |
| ২০১৬ | সুমিতা চক্রবর্তী | বাংলা গদ্যের বিবর্তন ঃ সার্ধশতবর্ষ |

# এবার সহ গত কয়েক বছর রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ উন্মোচনকারী গুণীগণ :

| সাল | উন্মোচক |
|---|---|
| ২০১১ | বিশিষ্ট অসমিয়া কবি হীরেন ভট্টাচার্য |
| ২০১২ | বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ও সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত |
| ২০১৩ | বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ও সমালোচক ভবেন বরুয়া |
| ২০১৪ | বিশিষ্ট অসমিয়া বুদ্ধিজীবী ও 'দৈনিক জনসাধারণ' পত্রিকার সম্পাদক শিবনাথ বর্মন |
| ২০১৫ | অসমিয়া কবি তথা শিশুসাহিত্যের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীমতী তোষপ্রভা কলিতা |
| ২০১৬ | অসমিয়া ও বাংলা ভাষার সুপরিচিত লেখক শ্রীমতী অণিমা গুহ |
| ২০১৭ | সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক শ্রীমতী নিরুপমা বরগোহাঞি |

## ২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# অজিৎ বরুয়া

গত শতকের চল্লিশের দশকে আধুনিক অসমিয়া কবিতার জগতে মুষ্টিমেয় যে-কয়েকজন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অজিৎ বরুয়া তাঁদের অন্যতম।

প্রয়াত চিত্রমল্ল ও পদ্মলতা বরুয়ার পুত্র অজিৎ-এর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯২৬ সালের ১৯ আগস্ট। কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অসমে তৃতীয় স্থান লাভ করে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে কটন কলেজ থেকেই ইংরেজি অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতার বার্তা বহনকারী অজিৎ বরুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে রয়েছে 'তীখা', 'হাতুরী', 'মন-কুঁঅলী সময়', 'দুখর কবিতা', 'কিছুমান ব্রোঞ্জর ঢেকীয়া', 'এযোর তামর অর্ঘা', 'চেনর পারত' ইত্যাদি; অতঃপর 'জেংরাই ১৯৬৩' সহ 'ব্রহ্মপুত্র', 'শব্দ-সংবেদ্য', 'স্বর্ণচম্পা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসম্ভার। চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত কবিতার সঙ্গে তাঁর যে-দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতা, আধুনিক কবিতার প্রবক্তা টি. এস. এলিয়টের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও চর্চা, তৎসহ ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গেও সুপরিচিত হওয়ার মানসে কাব্যতত্ত্বের যে-নিরলস সাধনা তিনি করেছেন— সে-সবের জন্যই তাঁর কবি-পরিচিতি অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস) একজন নিষ্ঠাবান অফিসার হিসাবে অসম সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করে নামনি অসমের কমিশনার হিসাবে চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি ('কিছুমান পদ্য আরু গান', ১৯৮২)। পরবর্তী দুই দশকে, ১৯৮৩-২০০২ সময়কালে গান-কবিতা-অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাহিত্য-সমালোচনা ও প্রবন্ধের কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। অসমিয়া ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, ফরাসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মপুত্র, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি' এবং তিনিই গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ'-র প্রথম সংখ্যায় (১ জানুআরি ১৯৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এ-যাবৎ যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীবরুয়া তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৮), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) এবং অসম সরকার প্রদত্ত কবি গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)।

২০১৫ সালের ৩ এপ্রিল তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

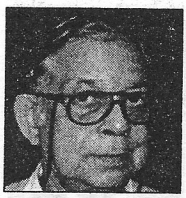

## ২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য গত চার দশক ধরেই একটি উজ্জ্বল নাম।

তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ঈশানচন্দ্র ও সুকুন্তলা ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সন্তান বিজিৎ-এর পড়াশোনা নিলামবাজারে বিপিনচন্দ্র হাইস্কুল, শিলঙে সেন্ট এডমান্ড্স কলেজ এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দির এস এস কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মজীবন শুরু। ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ২০০২ সালে।

সাহিত্যের প্রতি বিজিৎ-এর অনুরাগ কৈশোরকাল থেকেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'তরুণ' নামের এক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৫৪-৫৬), শিলঙে ছাত্রাবস্থায় সম্পাদনা করেন 'মুরজ', 'মৌসুমীরাগ' (১৯৬১-৬৩)। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে তাঁর সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। পত্রিকাটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখে এই অঞ্চলের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি সহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'দৃশ্যে নায়িকার অনুপস্থিতিতে' সেখানে মঞ্চস্থ হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৫ সালে।

বিজিৎ-এর প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা আট— ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেউ পরবাসী নয়', এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় 'জেগে আছে স্তব্ধতায়', 'সুন্দর যেখানে খেলা করে', 'মহাভারত কথা', 'পুনর্ভবা', 'ও ছেলে বাউল ছেলে', 'ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তাঁর সম্পাদিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৯৬৯) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের এক মলাটের মধ্যে স্থান দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অন্যান্য যে-সব গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ছয় খণ্ডের 'নির্বাচিত সাহিত্য'; 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা কাব্যচর্চা', 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বরাক উপত্যকার সঙ্গীতচর্চা' এবং 'বরাক উপত্যকায় চারুকলাচর্চা'। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বইগুলির নাম যথাক্রমে 'সুরক্ষিত বন্দিশালা', 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন', দুই খণ্ডে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যের সাতকাহন' এবং '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'। শ্রীভট্টাচার্যের স্মৃতিমূলক সুপাঠ্য রচনা 'বিকেলের আলো' প্রসাদগুণে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর আরও একটি স্মৃতিকথা 'দিনান্তের বৈঠক' এবং উপন্যাস 'পটভূমি' শিলচরের দুটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

বিজিৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার ১৯৯২', একই বছরে সেরা সম্পাদক হিসাবে 'অনির্বাণ' পুরস্কার, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক 'জীবনানন্দ শতবার্ষিকী পুরস্কার' (১৯৯৯) এবং 'রামকুমার নন্দী মজুমদার স্মৃতি পদক' (২০০২), গুয়াহাটিতে 'একা এবং কয়েকজন' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মান ও স্মারক' (২০০২) এবং কলকাতায় 'সাহিত্য-সেতু' পুরস্কার (২০০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

## ২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# হীরেন ভট্টাচার্য

তিনি ছবি আঁকেন, গান লেখেন। তাঁর কবিতায়ও তাই অনায়াস চিত্রধর্মিতা, অন্তর্লীন সুরের প্রবাহ, যা নিছক গীতিময়তা নয়।

বর্তমানে সৃষ্টিশীল অসমিয়া কবিদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য প্রবীণতম হয়েও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর চেহারায় যেমন কোনো বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা তেমনই মানুষটিও খুবই সাদাসিধে। পোশাকে পারিপাট্যের বালাই নেই, যেমন-তেমন একটা ট্রাউজার ও হাফশার্ট হলেই তাঁর চলে যায়, কখনো-কখনো কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, শীতকালে সোয়েটারের সঙ্গে মাফলার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে হলে দু-চার মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-শিল্পী সহ সাধারণ মানুষের এতটাই আপনজন যে 'হিরুদা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

প্রয়াত তীর্থনাথ ও স্নেহলতা ভট্টাচার্যের পুত্র হীরেনের জন্ম উজান অসমের যোরহাটে, ১৯৩২ সালের ২৮ জুলাই। ছোটবেলা কেটেছে যোরহাট ছাড়াও ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও তেজপুরে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। কলেজ-জীবন সুশৃঙ্খল ছিল না, শেষে গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইতি।

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখায় যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-কর্মী। কিছুদিন এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিভিন্ন প্রেসে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। ছিলেন আকাশবাণীর গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত গীতিকার। সাম্যবাদী কবি হীরেনের রচনায় প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যেখানে মিশে থাকে মাটির গন্ধ এবং সেইসঙ্গে রোমান্টিকতাও।

তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা' প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে, যদিও লেখালিখির শুরু পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। অসমিয়ার মতোই বাংলা ভাষায়ও তিনি সমান দক্ষ। চারটি বাংলা কাব্য-সংকলন সহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার র'দ' (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১), 'শইচর পথার মানুহ' (১৯৯১), 'জোনাকি মন ও অন্যান্য' (বাংলা, ১৯৯১), 'মোর প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার বোকামাটি' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার দিকচৌ বাটেরে' (২০০০), 'সিপার পরা পাতালৈকে' (২০০৯), 'বৃষ্টি পড়ে অঝোরে' (বাংলা, ২০১১) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য তার মধ্যে রয়েছে 'বিভিন্ন দিনর কবিতা'র জন্য অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা'র জন্য ১৯৮৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত বিষ্ণু রাভা পুরস্কার, একই বছরে একই গ্রন্থের জন্য ভারতীয় বিদ্যা ভবন প্রদত্ত রাজাজি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ওই বইয়ের জন্যই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, 'শইচর পথার মানুহ'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), উক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত বাজালিনী পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) এবং অসম সরকার প্রদত্ত গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)। এ-ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থান-এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন সৌহার্দ্য সম্মান।

পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি গ্রহণের প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ৪ জুলাই (২০১২) তাঁর দেহাবসান ঘটে।

## ২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট' থেকে 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরনোর পরই অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে। পরের বছরই, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'শবযাত্রা'— যা নিছক দীর্ঘকবিতা নয়, 'মহাকবিতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যেখানে আজও তিনি অনন্য।

রোহিণীকান্ত ও যোগমায়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পবিত্রের জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলায়, ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাল্যেই মাতৃবিয়োগ এবং মাসির স্নেহে বড় হয়ে ওঠা, তারপর দেশভাগের বলি হয়ে কলকাতায় ছিন্নমূল ও সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। কৈশোর থেকেই শুরু হয় চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। ছিল না কোনো স্থায়ী আস্তানাও। পড়াশোনা চালাতে হয় টিউশনি করে। কলেজে পড়ার সময়েই কাজ জোটে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে— প্রথমে লাইব্রেরিতে, পরে শিক্ষকতা। এম.এ. পাশ করার পর বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা।

ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশ করেন ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'কবিপত্র', এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অর্ধশতক অতিক্রম করেছেন। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে নিজেকে পালটেছেন, পরিবর্তিত হয়েছে রচনাভঙ্গি এবং তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে 'শবযাত্রা' ('ভাসান'-এ যার পরিসমাপ্তি) ছাড়াও আরও কয়েকটি মহাকবিতা— 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯, যেটি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'Iblish Confronts Himself' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লীলা রায়), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮২), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪), 'জতুগৃহে আছি' (২০০৯)। সনেট রচনায়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

আশির দশকে কবিতা নিয়ে শুরু করেন নতুন আন্দোলন— 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন', এল 'প্রয়োগবাদী কবিতা'। পবিত্রের নিজের কথায়— "পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে সহমর্মীর, দূরত্বের নয়।... আমাদের কবিতা পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন, এ-লেখাটা তাঁরই লেখার কথা, কীভাবে যেন অন্য কেউ লিখে ফেলেছে।" এভাবেই তিনি সমসাময়িক কবিদের চেয়ে হয়ে পড়েন স্বভাবত স্বতন্ত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' (১৯৮৫), 'আছি প্রেমে, বিষাদে, বিপ্লবে' (১৯৮৭), 'আরোগ্যভূমির দিকে' (১৯৯৪), 'বিষ নয়, উঠেছে অমৃত' (১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১), 'শোনো স্বপ্নভুক, শোনো (২০০৫), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭), 'আগুনে সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০), 'সচেতন স্বপ্নচারী' (২০১১) প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ: 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবির দেশ, কবিতার দেশ' (২০০৯), আত্মজীবনীমূলক 'দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পবিত্র তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, শিলীন্ধ্র পুরস্কার, পদ্মাগঙ্গা পুরস্কার, ভারতচন্দ্র পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কার, তারাশংকর-বিভূতি পুরস্কার, চোখ পুরস্কার, আমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, 'কবিপত্র' সম্পাদনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্মান প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সম্মাননা।

## ২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী নীলমণি ফুকন

অনেকের কাছে অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' হিসেবে তাঁর পরিচয়, তবে তিনি যে অসমিয়া কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন একজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক রূপেও।

কীর্তিনাথ ফুকন ও বরদাবালা দেবীর পুত্র নীলমণির জন্ম উজান অসমের দেরগাঁও-এ, ১৯৩৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। সেখানেই কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। দেরগাঁও হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন গুয়াহাটির কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে গুয়াহাটির আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান, সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ ১৯৯২ সালে।

নীলমণি শুধুই সমাজ-সচেতন কবি নন, দেশ ও রাজ্যের সমকালীন যাবতীয় বিষয় তাঁকে ভাবায়, ব্যক্তিগত অনুভূতিতে জারিত হয়ে উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর অনায়াস বৈদগ্ধ্যের পিছনে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অনলস অধ্যয়ন। তিনি যেমন খুবই কম লেখেন, তেমনই কবি হিসাবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ কিছুটা বিলম্বে। নীলমণির প্রথম কবিতা-সংকলন 'সূর্য হেনো নামি আহে এইনদীয়েদি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, রঙিয়ার 'প্রকাশন ঘর' থেকে। দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'নির্জনতার শব্দ' প্রকাশ পায় গুয়াহাটির বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'দত্ত বরুয়া' থেকে। এখন পর্যন্ত আটটি কাব্যগ্রন্থের জনক, যার মধ্যে রয়েছে 'আরু কি নৈঃশব্দ্য' (১৯৬৮), 'ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর ফালে' (১৯৭২), 'কাঁইট, গোলাপ আরু কাঁইট' (১৯৭৫), 'কবিতা' (১৯৮১), 'নৃত্যরতা পৃথিবী' (১৯৮৫) এবং 'অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলো' (২০০৩)।

তাঁর নির্বাচিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তিন : 'গোলাপী জামুর লগ্ন' (বাণী প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১৯৭৭), 'সাগরতলীর শঙ্খ' (ড. হীরেন গোহাঁই সম্পাদিত, লয়ার্স বুক স্টল, গুয়াহাটি, ১৯৯৪) এবং 'নীলমণি ফুকন : সম্পূর্ণ কবিতা' (অর্থাৎ, গুয়াহাটি, ২০০৬)। নীলমণির বাংলায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থও তিনটি : 'নির্বাচিত কবিতা : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক তড়িৎ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪), 'পড়োশি গোলাপ : নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রমানাথ ভট্টাচার্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৭) এবং 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রবীন্দ্র সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৭)। তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সিলেক্টেড পোয়েম্‌স : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক কৃষ্ণদুলাল বরুয়া, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি, ২০০৭), তা ছাড়া 'বিচিত্র লেখা', যা কয়েকটি নির্বাচিত গদ্য ও অনূদিত কবিতার সংকলন (বনফুল, ২০১০)। অসমিয়া ভাষায় লেখা তাঁর শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক বইগুলি হল 'লোক কল্পদৃষ্টি' (১৯৮৭), 'রূপ বর্ণ বাক্' (১৯৮৮), 'শিল্পকলা দর্শন' (১৯৯৮) এবং 'শিল্পকলার উপলব্ধি আরু আনন্দ' (অন্বেষা, ২০১২)। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটির নাম 'পাতি সোনারুর ফুল' (২০০৬)।

কবি হিসাবে ১৯৮২ সালে নীলমণি ম্যাসিডোনিয়ায় 'স্ট্রুগা পোয়েট্রি ইভনিং'-এ অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অসম সাহিত্য সভার 'রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার' (১৯৭২), কবিতার জন্য অসম প্রকাশন পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮১), 'লোক কল্পদৃষ্টি' গ্রন্থের জন্য জগদ্ধাত্রী হরমোহন পুরস্কার (১৯৮৮), অসম সাহিত্য সভার 'ছগনলাল জৈন পুরস্কার' (১৯৯১), কমলকুমারী ফাউন্ডেশন প্রদত্ত 'কমলকুমারী জাতীয় পুরস্কার' (১৯৯৪), উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত 'অসম উপত্যকা পুরস্কার' (১৯৯৮), ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০০), জোশুয়া ফাউন্ডেশনের 'জোশুয়া সাহিত্য পুরস্কারম' (হায়দরাবাদ, ২০০১), গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার (সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওড়িশা, ২০০২)। এ-ছাড়া পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন (১৯৯০), নয়াদিল্লির মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সম্মানিত সদস্য ছিলেন (১৯৯৯-২০০১) এবং ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির 'ফেলো'।

## ২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী তরুণ সান্যাল

তরুণ সান্যাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহ বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকলেও কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাঁর কবিজীবন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতার সমবয়সি। কিশোরদের পত্রিকা 'রামধনু'-তে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ সালে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে। এবং আজও তাঁর সৃজনশীলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আইনজীবী পিতা অশ্বিনীকুমার সান্যাল ও হিরণময়ী দেবীর পুত্র তরুণের জন্ম পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় শাহাজাদপুর পরগনার পোরজনায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর (১২ কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে পোরজনা ছাড়াও বাঁকুড়া, রাজশাহি ও বর্ধমান জেলা এবং কলকাতায়। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৭ সালে কয়েক মাস উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনার পর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে যোগ দেন। সেখানেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৪ সালে সহাধ্যক্ষ হিসাবে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তরুণ সান্যাল সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুবাদে মাত্র দশ বছর বয়সেই বাঁকুড়ার এক মিছিলে যোগ দিয়ে কাঁদানে গ্যাসে আহত হন। শেষ-কৈশোরেই (১৯৪৯-৫০) নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলা কারাগারে অন্তরিন হন, পরেও একাধিক বার রাজবন্দি হয়েছেন। সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন ১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনেও। কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী তরুণ ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে যেমন প্রচারে নেমেছেন, তেমনই যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও, ওই অস্থির দিনগুলোতে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়দান ও জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার আহ্বায়ক এবং ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক (১৯৭২-৮১)। ১৯৮১ সালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্য ও চলচ্চিত্র সহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তরুণ সান্যালের প্রথম কবিতা-সংকলন 'মাটির বেহালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এখন পর্যন্ত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চব্বিশ। সাম্প্রতিকতম দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বাউকুড়ানির ব্রহ্মডাঙা' (২০০৯) এবং 'হাত ভরা ফুলের গল্প' (২০১০)। 'সর্বেশ্বরী শব্দেশ্বরী', 'মরিয়মের মীরা', 'অচিন পাখির একা', 'সন্ত্রাসে সংলাপে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন। তা ছাড়া রয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দে'জ, কলকাতা), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ঢাকা), 'কবিতা সংগ্রহ' দুই খণ্ড (দে'জ) এবং 'কবিতা সমগ্র' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড (দিয়া প্রকাশন)। তিনি মোট ৪২টি কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ৩৫টি গ্রন্থভুক্ত। তাঁর অনূদিত কবিতার বই তিনটি এবং চারটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আট।

যে-সব পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তরুণ যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'একতা' (১৯৫৫), 'কবিপত্র' (যুগ্মভাবে, ১৯৫৮), 'সীমান্ত' (১৯৬২-৬৭), 'পরিচয়' (যুগ্মভাবে, ১৯৬৭-৭৫), 'রুশ-ভারতী' (১৯৭২-৮১), এ-ছাড়া ২০০২ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

বাংলাভাষায় গত শতকের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি হিসাবে চিহ্নিত তরুণ সান্যাল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৭১), বিষ্ণু দে স্মারক সম্মান, রামমোহন সম্মান, বঙ্গবন্ধু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও প্রায় ২০টি সম্মান, ভারতভাষা ভূষণ সম্মান (১৯৯৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০০৬), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সম্মান (২০১২) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

## ২০১৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অসমিয়া কাব্যভুবনে নীলমণি ফুকনকে যদি বলা হয় অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' তাহলে অসমের 'বুদ্ধদেব বসু' হিসেবে নিশ্চয় পরিচিত হওয়া উচিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন ঠিক বুদ্ধদেব বসুর মতোই। পাশাপাশি লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও নিখাদ গদ্য। বস্তুত কাব্যজগতে এই কবি বেশ দেরিতে প্রবেশ করেছেন বলা যায়। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সোমধিরির সোঁররণি আরু অন্যান্য কবিতা'। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি যে-নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখেন তা পরবর্তী কালেও অম্লান রয়েছে।

১৯৩৭ সালের পয়লা মার্চ যোরহাট জেলার তিতাবরে জন্ম হীরেন্দ্রনাথের। পড়াশোনা তিতাবর স্কুল থেকে গুয়াহাটির কটন কলেজ (ইংরেজিতে অনার্স) হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৫৯ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার লেকচারার হিসেবে যোগ দেন, ১৯৮২-তে রিডার পদে উন্নীত হন এবং ২০০০ সালে কর্মজীবনের ইতি টানেন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকেই।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ তিনটি— 'সোমধিরির সোঁররণি আরু অন্যান্য কবিতা' (১৯৮১), 'মানুহ অনুকূলে' (২০০০) ও 'পল অনুপলর আঁচ' (২০০৭)। পাশাপাশি লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা। তাঁর আলোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন 'কিতাপর ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তাঁর প্রবন্ধের আরেকটি বই 'নির্বাচিত সমালোচনা'। ইংরেজি ভাষায় সম্পাদনা করেছেন প্রদীপ আচার্য অনূদিত 'ওআন হানড্রেড ইয়ার্স অব অ্যাসামিজ পোয়েট্রি'। অসম সরকারের প্রকাশনা পর্ষৎ প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হীরেন্দ্রনাথ-লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানুহ অনুকূলে'র জন্য ২০০৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অসমিয়া কবিতায় নিয়ে এসেছেন মেধা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের এক বিশেষ ঝলক। কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধুই সংখ্যা দিয়ে নিজেকে সমকালীন রাখা নয়, হীরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন অনেকটা নির্জনে, একাকী। কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন সবই হয়ে ওঠে মন্ত্র। তাঁর ভাষা চিত্রধর্মী, কবিতায় অনেক সময় তিনি গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতির কোল থেকে উঠে আসে তাঁর চিত্রকল্প, লোকগীতি বা রূপকথা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি। সেইসঙ্গে রয়েছে সংগীতময়তার অভিব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিষাদ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতার প্রিয় বিষয়।

১৯৮৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ ভূপালের ভারত ভবনে যোগ দেন 'কবি ভারতী কবিসম্মেলন'-এ। দু-বছর পর 'অসম সাহিত্য সভা'-র ডুমডুমা অধিবেশনের কবিসম্মেলনের তিনিই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি। অসমের বিখ্যাত সাময়িকপত্র 'গরীয়সী' ও 'প্রকাশ'-এ তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু অসমিয়া নয়, তাঁর শাণিত মেধা ঝরে পড়েছে ইংরেজিতেও। সাহিত্য অকাদেমির গুয়াহাটি, কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন কবিসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ।

২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুআরি তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

## ২০১৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী স্বপন সেনগুপ্ত

ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ : পাখি' যখন প্রকাশিত হয় তখন ত্রিপুরার কবি স্বপন সেনগুপ্তের বয়স মাত্র একুশ বছর। কবিরা সাধারণত হাত পাকান লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অথচ এই কবি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখার আগেই নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ফেলেছেন। আর যখন তিনি লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'নান্দীমুখ' বের করলেন, অচিরেই সেটি হয়ে উঠল শুধু ত্রিপুরা বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট পত্রিকা।

কবি স্বপন সেনগুপ্তের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২ ডিসেম্বর। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়া। শেষপর্যন্ত সাহিত্য বিষয়েই পিএইচডি। ছাত্রজীবনেই কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেন নিজ কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দু-বছর পর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নান্দীমুখ'। বাংলা ভাষার বহু উল্লেখযোগ্য কবি এই পত্রিকায় লিখেছেন। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('এ আমার ভিখিরি হাত নয়') প্রকাশিত হয় দীর্ঘদিন পরে, ১৯৮৫ সালে। সে-বছরই আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া'। এমন নয় যে এই কবি শুধু নিজের কাব্যভুবনেই আত্মমগ্ন। বরং তিনি খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়েছেন ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা লেখালিখির জগতের সঙ্গে। ১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দ্বাদশ অশ্বারোহী', যেখানে রয়েছে ত্রিপুরার ১২ জন বিশিষ্ট কবির কবিতা। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কবিদের কবিতা নিয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'গঙ্গা গোমতী'। একই সময়ে স্বপন সেনগুপ্ত কিন্তু নিজস্ব পত্রিকা 'নান্দীমুখ'ও সম্পাদনা করে চলেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আরও দুটি গ্রন্থ—যথাক্রমে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' ও 'অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা ও কাব্যালোচনা'।

বর্তমান শতকে প্রকাশিত স্বপনের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ হল 'ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী', 'যুগলবন্দি তুফান', 'দহন ও জলস্তর', 'কবিতা সমগ্র-১' ও 'হারানো ঢেউয়ের জলপাই শিস'। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এ ছাড়া রয়েছে গদ্যগ্রন্থ 'স্বনির্বাচিত লেখালেখি' (২০০৬)।

স্বপন সেনগুপ্ত 'নান্দীমুখ' সম্পাদনা করেছেন ২৭ বছর। সম্পাদনা করেছেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পাক্ষিক পত্রিকা 'গোমতী'ও। কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করলেও স্বপন সেনগুপ্তের গদ্যের হাতটি যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন সাময়িকী ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। 'বিশ্ববাংলা কবিতা সংকলন'ও 'পেঙ্গুইন বুকস্'-এর Dancing Earth কাব্য সংকলনে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন স্বপন তার মধ্যে রয়েছে সারা বাংলা কবি সম্মেলন থেকে সংবর্ধনা (১৯৭২), ত্রিপুরা সরকারের কবি সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার (২০০৬), রবীন্দ্র পরিষদ থেকে বিজনকৃষ্ণ সাহিত্য পুরস্কার (২০০৭), ত্রিপুরা সরকারের কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার (২০১১) এবং ঢাকায় জাতীয় কবিতা পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রণ (২০১৩)।

## ২০১৪ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী ভবেন বরুয়া

শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্যিক ভবেন বরুয়ার জন্ম উজান অসমের শিবসাগর জেলায় যোরহাট মহকুমার অন্তর্গত জানজিতে, ১৯৩৯ সালের ১৬ ফেব্রুআরি। দেবেন্দ্রনাথ ও কাঞ্চনবালা বরুয়ার সন্তান ভবেনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রামের স্কুলে, তবে ম্যাট্রিক পাশ করেন গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে, ১৯৫৬ সালে। যোরহাটের জগন্নাথ বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিনি ইংরেজি অনার্স নিয়ে স্নাতক হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পান ভবেন। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ভবেন বরুয়া অতিবাহিত করেছেন শিক্ষকতায়। যোরহাটে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যে-কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তার শেষ হয় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে। মাঝখানে তিনি পাতিয়ালার পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিমলায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি-তেও কাজ করেছেন, ছয়ের দশকে তিনবছর ছিলেন আকাশবাণী, দিল্লির অসমিয়া সংবাদপাঠক।

ইংরেজির শিক্ষকতা করলেও ভবেন বরুয়ার অসমিয়া ভাষায় ছন্দের হাত চমৎকার। 'সোনালী জাহাজ' কাব্যগ্রন্থের জন্য লাভ করেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। এই গ্রন্থটিই তাঁকে এনে দেয় আসাম পাবলিকেশন বোর্ড সাহিত্য সম্মান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'নতুন পৃথিবী' (বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠকালে প্রকাশিত), 'সোনালী জাহাজ', 'পোন্ধরটা কবিতা', 'বগা জুই কলা জুই আরু অন্যান্য কবিতা', 'অসমিয়া কবিতা : রূপান্তরর পর্ব', 'অসমিয়া কবিতা : বিবর্তনর পর্ব', 'প্রসঙ্গ : কবিতা', 'প্রসঙ্গ : বাণীকান্ত', 'প্রসঙ্গ : জ্যোতিপ্রসাদ', 'প্রসঙ্গ : ভবেন্দ্রনাথ', 'অসমর বৌদ্ধিক দুরবস্থার প্রসঙ্গত', 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া', 'সায়েন্স, পোয়েট্রি অ্যান্ড পলিটিক্স'।

শিক্ষকতা ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ভবেন বরুয়া বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'সংলাপ' (অসমিয়া), 'আসাম কোয়ার্টারলি' (ইংরেজি), 'জার্নাল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব গৌহাটি : আর্টস' (ইংরেজি), 'সুদর্শন' (ইংরেজি), 'নতুন পর্যায়র সংলাপ' (অসমিয়া)।

অসম তথা ভারতে ভবেন বরুয়া বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সম্মেলন ও সভায় তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. সি. দেব শতবার্ষিকী বক্তৃতা, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেইন্ট শংকরদেব, ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য ফিলসফি অব বৈষ্ণবিজ্‌ম', প্রথম আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন স্মারক বক্তৃতা, অসম সাহিত্য সভা আয়োজিত প্রথম আনন্দরাম বরুয়া স্মারক বক্তৃতা, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মহেন্দ্র বরা স্মারক বক্তৃতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে 'ফ্রম ইমিটেশন টু ইমাজিনেশন' প্রভৃতি।

এ-ছাড়া ২০০৫ সালে সিপাঝাড়ে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার ৬৮তম অধিবেশনে কবিসম্মেলন উদ্‌বোধন করেন। পূর্ব ইউরোপে আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় কবি হিসেবে ভবেন বরুয়াকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল সাহিত্য অকাদেমি। সেবার তিনি ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঘুরে আসেন।

ভবেন বরুয়ার পত্নী দীপা ভারতীয় মার্গ সংগীত এবং চিত্রশিল্পে পারদর্শী। দুই পুত্র অঙ্কুর ও অর্পণ উচ্চশিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

## ২০১৪ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী শ্যামলকান্তি দাশ

জন্ম ১৯৫১ সালের ৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রামে। বাবা পুরুষোত্তমপ্রসাদ দাশ, মা শেফালি দাশ। দুজনেই প্রয়াত। স্ত্রী শুক্লা দাশ।

শিক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহিষাদল রাজ কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (অসমাপ্ত)। কর্মজীবন শুরু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিক মাসিক 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। মধ্যে অল্প কিছুদিন মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা। পরে আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থায় যোগদান। প্রায় ২৮ বছর সাংবাদিকতার পর স্বেচ্ছা-অবসর। অতঃপর ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কবির কাগজ কবিতার কাগজ' মাসিক 'কবিসম্মেলন'। সম্পাদকের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বিশিষ্ট কবি ও গদ্যলেখকদের সৃষ্টিশীল অবদানে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও সজীব এবং জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চির সবুজ লেখা' (পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোর আকাদেমির মুখপত্র) পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'পাঠশালা' পত্রিকায়, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কবিতার নাম 'এই তো আমার পণ'।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কাগজকুচি', প্রকাশ পায় ১৯৭৬ সালে।

ছোটদের কবিতায়ও শ্যামলকান্তির নিজস্বতা ও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। উপহার দিয়েছেন বেশকিছু অনবদ্য ছড়া। চমৎকার তাঁর ছন্দের জ্ঞান। বড়দের ও ছোটদের মিলিয়ে তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা ৩৫। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কাগজকুচি', 'প্রেমের কবিতা', 'ভূতের চরণে', 'আমাদের কবিজন্ম', 'সরল কবিতা', 'ছোট শহরের হাওয়া', 'দূর থেকে লিখি', 'বোকা মেয়ের জন্য', 'চলে যায় দিন', 'পুলকিত যামিনী', 'একলা পাগল', 'নির্বাচিত কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। বাংলাদেশেও শ্যামলকান্তির জনপ্রিয়তার প্রমাণ সেখান থেকে প্রকাশিত 'স্বনির্বাচিত কবিতা', 'বন্ধুর মুখোশে বন্ধু', 'ভেসে বেড়াবার আনন্দ', 'ঝুপসি দিদির গানের বাড়ি', 'প্রিয় ১০০ কবিতা', ও 'ধানী পটকা' (বড়দের ছড়া)।

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'বাবুইবাবু', 'চাইছি ঘুড়ি মাঞ্জা সুতো', 'পাতায় মোড়া বাঁশি', 'পাখি সব করে রব', 'বাঘের গায়ে হলদে জামা', 'শ্রেষ্ঠ ছড়া' এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'আমপাতা জামপাতা' ও 'মনে কর ঘুমিয়ে আছিস'।

বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'কবিসম্মেলন' ছাড়াও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রতীতি', 'জনপদ', 'কবিতা সংবাদ', 'কনসার্ট', 'আত্মজ' প্রভৃতি। সম্পাদিত নানা বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা একশোরও বেশি। সম্পাদিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই : 'হাজার কবির হাজার কবিতা', 'বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'লেখক সত্যজিৎ রায়', 'আহ্লাদে আটখানা', 'দুই বাংলার প্রাণের কবিতা', 'দুই বাংলার আবৃত্তির কবিতা', '১০০ ছড়া ১০০ ছবি', 'ছোটদের আবৃত্তির কবিতা', 'চেনা সুনীল অচেনা সুনীল', 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' প্রভৃতি।

কবি ও কবিতা নিয়ে নানারকম কাজে শ্যামলকান্তি সর্বদাই অক্লান্ত। সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল 'সৌহার্দ্য ৭০', 'সারা ভারত কবিতা উৎসব', 'বিশ্ব বাংলা কবিতা উৎসব', 'সারা বাংলা শিশু সাহিত্য উৎসব', 'সারা বাংলা তরুণ লেখক সম্মেলন' প্রভৃতি।

অজস্র সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত। তার মধ্যে রয়েছে : জীবনানন্দ পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, সাহিত্য সেতু পুরস্কার, তুষার রায় পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার, 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার সাধনা চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার, লেখক সম্প্রীতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), সীমান্ত সাহিত্য পুরস্কার, নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদ সম্মাননা, আনন্দ স্লোসেম পুরস্কার (শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কৃষ্ণ' কবিতার জন্য), শিবরাম চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (মালদহ), শিশু সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, তেপান্তর পুরস্কার, ডা. ওয়াজেদ স্মৃতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), আনিকা ইউসুফজাই স্মৃতি পুরস্কার (টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ), ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি পুরস্কার, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার (কোচবিহার, দু-বার, কবিতা ও সম্পাদনার জন্য), কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি।

২০০৯ সালে পেয়েছেন ভারত সরকার প্রদত্ত 'জাতীয় কবি'র সম্মান, গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে।

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত এবং বিদেশের বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্যামলকান্তির একাধিক কবিতা।

## ২০১৫ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা

অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক হরেকৃষ্ণ ডেকার জন্ম ১৯৪৩ সালে, উজান অসমের তিনসুকিয়ায়। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হরেকৃষ্ণ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর।

এরপর বছর তিনেক একটি কলেজে অধ্যাপনা করলেও শেষ পর্যন্ত অসম-মেঘালয় ক্যাডারের আইপিএস হয়ে অসমের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পুলিশ-প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠান করেও হরেকৃষ্ণ ডেকা কবিতা থেকে কখনো দূরে থাকেননি। খুব ছোটবেলা থেকেই দৈনিক সংবাদপত্রে লেখালিখি করতেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বরবর'। এরপর লিখেছেন 'রাতির শোভাযাত্রা', 'আন এজন', 'ভাল পোয়ার বাবে এষার', 'ছানমিয়ালি বর্ণমালা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। 'আন এজন' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৮৭ সালে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

শুধু কবিতা নয়, হরেকৃষ্ণ ডেকা অসমিয়া সাহিত্যজগতে চিরকালের জন্য স্মরণযোগ্য নাম হিসেবে থেকে যাবেন ছোটগল্পের জন্যও। তাঁর ছয়টি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল 'প্রাকৃতিক আরু অনন্যা', 'মধুসূদনর দলং', 'বন্দিয়ার', 'পোস্ট-মডার্ন অথবা গল্প', 'মৃত্যুদণ্ড' এবং 'গল্প আরু কল্প'। 'বন্দিয়ার' গল্পগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে কথা পুরস্কার পেয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ ডেকার আলোচনাগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। 'আধুনিকতাবাদ আরু অন্যান্য প্রবন্ধ', 'দৃষ্টি আরু সৃষ্টি', 'নীলমণি ফুকন : কবি আরু কবিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি অসমিয়া সাহিত্যের হালহকিকত নিয়ে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া লিখেছেন দুটি উপন্যাস— 'আগন্তুক' ও 'তরুণ প্রজন্মর কবিতা'।

হরেকৃষ্ণ ডেকার লেখার মূল বৈশিষ্ট্য সমাজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। তাঁর যে-কোনো চরিত্রই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে আধুনিক সময়ের প্রতীক। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সবসময় পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন তিনি।

সাহিত্য অকাদেমি ও কথা সাহিত্য পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন অসমিয়া সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান— অসম ভ্যালি লিটারারি অ্যাওয়ার্ড।

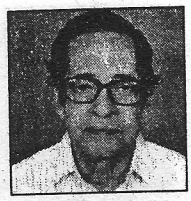

## ২০১৫ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

# শ্রী রত্নেশ্বর হাজরা

বাংলা কাব্যজগতে গত শতকের ছয়ের দশকের কবি রত্নেশ্বর হাজরার জন্ম অবিভক্ত ভারতের বরিশাল জেলার ভরতকাঠি গ্রামে, ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে। মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতৃহারা বালক বাঁধনহারা হয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন।

১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গার অভিঘাতে উদ্‌বাস্তু হয়ে চলে আসেন কলকাতায়, আত্মীয়ের আশ্রয়ে শুরু হয় নতুন জীবন। স্কুলজীবন শেষ করে চাকরির উদ্দেশ্যে মোটর মেকানিজ্‌ম শিখতে শুরু করেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের থার্মোমিটার তৈরির একটা কারখানায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু দুটিই ছিল অসমাপ্ত। পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকরিতে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই অবসর।

কলেজ-জীবন থেকে কবিতাচর্চার শুরু। লিট্‌ল ম্যাগাজিন ছাড়া তখনকার 'ভারতবর্ষ' ও 'তরুণের স্বপ্ন' প্রভৃতি ঐতিহ্যশালী পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণঋতু' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর পর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'লোকায়ত অলৌকিক', 'জলবায়ু', 'গতকাল আজ এবং আমি', 'এদিকে দক্ষিণ', 'রাজি আছি', 'উপত্যকায় একা', 'আছি নির্বাসিত', 'নিজস্ব মানচিত্র', 'শেখানো ছবিগুলো', 'ধুলোস্নান' প্রভৃতি। লিখেছেন ছোটদের জন্য ছড়া/কবিতার বই— 'মেঘের দিদা বরফদানা', 'রত্নমালার যাদুকর', 'সবুজ পরিকে নেমন্তন্ন', 'মাটির ঘড়া স্বপ্নে ভরা', 'অলীকপুর একটু দূর' প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে ছয়টি কাব্যনাটকের সংকলনও।

রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় আঙ্গিক-সচেতনতা, রহস্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, যতিচিহ্নহীনতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোটদের জন্য লেখা কবিতায় পাওয়া যায় গ্রামবাংলার জলকাদার গন্ধ, শোনা যায় সুপুরিবাগানে ঘুঘুর উদাস-করা ডাক, ছবি হয়ে ওঠে বনপিপুল, অম্লবেতস, আমলকী, শতমূলী প্রভৃতি দৃশ্যের অনুষঙ্গ।

বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন কবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিজ্ঞান পুরস্কার, মহাদিগন্ত পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি সম্মাননা, শিশুসাহিত্য পরিষদ পুরস্কার প্রভৃতি।

## ২০১৬ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

# শ্রী সনন্ত তাঁতি

আধুনিক অসমিয়া কবিতার নীরব সাধক সনন্ত তাঁতির জন্ম ১৯৫২ সালে, অসমের বাংলাদেশ-সংলগ্ন বরাক উপত্যকায় করিমগঞ্জ জেলার কালীনগর চা-বাগানে। ওড়িয়াভাষী চা-বাগান শ্রমিকের সন্তান সনন্ত নিকটবর্তী শহর রামকৃষ্ণনগরে বড় হয়ে ওঠেন। পরে শৈলশহর শিলঙে পড়াশোনা এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ।

ছেলেবেলাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। স্বভাবতই এই ভাষার প্রেমে পড়েন, যা আজও অম্লান। তাঁর প্রথম রচনাও বাংলা ভাষায় লেখা একটি প্রেমের কবিতা। যৌবনে যোরহাটে বসবাসকালে তিনি অসমিয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে এই ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা উপলব্ধি করেন, যা অসমিয়া সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে এবং এই ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সনন্ত এমন একজন কবি যাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়া, শিক্ষা বাংলা মাধ্যমে আর কবিতা রচনা অসমিয়া ভাষায়— নিঃসন্দেহে এ এক বিরল কৃতিত্ব। সাম্যবাদী ভাবধারায় পুষ্ট তাঁর জীবন ও সংবেদনশীলতা আশির দশকে অসমের রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনগুলিতে তাঁর কবিতায় জুগিয়েছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

সনন্তের অসমিয়া কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তেরো। তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্য যেমন পাঠকের ভালোবাসা অর্জন করেছে তেমনই সমালোচকদের দ্বারাও উচ্চপ্রশংসিত। তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'উজ্জ্বল নক্ষত্রর সন্ধানত' প্রকাশ পায় ১৯৮১ সালে, চার বছর পরে বেরোয় দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মই মানুহর অমল উৎসব'। সনন্তের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'নিজর বিরুদ্ধে শেষ প্রস্তাব' (১৯৯০), 'শব্দত অথবা শব্দহীনতাত' (১৯৯৩), 'মৃত্যুর আগর স্টপেজত' (১৯৯৬), 'টেপনিতো কেতিয়াবা বারিষা আহে' (১৯৯৭), 'ধুঁয়া ছাইর সপোন' (১৯৯৯), 'দীর্ণ বসন্তর সৌরভ' (২০০২), 'আপুনি আপোনার স'তে যুদ্ধ করিব পারিবনে' (২০০৪), 'মই' (অর্থাৎ 'আমি', ২০০৮), 'মোর নিরাভরণ আত্মার শোকাবহ শব্দবোর' (২০১০), 'কাইলর দিনটো আমার হ'ব' (২০১৩)। গত মাসে (ফেব্রুআরি, ২০১৭) প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ত্রয়োদশ অসমিয়া কাব্যগ্রন্থ 'মোর প্রিয় সপোনর ওচরে-পাঁজরে' আর তাঁর কবিতার দিব্যজ্যোতি শর্মা কৃত ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ 'Selected Poems'.

সার্ক-ভুক্ত দেশগুলির লেখকদের সম্মেলন সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সনন্ত। তিনি ইতিমধ্যেই যে-সব পুরস্কারে ভূষিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯২ সালে অসম কবি সমাজ প্রদত্ত মৃণালিনী দেবী গোস্বামী পুরস্কার, ২০০২ সালে বীর বিরসা মুন্ডা পুরস্কার, ২০১১ সালে চর চাপোরি সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত ওসমান আলি সদাগর সমন্বয় পুরস্কার, ২০১৪ সালে ক্রান্তিকাল সম্মান, ২০১৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত নিজরা কবি শৈলধর রাজখোয়া পুরস্কার এবং ২০১৬ সালে এপিপিএল প্রদত্ত শিরিষ-অয়েল সাহিত্য পুরস্কার।

অসম সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন চা-শ্রমিকদের পেনশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ড সংক্রান্ত অর্ধ-সরকারি সংস্থা থেকে ২০১২ সালে ডেপুটি পিএফ কমিশনার হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন সনন্ত, তার পরও ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ওই সংস্থায় অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে কাজ করেছেন।

## ২০১৬ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

# শ্রী উদয়ন ঘোষ

জন্ম ১৯৪৩ সালে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন কেটেছে ইমফল, শিলচর, গুয়াহাটি আর শিলঙে। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লেখেন উদয়ন, পরবর্তীকালে প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি অনুবাদও করেছেন। কর্মজীবন কেটেছে শিলং কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কিশোরীমোহন পাঠক আর পরশকুমার চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অল্পস্বল্প গবেষণাও করেছেন।

বর্তমানে কলকাতা নিবাসী উদয়ন একসময়ে শিলচরের বিখ্যাত কবিতা-পত্রিকা 'অতন্দ্র'-র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন ১৯ বছর। যখন যেখানে থাকেন সেখানেই ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা তাঁর অন্যতম নেশা। মার্ক্সবাদী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব ভাষার নির্বাচিত কবিতা সংকলন করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, সংকলনটি সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশ পাবে। উদয়নের কিছু-কিছু অনুবাদ পেঙ্গুইন-এর এক সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে উদয়নের যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঝোপ জঙ্গলের কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'কমলকুমার বোধিনী-১', 'হরিশ্চন্দ্র' (বনসাই উপন্যাস) আর 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর দেড়শো বছর'। তাঁর অন্য যে-সব গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় তার মধ্যে রয়েছে 'অর্কিড উপত্যকার ভালোবাসার গান', 'নাগা পাহাড়ের গান', 'পয়েন্টেলিস্টের আত্মকথা', 'কমলকুমার বোধিনী-২', 'উড়ো কবিতার ঝুড়ো ফুল', সংলাপ কাব্য 'রক্ত সিংহাসন' ও 'ব্ল্যাকহোল রেডিয়েশন', প্রবন্ধ সংকলন 'একথা, ওকথা, মাতকথা' এবং 'সলোমনের গান'।

হাইলাকান্দির 'সাহিত্য' পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্মান লাভ করেছেন ২০০৭ সালে।

# বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

## সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য

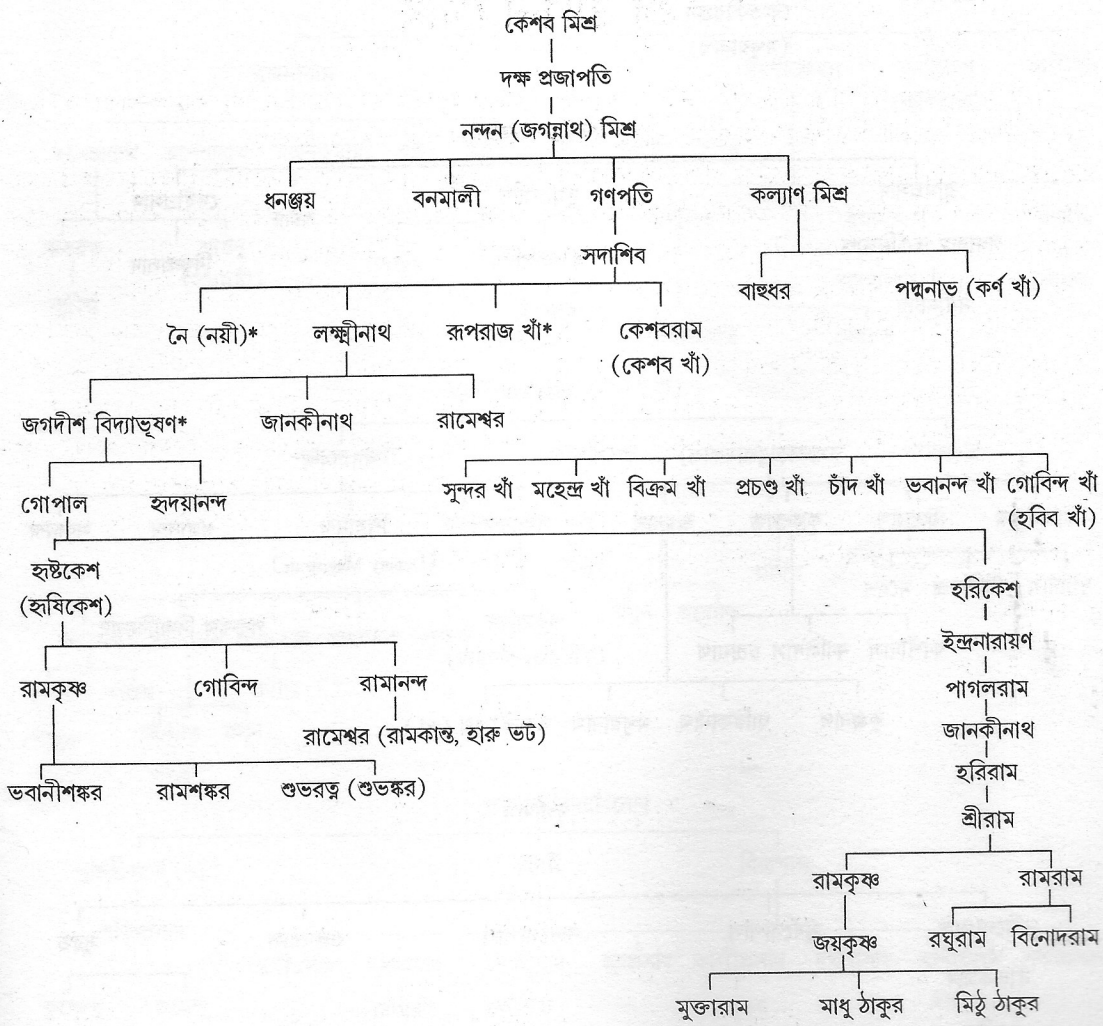

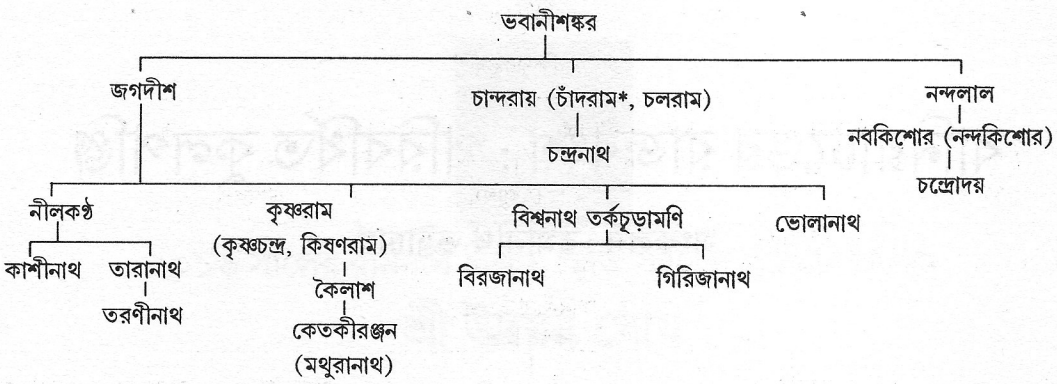
ভবানীশঙ্কর
জগদীশ
চান্দরায় (চাঁদরাম*, চলরাম)
নন্দলাল
চন্দ্রনাথ
নবকিশোর (নন্দকিশোর)
চন্দ্রোদয়
নীলকণ্ঠ
কৃষ্ণরাম
(কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি
ভোলানাথ
কাশীনাথ
তারানাথ
তরণীনাথ
কৈলাশ
কেতকীরঞ্জন
(মথুরানাথ)
বিরজানাথ
গিরিজানাথ

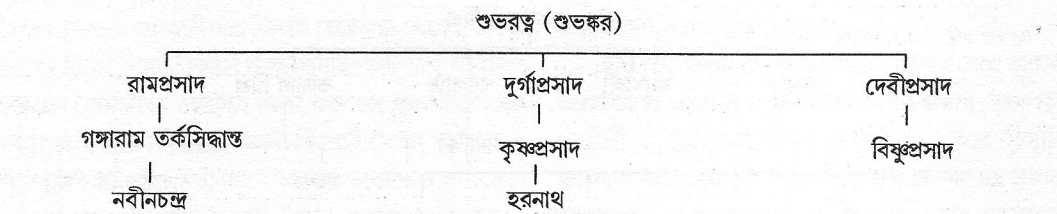
শুভরত্ন (শুভঙ্কর)
রামপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত
কৃষ্ণপ্রসাদ
বিষ্ণুপ্রসাদ
নবীনচন্দ্র
হরনাথ

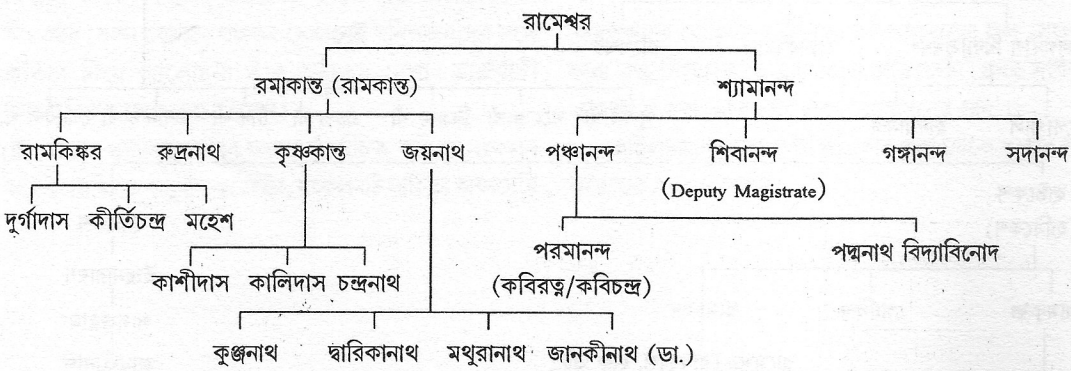
রামেশ্বর
রমাকান্ত (রামকান্ত)
শ্যামানন্দ
রামকিঙ্কর
রুদ্রনাথ
কৃষ্ণকান্ত
জয়নাথ
পঞ্চানন্দ
শিবানন্দ
(Deputy Magistrate)
গঙ্গানন্দ
সদানন্দ
দুর্গাদাস
কীর্তিচন্দ্র
মহেশ
পরমানন্দ
(কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
কাশীদাস
কালিদাস
চন্দ্রনাথ
কুঞ্জনাথ
দ্বারিকানাথ
মথুরানাথ
জানকীনাথ (ডা.)

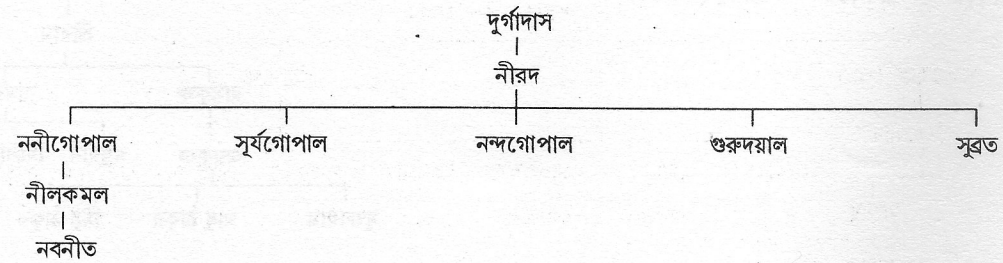
দুর্গাদাস
নীরদ
ননীগোপাল
সূর্যগোপাল
নন্দগোপাল
গুরুদয়াল
সুব্রত
নীলকমল
নবনীত

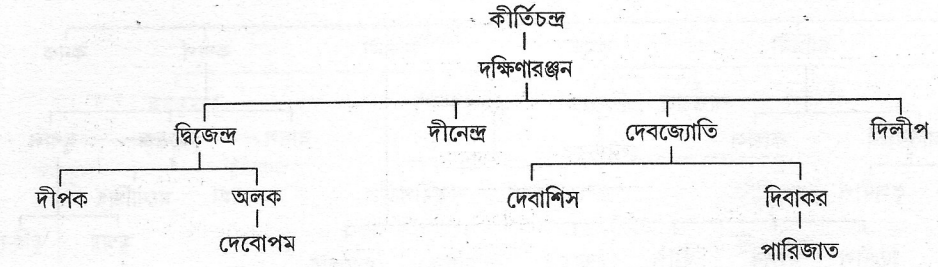
কীর্তিচন্দ্র
দক্ষিণারঞ্জন
দ্বিজেন্দ্র
দীনেন্দ্র
দেবজ্যোতি
দিলীপ
দীপক
অলক
দেবোপম
দেবাশিস
দিবাকর
পারিজাত

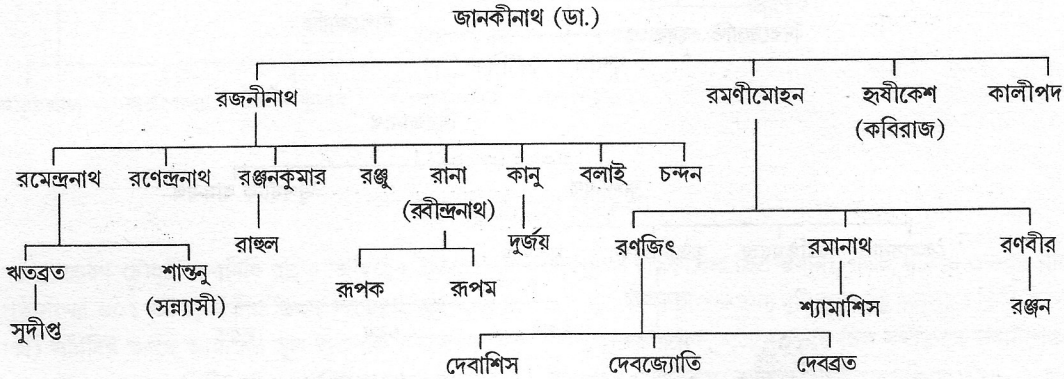
জানকীনাথ (ডা.)
রজনীনাথ
রমণীমোহন
হৃষীকেশ (কবিরাজ)
কালীপদ
রমেন্দ্রনাথ
রণেন্দ্রনাথ
রঞ্জনকুমার
রঞ্জু
রানা (রবীন্দ্রনাথ)
কানু
বলাই
চন্দন
ঋতব্রত
শান্তনু (সন্ন্যাসী)
রাহুল
রূপক
রূপম
দুর্জয়
রণজিৎ
রমানাথ
রণবীর
সুদীপ্ত
শ্যামাশিস
রঞ্জন
দেবাশিস
দেবজ্যোতি
দেবব্রত

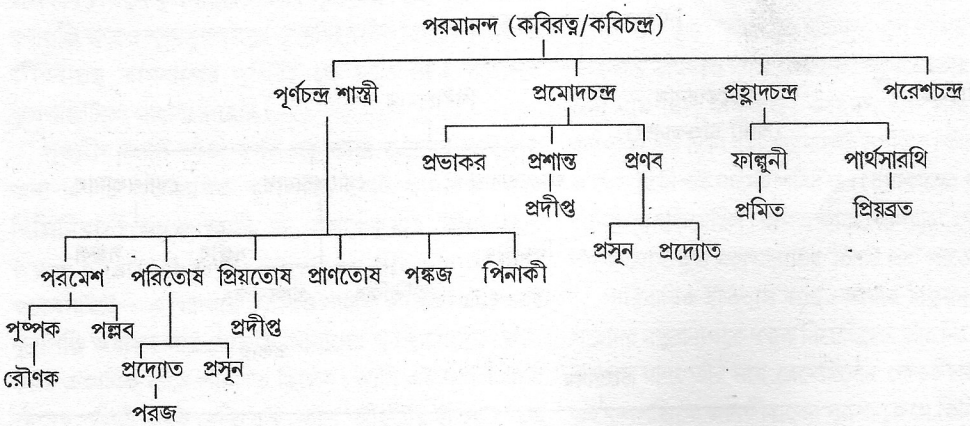
পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী
প্রমোদচন্দ্র
প্রহ্লাদচন্দ্র
পরেশচন্দ্র
প্রভাকর
প্রশান্ত
প্রণব
ফাল্গুনী
পার্থসারথি
প্রদীপ্ত
প্রমিত
প্রিয়ব্রত
প্রসূন
প্রদ্যোত
পরমেশ
পরিতোষ
প্রিয়তোষ
প্রাণতোষ
পঙ্কজ
পিনাকী
পুষ্পক
পল্লব
প্রদীপ্ত
রৌণক
প্রদ্যোত
প্রসূন
পরজ

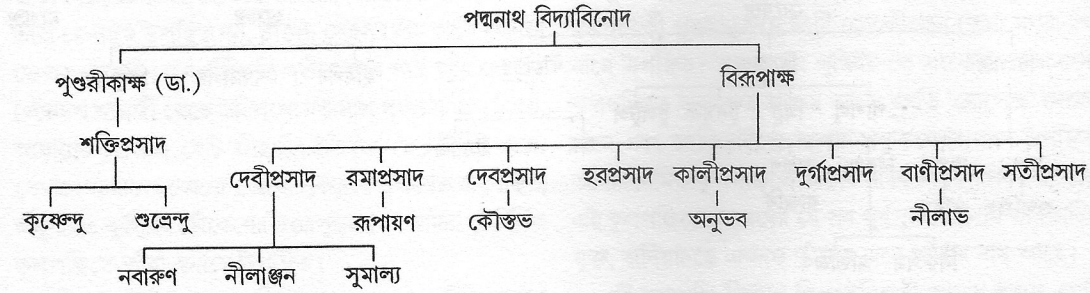
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
পুণ্ডরীকাক্ষ (ডা.)
বিরূপাক্ষ
শক্তিপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
রমাপ্রসাদ
দেবপ্রসাদ
হরপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
বাণীপ্রসাদ
সতীপ্রসাদ
কৃষ্ণেন্দু
শুভ্রেন্দু
রূপায়ণ
কৌস্তভ
অনুভব
নীলাভ
নবারুণ
নীলাঞ্জন
সুমাল্য

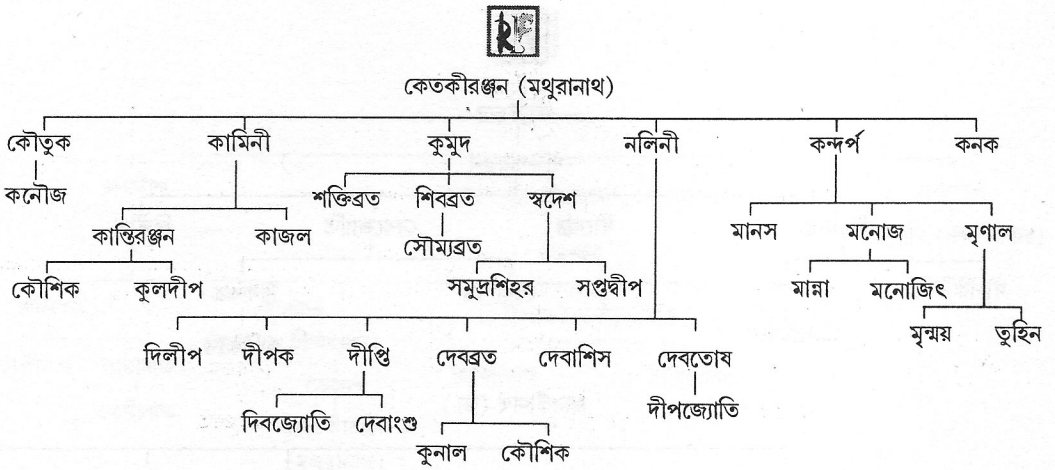
কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
কৌতুক
কনৌজ
কামিনী
কান্তিরঞ্জন
কৌশিক
কুলদীপ
কাজল
কুমুদ
শক্তিব্রত
শিবব্রত
সৌম্যব্রত
স্বদেশ
সমুদ্রশিহর
সপ্তদ্বীপ
নলিনী
দিলীপ
দীপক
দীপ্তি
দিবজ্যোতি
দেবাংশু
দেবব্রত
কুনাল
কৌশিক
দেবাশিস
দেবতোষ
দীপজ্যোতি
কন্দর্প
মানস
মনোজ
মান্না
মনোজিৎ
মৃণাল
মৃন্ময়
তুহিন
কনক

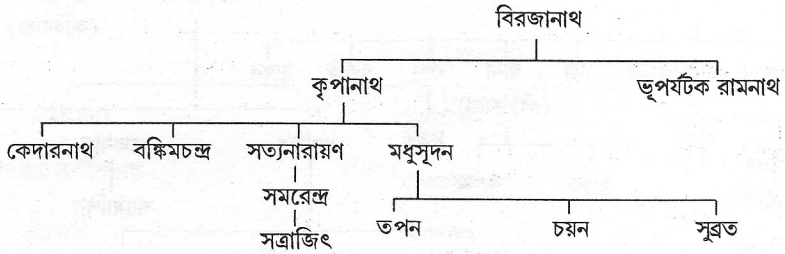
বিরজানাথ
কৃপানাথ
ভূপর্যটক রামনাথ
কেদারনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনারায়ণ
সমরেন্দ্র
সত্রাজিৎ
মধুসূদন
তপন
চয়ন
সুব্রত

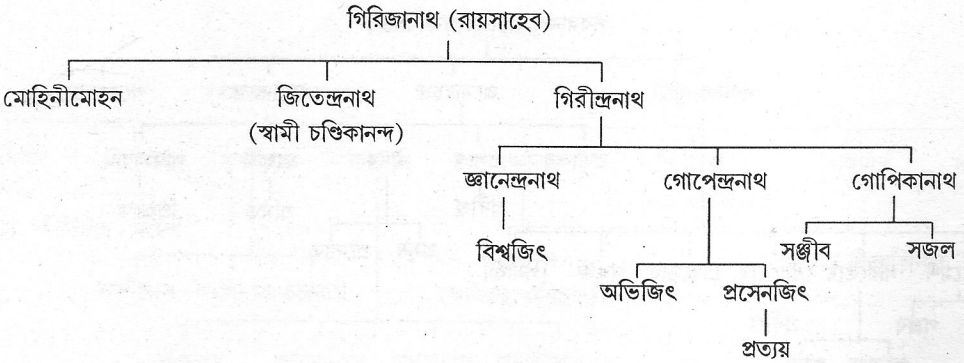
গিরিজানাথ (রায়সাহেব)
মোহিনীমোহন
জিতেন্দ্রনাথ
(স্বামী চণ্ডিকানন্দ)
গিরীন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বিশ্বজিৎ
গোপেন্দ্রনাথ
অভিজিৎ
প্রসেনজিৎ
প্রত্যয়
গোপিকানাথ
সঞ্জীব
সজল

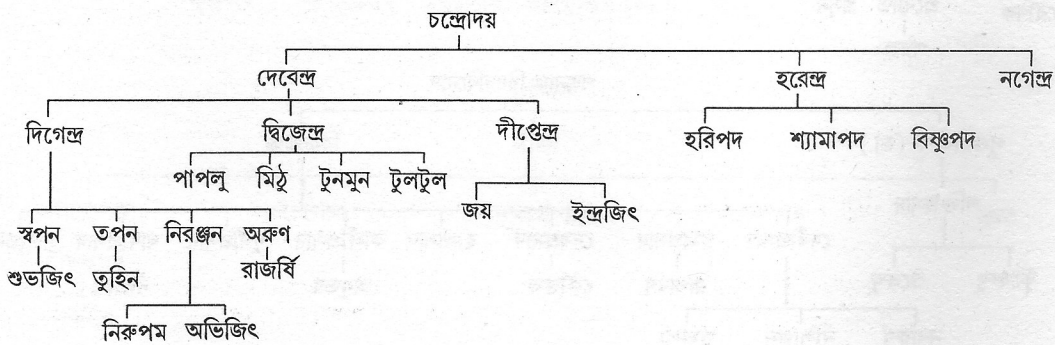
চন্দ্রোদয়
দেবেন্দ্র
দিগেন্দ্র
স্বপন
শুভজিৎ
তপন
তুহিন
নিরঞ্জন
নিরুপম
অভিজিৎ
অরুণ
রাজর্ষি
দ্বিজেন্দ্র
পাপলু
মিঠু
টুনমুন
টুলটুল
দীপ্তেন্দ্র
জয়
ইন্দ্রজিৎ
হরেন্দ্র
হরিপদ
শ্যামাপদ
বিষ্ণুপদ
নগেন্দ্র

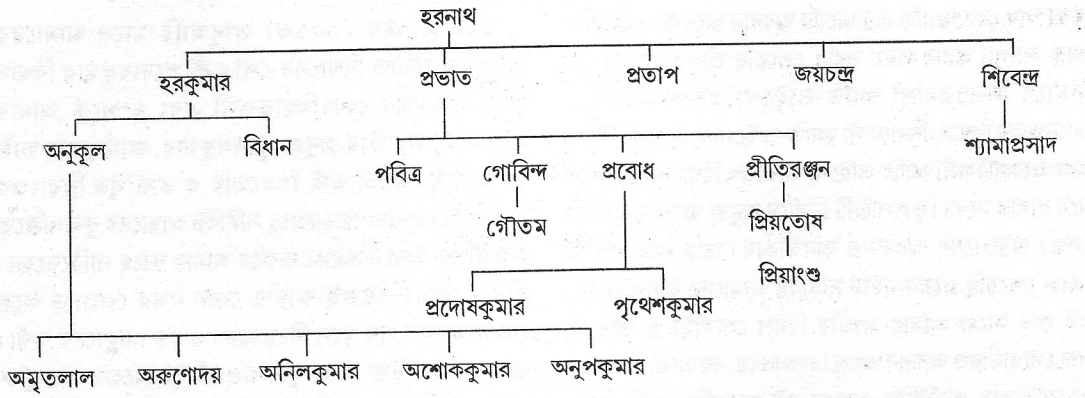


## সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় 'উৎস' সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সন্নিবিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি ('বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ')। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সন্নিবিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsylhet_blogspot.com ওয়েবসাইটে— এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা স্বনামে উপস্থিত।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাগুক্ত অন্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেষোক্ত নামেই উপস্থিত। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'রমাকান্ত' রামকান্ত নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুদূর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে : আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি 'গোপেন্দ্র' দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো 'তপন' শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচঙে এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি

শ্রদ্ধাস্পদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটিবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্তু) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তার কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয় বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, কুলপঞ্জিটি ইতিপূর্বে ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। অবশ্য দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়!

তবে এ-বছর (২০১৬) জানুআরি মাসে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রভাত বিশ্বাসের পৌত্র শ্রী প্রদোষকুমার বিশ্বাস (যিনি বর্তমানে কোচবিহারবাসী এবং সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র) সহ তাঁর অনুজ পৃথেশকুমার, জ্যাঠতুতো ভাই গৌতম, খুড়তুতো ভাই প্রিয়তোষ ও তস্য পুত্র প্রিয়াংশুর নাম ফাউন্ডেশনের স্মারকগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য এসএমএস করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। শ্রীমান প্রদোষ নিজেই আমার ফোন নম্বর জোগাড় করে যোগাযোগের পথ খুলে দিয়েছেন। এ বড় আহ্লাদের কথা। বলা বাহুল্য, উক্ত তথ্য কুলপঞ্জিতে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তা ছাড়া, দেশ বিভাগ জনিত কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আমার স্বর্গত জ্যেষ্ঠতাত রজনীনাথ ভট্টাচার্যের কয়েকজন উত্তরপুরুষের নাম বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিতে ইতিপূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়নি। বানিয়াচং বিদ্যাভূষণপাড়া নিবাসী আমার অনুজ জ্ঞাতি শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস ব্যাকরণতীর্থের প্রচেষ্টায় নামগুলি সঠিকভাবে উদ্ধার করা গেছে এবং এবারকার কুলপঞ্জিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হল। ❑

# মতামত

## (১)

রহড়া, কলকাতা-১১৮
২৩.০৫.২০১৬

শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন
মান্যবরেষু,

প্রথমেই 'রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন'-এর সার্বিক কুশল ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি। প্রবাসী বাঙালি হয়েও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে আপনাদের উদ্যোগ সবিশেষ প্রশংসনীয়। এই ফাউন্ডেশনের সঙ্গে মানসিকভাবে জড়িয়ে আছি সেই ২০১১ সাল থেকে, যে-বছর শ্রদ্ধেয় কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় আপনাদের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

'বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি' একটি ইতিহাস। যিনি বা যাঁরা এই 'কুলপঞ্জি' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের গবেষক বলতেই হবে। এ-কাজে নির্দিষ্ট একটি পরিবারের ইতিহাস তুলে ধরলেও কাজটি অনবদ্য। প্রয়াত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং প্রয়াত রামনাথ বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করে আমাদের ঋদ্ধ করেছেন, অন্যথায় ওই দুজন মহান ব্যক্তিত্বের এমন কর্মকাণ্ডের হদিশই পেতাম না আমরা। অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে এই স্মারকগ্রন্থ একটা বন্ধন গড়ে তুলেছে। সুমিতা চক্রবর্তীর 'বাংলা গদ্যের বিবর্তন : সার্ধশতবর্ষ' শীর্ষক লেখাটি অনবদ্য। বাংলা সাহিত্যের চর্চা যাঁরা করেন কিংবা যাঁরা কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের কাছে লেখাটি খুব প্রশংসা পাবে। লেখাটিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কিছু দিকও উঠে এসেছে। পদ্মনাথ দেবশর্মণের লেখা 'ভট্ট কবিতা সংগ্রহ' আমাদের নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। রামনাথ বিশ্বাসের 'তরুণ তুর্কি' বেশ ভালো লাগল।

সব মিলিয়ে স্মারকগ্রন্থটি আমার খুব ভালো লেগেছে এবং অনেক তথ্যও পেলাম। আপনাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সবশেষে একটা আক্ষেপ না-জানিয়ে পারলাম না। সেটা হলো, এই দুটি পুরস্কার শুধু কবিদের দেওয়া হয় কেন? সাহিত্য অকাদেমি, আনন্দ পুরস্কার ইত্যাদি যেমন কবি ও সাহিত্যিক উভয়কে দেওয়া হয় তেমনই আপনারাও সেভাবে ভাবলে আমরা যারা সাহিত্য চর্চা করি তারা অনুপ্রাণিত হই।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনাদের সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

**প্রগতি মাইতি**

'ইস্‌ক্রা' পত্রিকার সম্পাদক

(২)

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব, রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন
মুম্বাই, ভারত

মান্যবরেষু,

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার এবং রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫ প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ যথাসময়ে পেয়েছি। অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে প্রাপ্তিসংবাদ দিতে দেরি হওয়ার জন্য দুঃখিত। বাংলা সাহিত্য জগতে মুম্বাইয়ের রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন শুধু পরিচিতই নয়, একটা উল্লেখযোগ্য সংগঠনও বটে। বাংলা সাহিত্যের প্রচারে ও প্রসারের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অতুলনীয়। অসমিয়া ও বাংলা ভাষার মেলবন্ধনেও এই সংস্থার অনেক অবদান।

প্রবাসে, মানে এই ভিলাইয়ে আমি ষাট বছর ধরে আছি এবং সেই থেকে সাহিত্যকর্মও চলে আসছে। আমার সাহিত্যকর্মের সুবাদে শুধু বহির্বঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গেরও বহু সাহিত্য পত্রিকা, সংগঠন ও সাহিত্যসেবীর সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ রয়েছে। অথচ রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের মতো দ্বিতীয় কোনো সংস্থা আছে কি না জানা নেই। আপনারা প্রতিবছর দুজন যোগ্য কবিকে পুরস্কার দিচ্ছেন, তাঁদের নিয়ে বড় করে সাহিত্য অনুষ্ঠান করছেন এবং সেই উপলক্ষ্যে সুন্দর একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এমন সুন্দর স্মারক বক্তৃতা সংবলিত স্মারকগ্রন্থ খুব বেশি দেখা যায় না, বিশেষ করে বহির্বঙ্গে। ভারি সুন্দর।

স্মারকগ্রন্থটি আমি আগ্রহের সঙ্গে আদ্যোপান্ত পড়েছি। এরকম একটি স্মারকগ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য সম্পাদক সুকুমার বাগচি এবং তাঁর সহযোগী ও সহকারী সম্পাদক সুধাশুশেখর মুখোপাধ্যায় ও বাসব রায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্মারকগ্রন্থের সব ক'টি লেখার চয়ন যথার্থ। বিশেষ করে প্রসেনজিং চৌধুরীর পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা ('অন্য এক জ্যোতিপ্রসাদ') এবং সুমিতা চক্রবর্তীর ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা ('বাংলা গদ্যের বিবর্তন : সার্ধশতবর্ষ') পড়ে আমি অভিভূত। অনেক অজানাকে জানতে পেরে ঋদ্ধ হলাম। এমন উচ্চ মানের লেখা ও বিশ্লেষণ খুব কমই পাওয়া যায়। এ দুটো স্মারকগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ রচনা। রচনা দুটির মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে, ফলে নিঃসন্দেহে পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করবে, তাঁদের কাছে সমাদৃত হবে। এ-ছাড়া পদ্মনাথ দেবশর্মণ-এর 'ভট্ট কবিতা সংগ্রহ' লেখাটিও খুব ভালো। আমরা তো ভট্ট কবিতা ভুলে গেছি, অচর্চায় লুপ্ত হতে চলেছে। এসব নিয়ে ক'জন ভাবেন বা লেখেন। এই প্রজন্মের কাছে ভট্ট কবিতা নতুন ঠেকবে।

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের পুনর্মুদ্রিত 'তরুণ তুর্কি লেখাটি খুব ভালো। পড়তে গিয়ে মন কাড়ে।

এবার অর্থাৎ ২০১৫ সালের জন্য রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার পেলেন কবি রত্নেশ্বর হাজরা। রত্নেশ্বর ষাটের দশকের উজ্জ্বল কবি, বাংলা কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যোগ্য ব্যক্তিই পুরস্কার পেলেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি রত্নেশ্বর আমাদের তৎকালীন পত্রিকা 'অংকুর'-এ লিখেছেন। আমি আশি উত্তীর্ণ মানুষ। এ-বয়সেও সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছি। পত্রিকা সম্পাদনা, যোগাযোগের কাজ, তা ছাড়া নিজের লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

শুভেচ্ছান্তে—

**শিবব্রত দেওয়ানজী**

১১.৬.২০১৬

(৩)

বি-১/কে, সারদা পার্ক
যোতশিবরামপুর
কলকাতা-৭০০১৪১
১৪.৭.২০১৬
চলভাষ ৯৪৩২১৫০৬২৭

শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন
প্রীতিভাজনেষু,

গতবারের মতো এবারেও তোমার পাঠানো রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের ২০১৫ সালের জন্য পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু যা হয়, দেব-দেব করেও এর প্রাপ্তিস্বীকারে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেল, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবে রমানাথের সঙ্গে আমার যে-প্রীতির সম্পর্ক, সেইসঙ্গে তোমার সুমিষ্ট ব্যবহারে আমি এতটাই মুগ্ধ যে সেখানে ক্ষমাটমা বাহুল্য মাত্র।

যা-ই হোক, স্মারকগ্রন্থটি সাগ্রহে পড়লাম এবং দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য লেখার পুনর্মুদ্রণে এটি ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে আমি পদ্মনাথের 'ভট্ট কবিতা সংগ্রহ' এবং রামনাথ বিশ্বাসের তরুণ তুর্কি গ্রন্থের 'আংকারার পথে' আর 'আংকারার বুকে' শীর্ষক দুটি অংশের উল্লেখ করছি। ভুপর্যটক রামনাথ আমার কাছে রোল মডেল এবং তাঁর বিশ্বপরিক্রমায় উৎসাহিত হয়ে আমি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তরুণ বয়সে সাইকেলে ভারত ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। কিন্তু মেমারি থেকে বর্ধমান যাওয়ার পর কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে বর্ধমানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে আসি।

কী অসাধারণ ধৈর্য, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা আর ভ্রমণপিপাসু মন নিয়ে রামনাথ বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই স্মারকগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত 'তরুণ তুর্কি' গ্রন্থের দুটি অংশের মতো আরো কিছু পুনর্মুদ্রণ পেলে আমরা উপকৃত হই।

প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তীর 'বাংলা গদ্যের বিবর্তন : সার্ধশতবর্ষ' শীর্ষক বক্তৃতাটি গবেষণাধর্মী এবং এর পাঠে সমৃদ্ধ হলাম। পরপর কয়েকটি উন্নত মানের স্মারক বক্তৃতা আমরা পেলাম— তরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন', বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা', সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল' এবং বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের 'আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প'— এই স্মারক বক্তৃতাগুলি একসঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে আমাদের সংগ্রহে রাখার সুবিধা হয়।

অসমের গুয়াহাটিতে এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন সম্পর্কে এর আগে আমরা অনেকবার শুনেছি এবং এর যথার্থতাও মেনে নিয়েছি। তোমার 'প্রাক্‌কথন'-এর বক্তব্যের মতো আমিও বিশ্বাস করি 'কোনো সাহিত্য-প্রচেষ্টা তখনই সফল হয় যখন সেই প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্যিকরা জড়িত থাকেন' এবং এই বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনুষ্ঠানটি গুয়াহাটিতে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে পুরস্কার প্রদানের মতো এইরকম একটি গৌরবময় অনুষ্ঠানে থাকতে না-পারার বেদনা যথেষ্ট অনুভব করি। আরো অনুভব করি এই কারণে যে ফাউন্ডেশনের সভাপতি আমার অত্যন্ত প্রিয়জন রমানাথ ভট্টাচার্য।

আমার সপ্রীতি শুভেচ্ছা রইল।

**অনন্ত দাশ**

(৪)

শিলং
৪.৮.২০১৬

রমানাথ ভট্টাচার্য
মুম্বাই।
শ্রদ্ধেয় রমানাথদা,

প্রণাম নেবেন। শরীর কেমন? অনেকদিন আগে ফোনে কথা হয়েছিল। ২০১৫ সালের পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এবারের স্মারকগ্রন্থ হাতে পেলাম। এত দূর প্রবাসে থেকেও ভাষাজননীর সার্থক সন্তানের মতো কাজ করছেন আপনারা। তার জন্য শ্যামাশিস ভট্টাচার্যকেও আমার ধন্যবাদ জানাই।

স্মারকগ্রন্থটি খুবই দুর্লভ রচনায় সমৃদ্ধ। 'ভট্ট কবিতা সংগ্রহ' একটি অচেনা দিককে উন্মোচিত করেছে। ভালো লেগেছে স্মারক বক্তৃতা। হরেকৃষ্ণ ডেকা ও রত্নেশ্বর হাজরাকে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন।

ভালো থাকবেন।

**স্বর্ণালী বিশ্বাস**

(৫)

শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
মুম্বাই।

আপনাদের পাঠানো স্মারকগ্রন্থটির জন্য ধন্যবাদ। খুব ভালো লাগল। নমস্কার।

**পিনাকী ঠাকুর**
কলকাতা
৮.৯.২০১৬
ফোন নং ৯৮৭৪৯৩৯৬৯৪